গীতা ও হিন্দুধর্ম্ম

প্রথম খণ্ড—ভূমিকা



শ্রীযজ্ঞেশ্বর ঘোষ, এম-এ, পি-এইচ, ডি

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পারিশার্স লিমিটেড
১১৯ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক: শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ
জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ
১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ
শ্রাবণ, ১৩৫৩
মূল্য চার টাকা

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেডের
মুদ্রণ বিভাগে [অবিনাশ প্রেস—১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট,
কলিকাতা] শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ, কর্তৃক মুদ্রিত

মুখবন্ধ

আমার পূজ্যপাদ গুরুদেব শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর ঘোষ মহাশয় প্রণীত এই গ্রন্থখানি নিজগুণে তাহার যথাযোগ্য স্থান লাভ করিবে। তথাপি গ্রন্থকার সম্বন্ধে দুই একটি কথা এই স্থলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। তিনি নানা শাস্ত্রবিদ্; ইংরাজী ও দর্শনশাস্ত্রে এম-এ., ও অর্থনীতিতে মৌলিক গবেষণাদ্বারা পি-এইচ্-ডি উপাধি লাভ করিয়া বহুবৎসর কৃতিত্বের সহিত সংস্কৃত কলেজ ও প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপকরূপে এবং ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজে অধ্যক্ষরূপে কার্য্য করিয়াছেন ও অবসর-মত কয়েকখানি উপযোগী পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমান গ্রন্থ তাঁহার দ্বাদশবর্ষব্যাপী সাধনার ফল, আর সম্পূর্ণ হইলে হয়তো তাঁহার শেষ দান হইবে। গীতা সম্বন্ধে বহু পুস্তক রহিয়াছে; তথাপি দৃষ্টিভঙ্গী ও উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিলে ইহা প্রয়োজনাতিরিক্ত হইবে না।

আমার প্রিয় ছাত্র শ্রীমান্ সুরেশচন্দ্র আমার অনুরোধে ও গ্রন্থকারের সহিত অল্প সময়ের সংস্পর্শে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া নানা জরুরি কার্য্য স্থগিত রাখিয়া তাঁহার সর্ব্বপরিচিত বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানে পুস্তকখানির মুদ্রণ ও প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহার ঐকান্তিক তত্ত্বাবধানের ফলে এবং জেনারেল প্রিণ্টার্স ও পাব্লিশার্স লিমিটেড-এর ম্যানেজার শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম-এ, মহাশয়ের বিশেষ তৎপরতায় অতি অল্প সময়ের মধ্যে পুস্তকখানি প্রকাশিত হইল। ইহাতে গ্রন্থকার বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছেন। ইতি—

"সুরসদন"
বালিগঞ্জ

প্রফুল্লকুমার গুহ
[আনন্দমোহন কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক, বর্ত্তমানে কলিকাতা রিপণ কলেজের সহ-অধ্যক্ষ]

ভূমিকা

প্রাচীন হিন্দু-শাস্ত্রে পরমার্থ

বিত্ত অর্জ্জন, মনোমত স্ত্রীপুত্রাদিলাভ, পুণ্য সঞ্চয় ও মুক্তি বা পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠা,—এই চতুষ্টয় পুরুষার্থ নামে খ্যাত, যেহেতু স্বভাব ও অবস্থা অনুসারে জীবনের ধারা অগণিত প্রণালীতে প্রবাহিত হইলেও প্রতি খাতে গতি অন্ততঃ ইহাদিগের একটির প্রতি। একাধিক পুরুষার্থও একই জীবনে লক্ষ্য হইতে পারে, কারণ প্রথম তিনটি বিভিন্ন হইলেও পরস্পরবিরোধী নহে। প্রভূত অর্থ ও অনুগত পরিজন উপভোগের জন্যই কাম্য, আর মর্ত্ত্যে ভোগ সামান্য ও অস্থায়ী হয় বলিয়াই পুণ্যবলে দিব্যভোগের আকাঙ্ক্ষা। দিব্যভোগেও কিন্তু ভোক্তার স্বাতন্ত্র্য বা নিরপেক্ষতা নাই, যেহেতু স্বর্গে বা মর্ত্ত্যে সুখের জন্য উপভোগ্যের প্রয়োজন, অর্থাৎ বিষয়ের আনুগত্য ব্যতীত তাহা লাভ করা যায় না। ধর্ম্মাচরণে সংযম ও ত্যাগ আবশ্যক হয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু অর্থের অন্বেষণেও ভাবী ভোগের জন্য উপস্থিত ত্যাগ বিরল নহে। সুতরাং ঐহিক ও পারত্রিক উন্নতির ব্যবস্থায় আপাতবৈষম্য থাকিলেও একান্ত অসঙ্গতি নাই। বস্তুতঃ ভোগতৃষ্ণারূপ একই মনোভাব উভয় ক্ষেত্রে প্রকাশ পায়।

কিন্তু স্বর্গসুখের জন্য পুণ্যকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেও শ্রদ্ধা ও পরহিতৈষণা ব্যতীত তাহা যথাবৎ আচরিত হয় না। সুতরাং তাহার নিয়ত ও যথারীতি আচরণে কামনা ও বিদ্বেষ প্রশমিত হয়। তখন ধর্ম্মিষ্ঠ সুখের প্রকৃতি ও পরিণাম উপলব্ধি করেন। সুখে সন্তোষ নাই, কারণ ইহলোকে সুখদ বিষয়মাত্রেই ক্ষয়শীল,

আর সঞ্চিত পুণ্যের ক্ষয়ে সুখময় স্বর্গবাসেরও অবসান ঘটে; সুতরাং আক্ষেপ ভোগের অনিবার্য্য অনুগামী। এই জ্ঞান চিত্তে প্রতিষ্ঠিত হইলে, চতুর্থ পুরুষার্থে আস্থা হয়। সুখদুঃখের অতীত নিত্য নির্ব্বিকার ভাবই এই পুরুষার্থ। অপর তিনটি সসীম, সদোষ ও উপার্জ্জিত, সুতরাং অনিত্য। ইহাও প্রচেষ্টার ফলে লভ্য বটে; কিন্তু ইহা কোন অভিনব অবস্থা নহে, কারণ ইহা জীবের অন্তঃসত্তা চৈতন্যমাত্রের রূপ। চিত্তের মলিনতা ও সুখের মোহ অপগত হইলে ইহা চিরতরে প্রকট হয়, আর কেবল সেই জন্য প্রচেষ্টা বা সাধনার প্রয়োজন।

কিন্তু উপাদেয়ত্বে ইহার সহিত অন্যান্য পুরুষার্থের তুলনা হয় না, কারণ দুঃখকে সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করা তাহাদিগের পক্ষে অসম্ভব, অথচ অসামান্য সুখ এবং ঐশ্বর্য্যও দুঃখের ছায়ায় ম্লান হয়। সুতরাং ইহা পরমার্থ বা নিঃশ্রেয়স; আর দুঃখের সংস্পর্শ ইহাতে নাই বলিয়া ইহা মুক্তি বা মোক্ষ নামেও প্রসিদ্ধ, যেহেতু দুঃখের কবল হইতে নিষ্কৃতি মানব সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করে। তথাপি ইহা কোন দূরস্থ বিষয় বা অপ্রাপ্ত লোক নহে; সততই ইহা বর্ত্তমান, যদিও মোহ থাকিতে ইহা মেঘাবৃত রবির মত স্পষ্ট প্রতিভাত হয় না। অতএব যাহাকে পরমার্থ বলা হয়, তাহা পরম তত্ত্বও বটে। উপনিষদে ও সাংখ্যশাস্ত্রে সেই পরম তত্ত্ব সম্বন্ধে বিশদ ও বিস্তৃত উপদেশ আছে, আর গীতা তাহা বিচার পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া স্বীয় বাণী প্রচার করিয়াছেন।

উপনিষৎ ও গীতা

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, গীতা সমগ্র বেদের সার-সংগ্রহ(১)। প্রাচীন উপনিষৎগুলির শ্রেষ্ঠ উপদেশ গীতায় বিন্যস্ত হইয়াছে, ইহাই তাঁহার অভিমত, আর এ অভিমত

(১) শাঙ্করভাষ্যোপক্রমণিকা

সুধীসমাজ সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু উপমা ও রূপকের আলোকে যে তত্ত্ব উপনিষদে পরিস্ফুট, গীতায় তাহার কেবল সংক্ষিপ্ত উল্লেখ আমরা পাই, কারণ তত্ত্বনির্ণয় বা তাহার বিশদ ব্যাখ্যা গীতার মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। বিমূঢ় ও সন্তপ্ত মানবকে কর্ত্তব্যপালনে ও শ্রেয়োলাভে উৎসাহিত করিবার অভিপ্রায়ে ইহা রচিত হইয়াছিল। সত্য বটে, চরম লক্ষ্য বা পরমার্থের সুস্পষ্ট সন্ধান না পাইলে বিধিনিষেধ সত্ত্বেও পথভ্রষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকে। কিন্তু এ সম্ভাবনা অপনয়নের জন্য তত্ত্বনির্দ্দেশই আবশ্যক, তত্ত্ববিবৃতির প্রয়োজন হয় না। সুতরাং গীতা প্রসঙ্গক্রমে তত্ত্বের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার বিস্তৃত বর্ণনায় প্রবৃত্ত হন নাই। কিন্তু তাদৃশ উল্লেখ ভক্তিমান সাধককে অনুপ্রাণিত করিলেও প্রমাণপ্রিয় তত্ত্বজিজ্ঞাসুর পক্ষে যথেষ্ট হয় না। সুতরাং গীতার ভাষা প্রাঞ্জল ও রচনা হৃদয়গ্রাহী হইলেও তাৎপর্য্য স্থানে স্থানে রহস্যময় বোধ হয়। এমন কি, শঙ্করও স্বীকার করিয়াছেন যে গীতার মর্ম্ম দুর্বিজ্ঞেয়(১)।

যাহা হউক, সংশয় নিরসনের প্রকৃষ্ট উপায় গীতাই বলিয়া দিয়াছেন। শাস্ত্রজ্ঞ ও তত্ত্বদর্শীকে শ্রদ্ধা ও আগ্রহ সহকারে প্রশ্ন করিলে, তাঁহার জ্ঞানোজ্জ্বল উত্তরে তত্ত্বসকল স্পষ্ট প্রতিভাত হয়(২)। অন্যতর উপায় 'স্বাধ্যায় ও জ্ঞানযজ্ঞ', অর্থাৎ উপনিষদাদি সদ্গ্রন্থ মনোনিবেশ পূর্ব্বক অধ্যয়ন(৩)। গীতার নানা স্থলে উপনিষদের ভাষা অবিকল বা ঈষৎ পরিবর্ত্তিত আকারে গৃহীত হইয়াছে। তাদৃশ উদ্ধৃতাংশের অর্থ মূল গ্রন্থে তাহার পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ হইতে নিরূপণ করাই সঙ্গত। চরমতত্ত্ববাচক শব্দগুলির প্রয়োগেও গীতা উপনিষদের অনুবর্ত্তী। অতএব উপনিষৎ হইতেই তাহাদিগের অর্থব্যাপ্তি স্থির করা

---

(১) শাঙ্করভাষ্যোপক্রমণিকা ; (২) গীতা ৪।৩৪ ; (৩) গীতা ৪।২৮

সমীচীন, বিশেষতঃ যখন তাহাদিগের প্রচলিত অর্থ অস্পষ্ট, অনিশ্চিত ও অবাস্তর ভাবের সহিত জড়িত। বস্তুতঃ গীতার উপদেশে যে কোথাও কোথাও অসঙ্গতি দোষের আভাস আমরা পাই, তাহার প্রধান কারণ পুরাতন, পারিভাষিক শব্দে নূতন, প্রাকৃত ও অপ্রাসঙ্গিক অর্থের আরোপ। ব্রহ্ম, আত্মা ও ঈশ্বর, এই তিনটি শব্দ আমাদিগের সুপরিচিত! কিন্তু এই পরিচয়ই গীতার মত গ্রন্থে তাহাদিগের অর্থ নির্দ্ধারণের পক্ষে অন্তরায়। সুতরাং সে অন্তরায় দূর করিবার জন্য উপনিষদে ও তৎসদৃশ প্রাচীন শাস্ত্রে তাহাদিগের ব্যবহার সাবধানে বিবেচ্য।

তত্ত্ব সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণার জন্য উপনিষদের আলোচনা যে আবশ্যক তাহা বলিলাম। সাধনায় একনিষ্ঠ বা দ্বিধাবর্জ্জিত হইবার জন্যও এই আলোচনার প্রয়োজন আছে। কোন কোন মনীষীর মতে উপনিষদে ঈশ্বরের স্থান গৌণ, ভক্তির অবকাশ নাই, কর্ম্ম বন্ধনের হেতু বলিয়া প্রতিষিদ্ধ; সুতরাং ভগবৎপ্রেম ও কর্ম্মযোগের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া গীতা হিন্দু সমাজকে নূতন পথে প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। এ অভিমত গ্রহণ করি না, আর গ্রহণ করিবার পক্ষে সংস্কারগত আপত্তিও আছে। হিন্দুমাত্রেই উপনিষদের প্রামাণ্য অঙ্গীকার করেন, আর গীতাও তাঁহার বিচারে তুল্যমূল্য। উভয়ের প্রতি এই সমাদর কি কপট প্রশস্তি বা গতানুগতিক শিষ্টাচার? দুর্ভাগ্যবশতঃ ধর্ম্মাচরণে কৃত্রিমতা ও প্রচলিত প্রথার নির্ব্বিচারে অনুবর্ত্তন বিরল নহে। কিন্তু বহুকাল যাবৎ ধর্ম্মিষ্ঠগণ উপনিষৎ ও গীতায় শ্রদ্ধালু, অথচ তাহাদিগের শাসন বিরুদ্ধ বা অসঙ্গত হইলে ঈদৃশ শ্রদ্ধা সম্ভব হইত না। সুতরাং এই শ্রদ্ধার প্রকৃত কারণ কি, তাহা অনুসন্ধান করা উচিত। গীতার

বাণী হৃদয়ঙ্গম করাই আমাদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য, সন্দেহ নাই। কিন্তু শ্রুতির আদেশের সহিত তাহার সামঞ্জস্য উপলব্ধি করাও বাঞ্ছনীয়, কারণ শ্রুতিই হিন্দুধর্ম্মের ভিত্তিস্বরূপ। সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও আমরা এই ভূমিকায় শ্রৌত উপদেশের বিস্তৃত ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইব।

উপনিষদে ব্রহ্ম

সংসার নিষ্কারণ নহে; একাধিক কারণের সংযোগেও ইহার উৎপত্তি হয় নাই; বস্তুতঃ ইহার কারণ একাধারেই উপাদান, নিমিত্ত ও আশ্রয়,—উপনিষৎ এই অদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়াছেন। জড়বাদও একপ্রকার অদ্বৈতবাদ বটে; কিন্তু জড়পদার্থ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কিংবা যুক্তিতর্কের সাহায্যে অবধারণ-যোগ্য, অথচ উপনিষদের চরমতত্ত্ব প্রত্যক্ষ বা অনুমানের বিষয় নহেন। পরন্তু অজ্ঞেয়বাদ উপনিষদে অনুমোদিত হয় নাই, যেহেতু কোন অজ্ঞেয় বস্তু কাম্য হইতে পারে না, তাহাতে অভিনিবেশও সম্ভব নহে, অথচ উপনিষৎ মূল কারণকে পরম সম্পদ্ ও পরাগতি বলিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার সূক্ষ্মতা ও সর্ব্বগতত্বই উপলব্ধির পক্ষে দুরতিক্রম্য অন্তরায়। আরুণি লবণাক্ত জলের উপমা দিয়া এই রহস্য যথাসম্ভব বোধগম্য করিয়াছেন (১)। দ্রবীভূত লবণখণ্ড জলের সর্ব্বত্রই সমভাবে বর্ত্তমান, কিন্তু তাহাকে কোথাও পৃথক্‌ভাবে পাওয়া যায় না। আদি ও অদ্বয়তত্ত্ব বিশ্বে ও বিশ্ববাসীতে ওতপ্রোত-ভাবে আছেন, তথাপি আমরা তাঁহার সন্ধান পাই না, যেহেতু জ্ঞেয় বিষয় হইতে বিষয়ান্তরের ভেদ লক্ষ্য করিয়াই আমরা তাহাকে জানি। জ্ঞান-অর্জ্জনের ইহাই সাধারণ পদ্ধতি, কিন্তু যিনি সর্ব্বময় তাঁহার সম্বন্ধে ইহা প্রযোজ্য নহে।

তাঁহার মহত্ত্বের অবধি নাই, তাঁহার মত ব্যাপক কিছুই

(১) ছান্দোগ্য ৬।১৩

নহে, বস্তুতঃ সকলই তাঁহার প্রকাশ, এইজন্য তাঁহাকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। আর তিনি বিশ্বব্যাপী পরিণামের চরম আশ্রয় বলিয়া তাঁহার লয়োদয় নাই, হ্রাসবৃদ্ধিও নাই,—এইজন্য অক্ষর তাঁহার অন্য নাম। ব্রহ্ম বা অক্ষর উপনিষদের প্রতিপাদ্য, কিন্তু প্রতিপাদনের অর্থ তাঁহার অস্তিত্বের প্রমাণ সংগ্রহ নহে। সসীম বস্তু সম্বন্ধেই এবম্বিধ প্রতিপাদন সম্ভব ; ব্রহ্ম প্রমিত বা পরিমিত হইবার অযোগ্য। বিদগ্ধ শাকল্য এতাদৃশ প্রমাণ অন্বেষণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার আলোচনা ব্যর্থ হইয়াছিল। কিন্তু চিত্ত নির্ম্মল, উদার ও স্থির হইলে ব্রহ্ম তাহাতে স্বতঃ প্রতিভাত হন। উপনিষদের ঋষি এই অসাধারণ অনুভূতিকে উন্নত ভাব ও ভাষায় যথাসম্ভব ব্যক্ত করিয়াছেন।

ব্রহ্মচিন্তায় কার্য্যকারণ বিচার

উপনিষদে যুক্তিতর্কের বাহুল্য নাই। তত্ত্বদর্শী সাধারণতঃ আখ্যায়িকা ও রূপকের সাহায্যে সত্য প্রকাশ করিয়াছেন। তথাপি বহুস্থলে রূপক ও আখ্যায়িকার অন্তরালে সূক্ষ্ম বিচার নিহিত আছে। স্পষ্ট ধারণার জন্য আমরা সেই বিচারের সন্ধান লইব। আমাদিগের প্রথম প্রশ্ন হইবে,—ব্রহ্ম বা মুখ্য কারণ কি? ভৃগু বরুণকে এই প্রশ্ন করিলে, গৌণ ও মুখ্য কারণে প্রভেদ সুস্পষ্ট হইবে বলিয়া বরুণ প্রথমে অন্নপ্রাণাদির উল্লেখ করিলেন ও পরে বলিলেন,—যাহা হইতে প্রাণিনিচয় উৎপন্ন হয়, উৎপত্তির পরে যাহার প্রভাবে জীবিত থাকে ও অন্তে যাহাতে পুনঃ প্রবেশ করে, তাহাই ব্রহ্ম(১)। এ নির্দ্দেশ কিন্তু বিশদ হয় নাই, যেহেতু ব্রহ্ম বা মূল কারণের স্বরূপ প্রদর্শনের পরিবর্ত্তে কেবল জীবরূপ কার্য্যের সহিত তাঁহার বিবিধ সম্বন্ধ প্রদর্শিত হইয়াছিল। সুতরাং ভৃগু উক্ত বিষয়গুলি পর পর একাগ্রচিত্তে পরীক্ষা করিলেন। তাঁহার

(১) তৈত্তিরীয় ৩।১ ;

প্রথম অনুমান হইল অন্নই ব্রহ্ম, যেহেতু অন্ন রসরক্তাদিতে পরিণত হইয়া জীবদেহ গঠন করে, সেই দেহ পুনরায় অন্নযোগে পরিপুষ্ট হয় ও অবশেষে বিশ্লিষ্ট হইয়া কোনপ্রকার অন্নের আকার ধারণ করে। কিন্তু এই অনুমান সন্তোষজনক না হওয়ায়, তিনি গভীরতর চিন্তার পরে স্থির করিলেন, দেহাভ্যন্তরস্থ প্রাণাখ্য বায়ুই ব্রহ্ম, যেহেতু তাহার শ্বাসাদি পঞ্চবিধ সঞ্চরণে জীবনের উন্মেষ হয়, এই সঞ্চরণ যাবজ্জীবন সহায় থাকে ও ইহার নিবৃত্তিতে জীবনের অবসান ঘটে। এ অনুমানেও কিন্তু তিনি সন্দিহান হইলেন, এবং পরে মন ও বুদ্ধি যথাক্রমে ব্রহ্মরূপে গৃহীত ও পরিত্যক্ত হইল(১)। ভৃগুর এতাদৃশ পুনঃ পুনঃ সংশয়ের হেতু সাধারণভাবে নির্দ্দেশ করিলে বলিতে হয়,—কোন সঙ্কীর্ণ শক্তি বা সত্তা চরম কারণ হইতে পারে না, যেহেতু সঙ্কীর্ণতা পারতন্ত্র্যের লক্ষণ। প্রাণবায়ুর বিবিধ গতি ব্যতীত অন্নময় দেহ সজীব থাকে না সত্য ; পরন্তু দেহও প্রাণবায়ুর আধার, অন্য অবলম্বন তাহার নাই। পুনশ্চ মন ও বুদ্ধির অভাবে জীবভাব সম্পূর্ণ হয় না, অথচ দেহ ও প্রাণের অভাবে তাহাদিগের প্রকাশ সম্ভব নহে। সুতরাং এই কারণ চতুষ্টয় পরস্পর-সম্বদ্ধ অর্থাৎ কোনটি অন্য-নিরপেক্ষ নহে। ব্রহ্ম কিন্তু সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষ, যেহেতু তিনি অদ্বয়।

ব্রহ্ম ও জড়বাদী বৈজ্ঞানিকের মৌলিক শক্তি

মুণ্ডক বলিয়াছেন,—ব্রহ্ম অন্তর্জ্জগৎ ও বহির্জ্জগতের চরম কারণ হইলেও তাঁহাতে প্রাণ, মন, ইন্দ্রিয়গ্রাম বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন মূর্ত্তি নাই ; সুতরাং তিনি দুর্বিজ্ঞেয় (২)। ব্রহ্ম কি তবে সার্ব্বভৌম ও মৌলিক শক্তিভাবে চিন্তনীয়? শক্তি প্রকৃতপক্ষে কি, সে আলোচনা পরে হইবে। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে

(১) তৈত্তিরীয় ৩।২-৫ (২) মুণ্ডক ২।১।২ ;

শক্তি সম্বন্ধে সাধারণ ধারণাই গ্রহণ করিব, নচেৎ শ্রুতির উপদেশ সুস্পষ্ট হইবে না। শক্তি পরোক্ষ অতএব স্বরূপে অপরিমেয়; তাহার ক্রিয়া কিন্তু দেশে বা কালে পরিমিত। ব্রহ্মও অমেয়; তথাপি দেশ ও কাল তাঁহার বিশ্বব্যাপী অভিব্যক্তির পটভূমিকারূপে বিদ্যমান। এ পর্য্যন্ত শক্তিরূপে ব্রহ্মের ধারণা শ্রুতির নির্দ্দেশ অতিক্রম করে না। কিন্তু কার্য্যের উদ্ভব হইলে শক্তির পৃথক্ সত্তা থাকে না, আর এই পরিণতির অবসান অবধি তাহা কার্য্য হইতে অভিন্নভাবে ব্যবহারযোগ্য হয়। কেবল তাহাই নহে, শক্তির প্রত্যেক প্রকাশ উপযোগী নিমিত্ত সাপেক্ষ, অর্থাৎ শক্তি প্রকাশে নিয়মানুবর্ত্তী, নিয়ন্তা নহে। মুণ্ডক কিন্তু বলিয়াছেন, ব্রহ্ম অবিকারী, অব্যবহার্য্য ও অব্যয়, অর্থাৎ সর্ব্ববিধ বিকাশ সত্ত্বেও তাঁহার রূপান্তর বা অপচয় নাই(১)। আর অন্য শ্রুতিতে বলা হইয়াছে, যাবতীয় ব্যক্তি ও বস্তু তাঁহার শাসনাধীন(২)। সুতরাং প্রকাশে তাঁহার অক্ষর ভাব ও প্রকাশের ধারায় তাঁহার অমোঘ নিয়ন্তৃত্ব শক্তিরূপে কল্পনা বাধিত করে।

ব্রহ্মচিন্তায় অবয়ব ও অবয়বী সম্বন্ধ

শক্তি সম্বন্ধে সাধারণ অভিজ্ঞতা যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পক্ষে যথেষ্ট নহে, তাহা আমরা দেখিলাম। এখন ব্রহ্ম সম্বন্ধে আর একটি পরিকল্পনার আমরা শ্রুতিসম্মত ব্যাখ্যা করিব। জবালা পুত্র সত্যকাম শুনিয়াছিলেন কিংবা নিষ্ঠার প্রভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন:—উত্তর, পূর্ব্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম, এই চারিদিক্ ব্রহ্মের প্রকাশবান নামক অবয়ব; পৃথিবী, সমুদ্র, অন্তরীক্ষ ও দ্যুলোক, এই দেশচতুষ্টয় ব্রহ্মের অনন্তবান নামক অবয়ব; সূর্য্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ ও অনল, এই চতুর্বিধ প্রভা ব্রহ্মের জ্যোতিষ্মান নামক অবয়ব; আর প্রাণন, দর্শন, শ্রবণ ও

(১) মুণ্ডক ১।১।৬; (২) বৃহদারণ্যক ৩।৮।৯

মনন, জীবভাবের এই চতুর্ধা পরিচয় ব্রহ্মের আয়তনবান নামক অবয়ব, যেহেতু ভোগার্থ তাবৎ বিষয় ইহারাই ব্যক্ত করে(১)। বিশ্ব ও বিশ্ববাসীর পারতন্ত্র্য প্রকাশার্থ সত্যকামের এই অনুভূতিই শ্রেষ্ঠ, কারণ অঙ্গী ব্যতীত অঙ্গ থাকে না। আধার-আধেয় বা আশ্রয়-আশ্রিত ভাবে যোগ নিত্য ও নিবিড় নহে, যেহেতু আহিত বস্তু পাত্রান্তরে স্থাপন করা যায়, ভৃত্যও অন্য প্রভুর শরণ লইতে পারে। কিন্তু চরম ও অদ্বয় অবলম্বন সম্বন্ধে এতাদৃশ স্বাতন্ত্র্য কাহারও নাই। বস্তুতঃ চরাচর যে ব্রহ্মের রূপ বা তনু, তদধিক কিছু নহে, তাহা উপনিষদে একাধিকবার উপদিষ্ট হইয়াছে।

তথাপি আপত্তি হইতে পারে,—জীব তাহার রূপ বা তনু সৃষ্টি করে না, ব্যবহার করে মাত্র, সুতরাং উক্ত উপদেশ অনুসারে ব্রহ্মকে তাঁহার সর্ব্বব্যাপী তনুর স্রষ্টা বলা যায় না। কিন্তু রূপকের সীমা ও উদ্দেশ্য স্মরণ রাখিতে হইবে। রূপক যুক্তি বা অনুমান নহে, জ্ঞাত বিষয়ের সহিত অজ্ঞাততত্ত্বের আংশিক সাদৃশ্য প্রদর্শনপূর্ব্বক সত্য প্রকাশের অন্যতম উপায়। বস্তুতঃ ব্রহ্মের সর্ব্বাধিষ্ঠাতৃত্ব এস্থলে বিবৃত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার স্রষ্টৃত্ব অস্বীকার করা হয় নাই। স্রষ্টৃত্বের উপদেশ আমরা অন্যত্র পাই, আর উভয়ের একত্র উল্লেখও বিরল নহে। কেনোপনিষৎ স্পষ্ট বলিয়াছেন, যিনি শ্রোত্র, বাক্ ও মনের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বর্গের কারণ তিনিই তাহাদিগের প্রবর্ত্তক, অর্থাৎ তাহাদিগের প্রত্যেক চেষ্টা তাঁহার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত(২)। কঠোপনিষদের উপদেশ আরও ব্যাপক, যেহেতু তাহাতে বলা হইয়াছে, তাবৎ চঞ্চল বা পরিণামী পদার্থ প্রাণস্বরূপ ব্রহ্মে উৎপন্ন হইয়া তাঁহাতেই প্রবর্ত্তিত হয়(৩)।

(১) ছান্দোগ্য ৪।৫-৮ ; (২) কেনোপনিষৎ ১।১,২ ; (৩) কঠোপনিষৎ ২।৩।২

বস্তুতঃ এতাদৃশ উপদেশের সপক্ষে যুক্তি আমরা সত্যকামের অনুভূতিতেই পাই। জীবদেহের উপাদান বিশ্ব হইতে সংগৃহীত হয়, আর জীব অবশভাবে সেই দেহে প্রবেশ করে। কিন্তু সমগ্র বিশ্ব যাঁহার দেহ, উপাদান সংগ্রহের স্বতন্ত্র আকর তাঁহার কোথায়? তিনি নিজেই দেহ সৃষ্টি করেন, আর সে দেহ প্রকৃতপক্ষে বিসৃষ্টি অর্থাৎ স্বসত্তার বহুধা প্রকাশ। সুতরাং বিশ্বসৃষ্টি ও জীবের ব্যবহারে সাদৃশ্য অল্পই। জীব অভাবের তাড়নায় কিংবা উন্নতির আশায় কর্ম্ম করে আর অপ্রাপ্ত বিষয় অর্জ্জন কিংবা প্রাপ্ত বিষয় রক্ষণ সেই কর্ম্মের উদ্দেশ্য হয়। কিন্তু ব্রহ্মের অতীত বিষয় নাই; অতএব লাভ বা সংরক্ষণের জন্য চেষ্টাও তাঁহার নাই। সুতরাং যুক্ত অনুমান এই, তাবৎ বস্তু ও ব্যক্তি তাঁহার বিচিত্র অথচ সম্বদ্ধ অবয়বরূপে স্বতঃ উদ্ভূত ও নিয়ন্ত্রিত হয়।

আর এক আপত্তি ঃ—অবয়ব অনুসারে অবয়বীর প্রবৃত্তি ও সামর্থ্য হইয়া থাকে; মানবের দৈহিক গঠনে আর তাহার অনুভূতি ও চেষ্টায় সামঞ্জস্য সুস্পষ্ট; ব্রহ্মের অবয়ব সঙ্কীর্ণ নহে সত্য; বিশ্ব তাঁহার অবয়ব; কিন্তু বিশ্ব প্রসারে ও বৈচিত্র্যে কল্পনাকে পরাভূত করিলেও দেশ ও কালকে অতিক্রম করে না; সুতরাং তিনি যে উপাধিমুক্ত ও বিকারবর্জ্জিত, এ অনুমান অসিদ্ধ। ঈদৃশ আপত্তির উত্তরও কিন্তু সত্যকাম আমাদিগকে দিয়াছেন। দেশরূপ বিশ্বের আধার অবয়ব চতুষ্টয়ের অন্যতম; কালও ঘটনাসমূহের আধার। কিন্তু তাহারা অধিকরণ মাত্র অর্থাৎ আহিত বিষয়ের সম্পর্কেই তাহাদিগের বাস্তবতা, নচেৎ তাহারা অবস্তু। অল্পজ্ঞ জীবের পক্ষে তাহাদিগের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে বটে, কারণ বিষয়ের যৎসামান্যই তাহার অধিগত। পরন্তু তাবৎ বিষয় যাঁহার প্রকাশ, দেশ ও কাল

তাঁহাকে পরিচ্ছিন্ন করে না, যেহেতু বিষয়ের ব্যাপ্তি বা বিষয় ও বিষয়ান্তরে ব্যবধান ব্যতীত তাহারা অন্য কিছু নহে।

সত্যকামের অনুভূতি অনুসারে জঙ্গম ও স্থাবর উভয়ই ব্রহ্মের অবয়ব। ইন্দ্রিয়গ্রাম ও চিত্ত অবয়বের মধ্যেই গণ্য, যেহেতু তাহারা বিবিধ ব্যাপারে নিয়োজিত হয়। কিন্তু অবয়বের এই ব্যাপক বর্ণনায় অবয়বীর পরিচয় সম্পূর্ণ হয় না। সুতরাং সত্যকাম উপকোসলকে বলিয়াছিলেন,—অবয়বী আত্মা অর্থাৎ যাবতীয় বোধের তিনি চরম আশ্রয়। প্রতি দেহে তিনি সমভাবে বর্ত্তমান, অথচ দেহগুলি নশ্বর হইলেও তাঁহার ক্ষয় নাই, অভিভবের আশঙ্কা নাই। পরিদৃশ্যমান বিশ্বও তাঁহাতেই উদ্ভাসিত, কারণ বোধেই তাহার পরিচয়। তাঁহাকে জানিলে সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল হয়, যেহেতু এমন কিছু বাঞ্ছনীয় নাই যাহা তাঁহার আশ্রিত নহে। তথাপি পদ্মপত্রে জলের মত তিনি নির্লিপ্ত(১)। অতএব উপদেশের তাৎপর্য্য এই,—ব্রহ্ম বা আত্মা স্বয়ংসিদ্ধ, অন্যনিরপেক্ষ, সতত ও সর্ব্বত্র একরূপ আর জীব ও জীবনিবাস তাঁহার জ্যোতিতে প্রকট বা বাস্তব।

ব্রহ্মের স্বরূপ ও প্রকাশ

ব্রহ্মের এই নির্লেপ ও সাম্য অথচ সর্ব্বব্যাপিত্ব বৃহদারণ্যকের একটি প্রসিদ্ধ মন্ত্রে ঘোষিত হইয়াছে(২)। তাহার ভাবার্থ নিম্নে দিলাম। ব্রহ্ম স্বরূপে ইন্দ্রিয়াদির অগোচর, সুতরাং সীমা বা বিভাগ তাঁহাতে আরোপ করা যায় না। প্রকাশেও তিনি ব্যাপক ও নিরন্তর, যদিও দেশকালরূপ উপাধিদ্বয়ের রচনা অনুসারে সেই প্রকাশ বহুধা বিচ্ছিন্ন হয়। বস্তুতঃ পরিচ্ছেদ, বিভাগ ও লয়োদয় প্রকাশে অনিবার্য্য, যেহেতু দেশকালেই প্রকাশ সম্ভব, তাহার অন্য বিধা নাই। ব্রহ্মসত্তা কিন্তু ঈদৃশ অভিব্যক্তি সত্ত্বেও অখণ্ড ও অবিকৃত

(১) ছান্দোগ্য ৪।১৪-১৫; (২) বৃহদারণ্যক ৫।১।১

থাকে, ইহা বলিতে হইবে, নচেৎ স্বীকার করা হয় যে তাহা অভিব্যক্তির অন্তর্গত অর্থাৎ চরম কারণ নহে। আর অভি-ব্যক্তির সম্যক্ অবসানেও সেই চরম কারণের যে অপচয় হয় না, ইহাও স্বীকার্য্য, যেহেতু অপচয় বা উপচয় দেশে বা কালেই হইয়া থাকে, আর ইহারা প্রকাশ্যের অধিকরণ, প্রকৃত প্রকাশকের নহে।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে প্রকাশক বলিতে কি বুঝিব? সমগ্র বিশ্ব কোন জীবের জ্ঞানে প্রতিভাত হয় না; আর তাহার বিবিধ অংশ বিভিন্ন জীবের জ্ঞানে প্রতিফলিত হইলেও, কোন অংশের অস্তিত্বে তাদৃশ প্রতিফলনের অপেক্ষা নাই। অথচ দৃশ্যাত্মক বিশ্ব যে স্বতন্ত্রভাবে থাকিতে পারে না তাহাও স্পষ্ট। সুতরাং অন্য প্রকার জ্ঞান অবশ্যই আছে, যাহাতে বিশ্ব উদ্ভূত হয়, প্রতিষ্ঠা লাভ করে ও অবশেষে বিলীন হয়। জীবের জ্ঞান লয়োদয়শীল ও তাহার হ্রাসবৃদ্ধি দৃশ্যের মতই অনুভবযোগ্য, অধিকন্তু তাহা দৃশ্য বা পরিস্থিতির অনুবর্ত্তী। কিন্তু এই জ্ঞান যাবতীয় দৃশ্য ও অবস্থার অবলম্বন। অতএব ইহাই প্রকৃত প্রকাশক। উপনিষৎ ইহাকে আত্মা ও জ্যোতিঃপুরুষ বলিয়াছেন(১)।

আপত্তি হইতে পারে:—প্রকাশে যিনি ওতপ্রোতভাবে বর্ত্তমান, অপ্রকাশে তাঁহার সঙ্কোচ অবশ্যম্ভাবী; শ্রুতিও তাঁহার তপস্যা ও উপচয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, আর অপচয় উপচয়ের অনুগামী; সুতরাং প্রলয় ও সৃষ্টিতে ব্রহ্মের ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, এরূপ ধারণা যুক্তিযুক্ত নহে। কিন্তু যিনি এক ও অদ্বয় অর্থাৎ স্বরূপে সীমা ও বিভাগবর্জ্জিত, তাঁহার পক্ষে প্রসার ও সঙ্কোচ অর্থহীন শব্দমাত্র। আর জ্ঞানই তাঁহার অনায়াস-লক্ষণ

(১) বৃহদারণ্যক ৪।৩।৭

তপস্যা ও বিশ্ব তাহাতে প্রতিভাত বা বাস্তব হয়; অন্য প্রকার বাস্তবতা বিশ্বের নাই। প্রলয়ে সেই প্রকাশের অবসান হয় বটে; কিন্তু তাহা ব্রহ্মের অবসাদ বা অপচয় বশতঃ নহে; প্রকাশাত্মক বিষয়নিবহের পরিণামক্রমে তাহা অবশ্যম্ভাবী যতি। বিশ্বে প্রত্যেক বস্তুই সঙ্কীর্ণ ও বিকারী; অথচ নিত্য পদার্থের অভিব্যক্তি বলিয়া তাহার অত্যন্ত নাশ নাই: সুতরাং আপাতলয় তাহার নবরূপে উদয়ের ভূমিকা। যখন সমষ্টির এই প্রকার পরিণতি অনিবার্য্য হয়, তখনই প্রলয় ঘটে।

বিচারের ক্ষীণ ও অনিশ্চিত আলোকে, ঋষির অপূর্ব্ব অনুভূতির যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দিলাম। যে অসাধারণ তপস্যার প্রভাবে ঈদৃশ উপলব্ধি হয়, তাহার যথাসম্ভব ব্যাখ্যা পরে দিব। মুণ্ডকে এই উপলব্ধির বিস্তৃত বর্ণনা আছে, কিন্তু দৃষ্টি ব্রহ্মের পূর্ণতার দিকে নহে, তাঁহার প্রকাশান্তর্গত বিভিন্ন ভাবের প্রতি। সুতরাং আমাদিগের চিরাভ্যস্ত চিন্তাধারা অনুসারে তাহাতে আমরা চেষ্টাসাপেক্ষ ক্রমবিকাশের সন্ধান পাই। বিবৃতিটি এইরূপ:—ব্রহ্ম স্বরূপে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অগোচর ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অব্যবহার্য্য, অর্থাৎ জড় পদার্থের গুণ তাঁহাতে নাই। অথচ তাঁহাতে জ্ঞানার্জ্জন ও কর্ম্মসম্পাদনের উপায়ভূত ইন্দ্রিয়গ্রামের অভাব। আর অদ্বয় কারণ বলিয়া তিনি কারণান্তরের গুণযুক্ত নহেন। কিন্তু সৃষ্টির উপযোগী প্রবৃত্তির উন্মেষে তাঁহাতে প্রকৃতির বা ভোগ্য জগতের বীজ উদ্ভূত হয়। সেই অব্যাকৃত প্রকৃতিতে প্রাণ, মন ও শব্দস্পর্শাদি তন্মাত্রপঞ্চকের উৎপত্তি ঘটে। এই পঞ্চ সূক্ষ্মভূতই বাহ্য বাস্তবতার মূল; সুতরাং তাবৎ জীবনিবাস ইহাদিগের বিবিধ সংঘাত। আর সেই নিবাসগুলিতে প্রাণিগণ

আবহমানকাল কর্ম্মে নিযুক্ত থাকে ও কর্ম্মফল ভোগ করে(১)।

নিরুপাধি ও সোপাধি ব্রহ্মে তাত্ত্বিক ভেদ নাই

তবে কি মূল কারণ অনুদ্ভূত শক্তি বলিয়া অনির্দ্দেশ্য, যদিও তাহাই যথাক্রমে অগণিত বোধে ও বোধ্য বিষয়ে পল্লবিত হয়? অর্থাৎ শ্রুতি কি সত্তার নিম্নতম স্তর হইতে ক্রমিক উৎকর্ষের বর্ণনা দিয়াছেন? এই সংশয় নিরসনার্থ উক্ত বর্ণনার পরেই স্পষ্ট ভাষায় বলা হইয়াছে :—ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ, বস্তুতঃ পূর্ণজ্ঞানই তাঁহার অযত্নসম্ভূত তপস্যা(২)। কঠোপনিষৎ বলিয়াছেন বটে, পঞ্চভূতের সহিত বিশ্বপাতার আবির্ভাব হয়(৩)। সুতরাং সন্দেহ হইতে পারে যে আদি কারণ প্রথমে অসম্পূর্ণ ছিলেন, যদিও কালবশে ও গৌণ কারণ বা উপাধি সহযোগে তিনি পূর্ণতা প্রাপ্ত হন। কিন্তু নিরুপাধিক ভাবকেই শ্রুতিতে পূর্ণ বা পরম আখ্যা দেওয়া হইয়াছে; বিশ্বের নিয়ন্তৃত্ব তাহার তুলনায় অপর বা অশ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রখ্যাত।

এই উপদেশের সপক্ষে যুক্তি কিরূপ? নির্দ্দেশে নিষেধ সূচিত হয়, আর সীমানির্ণয় ব্যতীত স্পষ্ট বা বিচারসহ বর্ণনা বা ধারণা সম্ভব নহে। সুতরাং যিনি সর্ব্বগত ও সর্ব্বাশ্রয় তাঁহাকে অনির্দ্দেশ্য বা বাক্য ও মনের অগোচর বলাই সঙ্গত। তাঁহাকে ইন্দ্রিয়যুক্ত পুরুষ বলিলে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু তাঁহার বাহিরে রহিয়া যায়। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়রূপে তাঁহাকে চিন্তা করিলে, ইন্দ্রিয়গ্রামের উৎপত্তি রহস্যাবৃত থাকে। অতএব নির্দ্দেশের অযোগ্য বলায় তাঁহাকে নিঃস্ব বলা হয় না, ভাষা ও ভাবের দারিদ্র্যই প্রচার করা হয়। প্রকাশে তিনি উপাধি অঙ্গীকার করেন বটে, যেহেতু উপাধি ব্যতীত প্রকাশ অসম্ভব। আর সেই প্রকাশের বর্ণনায় শ্রুতিও মুখর, কারণ তাহাতে

(১) মুণ্ডক ১।১।৮; (২) মুণ্ডক ১।১।৯; (৩) কঠোপনিষৎ ২।১।৬

অনুপম জ্ঞান ও শক্তির পরিচয় বর্ত্তমান। তথাপি প্রকাশ ও স্বরূপে অভেদ উপদিষ্ট হইয়াছে, কারণ ব্রহ্মের প্রকাশ অবাধ, অযত্নসম্ভূত ও অন্যনিরপেক্ষ। কঠোপনিষৎ বলিয়াছেন, যে দেবতায় সূর্য্যের উদয় ও অস্ত, যাঁহাতে অপর সকল দেবতা অবস্থিত, যাঁহাকে কেহই অতিক্রম করে না, তিনিই কার্য্য-কারণের অতীত পরব্রহ্ম(১)।

উত্তরকালে কিন্তু ব্রহ্ম সম্বন্ধে এই দ্বিবিধ পরিকল্পনা পৃথক্ তত্ত্বদ্বয়ে উন্নীত হয়। তাহাদিগের একটি জগৎ সম্পর্কে ব্যাপক ও নিয়ামক; অন্যটির স্বরূপেই চির অবস্থান, অর্থাৎ পরিণাম ও উপাধির সংস্পর্শ সে স্বরূপে নাই, যদিও তাহার মৌলিকতা স্মরণ করিয়া তাহাকেই চরম কারণ বলা হইল। কিন্তু কঠোপনিষদের উপদেশে ঈদৃশ পার্থক্যের সমর্থন নাই, আর অন্য প্রামাণিক উপনিষদে অনুরূপ উপদেশই প্রদত্ত হইয়াছে। সুতরাং নিরুপাধি ও সোপাধি ব্রহ্মে ভেদ বিচারে, বাস্তবে নহে, ইহাই সঙ্গত অনুমান। ধারণা সুকর হইবে বলিয়া শ্রুতি এক ও অদ্বিতীয় তত্ত্বকে যেন দ্বিধা বিভক্ত করিয়াছেন, তাঁহার অনির্দ্দেশ্য ভাব স্মরণ করিয়া তাঁহাকে নিরুপাধি আখ্যা দিয়াছেন আর তাঁহার অশেষবিধ বিকাশে দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহাকে সোপাধি বলিয়াছেন। আপত্তি হইতে পারে বটে যে কঠোপনিষৎ ও বৃহদারণ্যক উভয়েই সৃষ্টিপ্রসঙ্গে সোপাধি ব্রহ্মের উৎপত্তির উল্লেখ আছে, সুতরাং তিনি জাত অর্থাৎ নিরুপাধি ব্রহ্মের মত নিত্য নহেন। কিন্তু এই উৎপত্তি দেশে বা কালে হইতে পারে না, যেহেতু সোপাধি ব্রহ্মের আবির্ভাবের পূর্ব্বে দেশ ও কালের অস্তিত্ব স্বীকার করিলে বিরুদ্ধ কথা বলা হয়। বস্তুতঃ সৃষ্টি ও প্রলয় পর্য্যায়ক্রমে অনাদি ও অনন্ত,

(১) কঠোপনিষৎ ২।১।৯

যিনি সর্ব্বাশ্রয় তাঁহার প্রকাশে নিমিত্ত বা সহকারী কারণের অপেক্ষা নাই, আর দেশ ও কাল অন্যান্য প্রকাশ্যের অধিকরণ হইলেও প্রকাশেরই অন্তর্গত, অতএব প্রকাশকের সীমাবন্ধন নহে। সুতরাং ভাবদ্বয়ের মধ্যে স্বরূপ মুখ্য ও প্রকাশ গৌণ এই তত্ত্বই সৃষ্টির বর্ণনায় শ্রুতি উপদেশ দিয়াছেন।

ব্রহ্ম অন্যনিরপেক্ষ, সুতরাং স্বপ্রকাশ। বিশ্বও তাঁহার প্রকাশ যেহেতু তিনি সর্ব্বকারণ, সর্ব্বাশ্রয়। কিন্তু বিশ্ব বিষয় বা জ্ঞেয় বস্তুর সমাহার, আর সমাহার বা সংগ্রহ দেশে ও কালেই সম্ভব। সুতরাং ইহারা বিশ্বপ্রকাশের বিধি। ইহাদিগকে প্রকাশকের স্বরচিত আধান বলিলেও দোষ নাই, যেহেতু তাঁহার প্রকাশিত বিশ্ব দেশে বিস্তৃত ও কালে বিকৃত। কিন্তু দেশকাল তাঁহাকে পরিচ্ছিন্ন করে না, অর্থাৎ তিনি সোপাধি হইলেও সসীম নহেন। সত্য বটে, বস্তুমাত্রেই লয়োদয়শীল, আর সমষ্টিও এই নিয়মের অধীন। কিন্তু প্রকাশ্যের এবম্বিধ পরিণাম হইতে প্রকাশকের ক্ষতিবৃদ্ধি অনুমান করা অসঙ্গত। দ্রব্যসম্ভারে পূর্ণ ও দীপালোকে উজ্জ্বল গৃহ দ্রব্যশূন্য হইলে দীপালোকের হ্রাস হয় না। তবে প্রশ্ন হইতে পারে দীপ ও গৃহসজ্জায় প্রভেদ সুস্পষ্ট; ব্রহ্ম ও বিশ্বে কি তাদৃশ পার্থক্য বর্ত্তমান? কিন্তু ইহার উত্তর পূর্ব্বেই দিয়াছি, ব্রহ্ম সাধারণ প্রকাশকের মত নহেন, যেহেতু তিনি প্রকাশ্যের উপাদান ও আশ্রয়। ঘট চূর্ণ হইলে মৃত্তিকারূপ উপাদান বা আকাশরূপ আশ্রয় বিলুপ্ত হয় না। অধিকন্তু, মৃত্তিকা ও আকাশের লয় কল্পনা করা যায়, অথচ চরম তত্ত্বের অভাব কল্পনীয় নহে। অতএব সংসারের একমাত্র আশ্রয় হইলেও তিনি সেই প্রবাহের অতীত, উপাদান হইলেও উৎপন্ন পদার্থ হইতে ভিন্ন।

দার্শনিক মায়াবাদ ও শ্রৌত অদ্বৈতবাদ

আদি কারণ ও তাহার কার্য্যে এই অসঙ্গতি, বোধ হয়, দ্বিবিধ ব্রহ্মকল্পনার প্রকৃত হেতু। কিন্তু এ কল্পনায় সমস্যার সমাধান হয় না, যেহেতু সর্ব্বাতীত হইতে সর্ব্বগতের আবির্ভাব তর্কশাস্ত্রমতে প্রহেলিকা। সুতরাং পরবর্ত্তী যুগে গৌড়পাদ ও শঙ্করপ্রমুখ দার্শনিকগণ সমস্যার সমাধানার্থ সিদ্ধান্ত করিলেন যে নিরুপাধি ব্রহ্মই একমাত্র সত্তা আর জগৎ অসৎ যদিও দৃষ্টিদোষে তাহা অত্যন্ত বাস্তব বলিয়া গৃহীত হয়। এই সিদ্ধান্তের সপক্ষে যে বিশাল ও তর্কবহুল দর্শন রচিত হইয়াছে তাহার আলোচনা এস্থলে নিষ্প্রয়োজন, কারণ ইহা শ্রুতিসঙ্গত মনে হয় না। কোন কোন উপদেশে ইহা সমর্থিত হইয়াছে, বলা হয় বটে; কিন্তু তাহাদিগের অন্য অর্থও সম্ভব। আর উক্ত দর্শনে মায়া ও অসৎ শব্দের প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে মতভেদের অবকাশ আছে। যাহা হউক, এ বিষয়ে শ্রুতির কয়েকটি সুস্পষ্ট উক্তির মর্ম্ম দিলাম। ছান্দোগ্য বলিয়াছেন,—ভাবং পদার্থ সৎস্বরূপ ব্রহ্মে উৎপন্ন হয়, তাঁহাতে স্থিতি করে ও তাঁহাতেই লয়প্রাপ্ত হয়, সুতরাং সমগ্র জগৎ ব্রহ্মময়(১)। বৃহদারণ্যক বলিয়াছেন,—যাবতীয় জীব ও জীবলোক ব্রহ্মে আবির্ভূত হয়, আর উহারা সত্য বলিয়া তিনি সত্যের সত্য(২)। মুণ্ডক বলিয়াছেন,—জীবদেহে কেশলোমের উদ্‌গমের মত অক্ষর ব্রহ্মে বিশ্বের উদ্ভব(৩)। আর মাণ্ডুক্যের মতে সমগ্র জীবনিবাস ও জীব ব্রহ্মই যদিও উহাদিগের উল্লেখে তাঁহার বর্ণনা সম্পূর্ণ হয় না(৪)।

কিন্তু শ্রুতির ভাষা পরীক্ষা করিয়া বলা হইয়াছে,—ব্রহ্মবিষয়ক উপদেশে পরস্পর-বিরুদ্ধ বিশেষণের যোজনা

(১) ছান্দোগ্য ৩।১৪।১; (২) বৃহদারণ্যক ২।১।২০;
(৩) মুণ্ডক ১।১।৭; (৪) মাণ্ডুক্য ১;

দেখা যায়, সুতরাং একই নামে একাধিক তত্ত্বের নির্দ্দেশ শ্রুতির অভিপ্রেত। সত্য বটে, গুণ বা লক্ষণের এরূপ সন্নিবেশ কোন পদার্থে প্রত্যক্ষ করি না, আর বিচারের বিধি অনুসারেও বিপরীত গুণের সংযোগ সম্ভাবনার মধ্যে গণ্য নহে। কিন্তু দেশে বা কালে অবচ্ছিন্ন বস্তুই প্রত্যক্ষ বা ইন্দ্রিয়গোচর হয়, আর অনুমানের নিয়মগুলি তাদৃশ ভূয়োদর্শনে প্রতিষ্ঠিত। পক্ষান্তরে ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় নহেন। অতএব ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসায় এই নিয়মগুলির সঙ্কেত যে অভ্রান্ত তাহা অঙ্গীকার করা যায় না। বস্তুতঃ তাঁহার সম্বন্ধে দ্বিবিধ ও আপাতবিরুদ্ধ ধারণাই সমীচীন বোধ হয়, কারণ তিনি আকাশরূপ ব্যাপকের আধার অর্থাৎ দেশ ও কাল তাঁহাতেই ওতপ্রোত-ভাবে অবস্থিত অথচ তিনি অস্থূল, অনণু আর অন্তর ও বাহ্য বর্জ্জিত(১)। যাজ্ঞবল্ক্য ঔপনিষদ পুরুষের এই প্রকার বর্ণনা দিয়াছেন। তাহার তাৎপর্য্য এই,—স্বয়ংসিদ্ধ ও সর্ব্বাশ্রয় ব্রহ্ম যথার্থতঃ অপরিমেয়, সুতরাং ধারণার জন্য তাঁহার বিস্তৃত বিবৃতিতে প্রবৃত্ত হইলে পরস্পর-বিরুদ্ধ বিশেষণের ব্যবহার অনিবার্য্য।

কিন্তু বিশ্বরূপ তাঁহার কার্য্যেও নানাবিধ দ্বন্দ্ব বা বিসদৃশভাব বর্ত্তমান। জাড্য ও চেতনা, স্থিতি ও গতি, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, সুখ ও দুঃখ বিশ্বব্যাপী বৈষম্যের সুপরিচিত উদাহরণ। সুতরাং সংশয় হয়, একাধিক বিসদৃশ কারণের সংযোগে বিশ্ব উদ্ভূত হইয়াছে অথবা দ্বন্দ্বময় বিশ্বের ব্যবহারিক মূল্য যাহাই হউক না কেন, তাহা প্রকৃতপক্ষে মরীচিকার মত অসতের বিস্তার। কিন্তু শ্রুতির উপদেশ অন্যরূপ, কারণ শ্রুতির মতে এক ও অদ্বয় সৎপদার্থে বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়

(১) বৃহদারণ্যক ৩।৮।৭-৮

হয়, সুতরাং বিশ্বে বিরোধ আপাত বা নিগূঢ় হউক, তাহার হেতু সেই তত্ত্বেই অনুসন্ধেয়, যেহেতু অন্য কিছু নাই।

সত্যনির্ণয়ে শ্রুতির ও দর্শনের পদ্ধতি

শঙ্করপ্রমুখ দার্শনিকগণ শ্রুতির উপদেশ উপেক্ষা করেন নাই, পরন্তু তাহার তাৎপর্য্য প্রকাশের জন্য শব্দার্থ নির্ণয়ে ও সূক্ষ্ম বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এইরূপে বিবিধ দর্শনের সৃষ্টি হয়, সুতরাং তত্ত্বের সহিত ঈদৃশ দর্শনের সম্বন্ধ পরোক্ষ বা ব্যবহিত। কঠোপনিষৎ বলিয়াছেন, তর্ক ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপায় নহে(১)। বস্তুতঃ দর্শনের পদ্ধতি ও শ্রুতিসম্মত জ্ঞানসাধন ভিন্ন। তৈত্তিরীয় ইহাকে তপস্যা বলিয়াছেন। ভৃগু পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ প্রার্থনা করিলে তপস্যা করিতে বার বার আদিষ্ট হইয়াছিলেন(২)।

মুণ্ডক বলিয়াছেন,—এই তপস্যার জন্য বহু শাস্ত্রে অধিকার নিষ্প্রয়োজন; শাস্ত্রার্থ নিরূপণে অসামান্য নিপুণতাও আবশ্যক হয় না; এমন কি, শাস্ত্রের বিশেষ অনুশীলন বাহুল্যমাত্র। অলীক ও অপবিত্র চিন্তা ত্যাগ করিলে চিত্ত নির্ম্মল হয়, আর তখন পরমতত্ত্ব ধ্যান করিলে তিনি প্রত্যক্ষ হন। অতএব যে ক্লেশসহনে অপারগ কিংবা উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অনবস্থিত কিংবা বিষয়বৈরাগ্যে অনভ্যস্ত, তাহার পক্ষে এই তপস্যা অসম্ভব। পরন্তু যিনি একান্ত আগ্রহ সহকারে ব্রহ্মধ্যানে নিযুক্ত হন অর্থাৎ অন্য বাসনা সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করেন, তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান সুস্পষ্ট ও সুনিশ্চিত হয়(৩)। দর্শনে কিন্তু বিচারই প্রধান, আর যুক্তিযুক্ত অনুমানে তাহার পরিসমাপ্তি। শ্রৌত সাধনায় বিচারের যে স্থান নাই, এমন নহে, যেহেতু উপদেশের মর্ম্মগ্রহণার্থ কিছু বিচারের প্রয়োজন হয়;

(১) কঠোপনিষৎ ১।২।৯; (২) তৈত্তিরীয় ৩।২-৫;
(৩) মুণ্ডক ৩।২।৩-৫;

তথাপি চিত্তশুদ্ধি ও অভিনিবেশই মুখ্য। পূতচিত্তের এই অভিনিবেশ শাস্ত্রে যোগ নামে প্রখ্যাত, আর কঠোপনিষদে ইহার একটি সংক্ষিপ্ত অথচ বিশদ বর্ণনা আমরা পাই। মৃত্যু বলিয়াছেন, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত মন ও বুদ্ধি বিষয়গ্রহণে বিরত হইলে যোগ নিষ্পন্ন হয়, যোগও কিন্তু প্রথমে লয়োদয়শীল, সুতরাং তাহাকে স্থায়ী করিবার জন্য প্রযত্ন আবশ্যক, এই প্রযত্ন সফল হইলে অর্থাৎ বিক্ষোভের সম্ভাবনা পর্য্যন্ত না থাকিলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়(১)।

কিন্তু সতর্ক ইন্দ্রিয়গ্রাম আর সক্রিয় মন ও বুদ্ধি সাধারণতঃ জ্ঞান অর্জ্জন করে। সুতরাং শঙ্কা হইতে পারে যে তাহাদিগের নিশ্চেষ্টভাব জ্ঞানলাভের উপায় নহে, জ্ঞানলোপের উপক্রম। অতএব উত্তরে বলি, ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়বোধের মত নহে, কারণ মন প্রভৃতি করণবর্গ তাঁহাকে আবিষ্কার করে না, বরং তাঁহার প্রভায় আবিষ্কৃত বা প্রকট হয়। বস্তুতঃ ব্রহ্ম আর যাহাই হউন, তিনি বিজ্ঞানময়, নচেৎ জগৎ প্রকাশিত হইত না। সুতরাং যে মন প্রকাশ্য জগতের পরিচয় লইতে সমর্থ, তাহার পক্ষে প্রকাশক ব্রহ্মের জ্ঞানও স্বাভাবিক। কিন্তু স্বাভাবিক হইলেও তাহা সাধারণ নহে। তাহার কারণ মনের চাঞ্চল্য ও সঙ্কীর্ণতা আর রাগদ্বেষের প্রভাব। বহির্মুখ ইন্দ্রিয়বর্গের ইঙ্গিতে মন সতত উপভোগ্য বস্তু সন্ধান করে কিংবা অপ্রিয় বস্তু বর্জ্জনে ব্যস্ত থাকে। ঈদৃশ মনে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা বিফল হয়, কারণ প্রেয়লাভে আগ্রহজনিত প্রমাদ বা অনবধানতা উদ্যম ব্যর্থ করে। আর তখন প্রতিভা বা পাণ্ডিত্য কার্য্যকর হয় না, যেহেতু প্রতিষ্ঠার জন্য স্বমত সমর্থনে বা পরমত খণ্ডনে

(১) কঠোপনিষৎ ২।৩।১০, ১১

তাহারা ব্যবহৃত হয়। ফলে যুক্তিতর্কের অপরূপ সৌধ রচিত হইলেও ব্রহ্ম অজ্ঞাত থাকেন, কারণ বিতর্কপ্রবণ মন তাঁহার সম্বন্ধে উপযুক্ত ধারণা করিতে অক্ষম। নিত্য ব্যবহারেও অনুরূপ অজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। রবিকরে জগৎ উদ্ভাসিত হইলেও রবিকে দেখি না, কারণ আমার প্রয়োজন অন্যান্য বস্তুতে। সেইরূপ অপর, অবান্তর বিষয়ে অনুরাগ বা আস্থা থাকায় ব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধি হয় না।

অপরোক্ষ জ্ঞান ও অনুমান

কিন্তু চিত্ত নির্ম্মল, শান্ত ও ব্রহ্মনিষ্ঠ হইলে ব্রহ্ম তাহাতে স্বতঃ প্রতিভাত হন। আর তিনি অন্যনিরপেক্ষ বলিয়া এই অনুভব ইন্দ্রিয়লব্ধ বস্তুজ্ঞান অপেক্ষাও নির্দ্দোষ, সম্পূর্ণ ও অব্যবহিত হয়। ইহাকেই উপনিষৎ ভাব ও ভাষার সম্পদে বরণীয় করিয়াছেন, আখ্যায়িকা ও উপমার আলোকে যথাসম্ভব পরিস্ফুট করিয়াছেন। ব্রহ্ম উপনিষদের প্রতিপাদ্য বটে; কিন্তু পবিত্র ও একাগ্র অন্তঃকরণের নিরপেক্ষ সাক্ষ্যই তাঁহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ, দার্শনিকের সূক্ষ্ম বিচার কিংবা পণ্ডিতের কষ্টকল্পনা মুখ্য প্রমাণ নহে। তর্ক অপ্রতিষ্ঠ, কিন্তু প্রত্যক্ষ বিসংবাদের অতীত ও শব্দানুগ অনুমান অপেক্ষা পূর্ণাঙ্গ। উপনিষদে যুক্তিতর্কের আভাস আছে সত্য, আর বিষয়টি সুগম হইবে এই আশায় আমরা তাহারই অনুসরণ করিতেছি: কিন্তু উপনিষদের শ্রেষ্ঠ উপদেশ দার্শনিক সিদ্ধান্ত নহে, ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, নচেৎ সংশয়সঙ্কুল মধ্যপথে ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার পরিসমাপ্তি অনিবার্য্য।

যাহা হউক, আরও কিছু দূর আমরা সংশয়ের পথেই অগ্রসর হইব। ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ অর্থাৎ বিশ্বের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ শ্রুতিতে স্পষ্ট ভাষায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

তাঁহাতে বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় হয়; জীবহৃদয়ে তিনি অন্তর্যামিরূপে অধিষ্ঠিত, আর জীবলোকে তিনি সেতুস্বরূপ অর্থাৎ সংখ্যাতীত বৈচিত্র্যের মধ্যে তিনি যোগসূত্র। কিন্তু স্বরূপে তিনি কি, অর্থাৎ বিশ্বকে অতিক্রম করিয়া তিনি কোন্ ভাবে অবস্থিত? দার্শনিক হয় ত বলিবেন, এই প্রশ্নের উত্তর শ্রুতিতে অস্পষ্ট, প্রহেলিকার মত, অজ্ঞতাখ্যাপক শব্দবেষ্টনীর অন্তরালে প্রচ্ছন্ন। বৃহদারণ্যকের মতে, তিনি কোন জ্ঞাত বা কল্পিত বিষয়ের মত নহেন, অথচ তাঁহাকে লঙ্ঘন করে এমন কিছুই নাই(১)। কেনোপনিষদের সিদ্ধান্ত,—ব্রহ্ম জ্ঞানের বিষয় নহেন, এই উপলব্ধিই প্রকৃত জ্ঞান; তাঁহাকে জানিয়াছি এরূপ ধারণা ভ্রমাত্মক; তথাপি তিনি বিদিত না হইলেও অবিদিত নহেন(২)। কঠোপনিষদের স্বীকারোক্তি আরও স্পষ্ট:—তিনি চক্ষু প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অগোচর, চিন্তার অতীত আর বাক্য দ্বারা অনির্দ্দেশ্য(৩)। অতএব শঙ্কা হইতে পারে ব্রহ্ম সম্বন্ধে আলোচনা বিড়ম্বনা মাত্র।

ব্রহ্মের স্বরূপ অজ্ঞেয় নহে

উপনিষদে কিন্তু অজ্ঞেয়বাদ উপদিষ্ট হয় নাই; বরং ব্রহ্ম যে জ্ঞেয় ও ধ্যেয় তাহাই বার বার বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ জ্ঞান ও জ্ঞানের উপায় সম্বন্ধে সঙ্কীর্ণ ধারণা এই সংশয়ের প্রকৃত কারণ। ব্যবহারিক জ্ঞানে জ্ঞাত বিষয় ও বিষয়ী বা জ্ঞাতা অল্লাধিক স্বতন্ত্রভাবে প্রকট হয়। প্রকাশের ইহাই সাধারণ নিয়ম, অর্থাৎ প্রত্যক্ষে ও অনুমানে ইহার ব্যতিক্রম হয় না। ব্রহ্মজ্ঞানে কিন্তু এতাদৃশ দ্বৈতের অবকাশ কোথায়? তিনি বিষয় হইলে বিষয়ী হইবে কে? অতএব বিষয়ী বিষয়ে

(১) বৃহদারণ্যক ৩।৮।৮,৯; (২) কেনোপনিষৎ ২।২,৩;
(৩) কঠোপনিষৎ ২।৩।১২

ভদ যদি জ্ঞানের অবিযোজ্য লক্ষণ হয়, চরম তত্ত্বের উপলব্ধি
সই জ্ঞানের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না। কিন্তু পূর্ব্বেই
লা হইয়াছে, শুদ্ধ ও সমাহিত চিত্তে ব্রহ্ম স্বতঃ প্রতিভাত
ন; নিবিড় ধ্যান বা সমাধির ইহাই সিদ্ধি। তথাপি শ্রুতির
ই আশ্বাসে সংশয় সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত হয় না, কারণ
্যানের জন্য ধ্যেয় কি তাহা জানা আবশ্যক; তাহার তটস্থ
লক্ষণ ধ্যান করিলে সম্বন্ধবোধই স্ফুটতর হয়; আর ইহা নহে,
ইহা নহে, কেবল এতাদৃশ নিষেধ বাক্য দ্বারা কোন তত্ত্বই
অবধারিত হয় না। অথচ যাঁহারা সমাধিবলে মনের সঙ্কীর্ণতা
অতিক্রম করিয়াছিলেন; তাঁহাদিগের উপদেশেও ভাষার দৈন্য
স্পষ্ট নির্দ্দেশের পক্ষে অন্তরায় হইয়াছিল। সুতরাং প্রকাশের
বর্ণনায় স্বরূপের যে আভাস পাওয়া যায়, তাহাই অপাততঃ
আমাদিগের সম্বল। আর যুক্তিতর্কের সাহায্যেই তাহা
হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে, যেহেতু সমাধিলভ্য পূর্ণজ্ঞানের আমরা
অধিকারী নহি।

বিশুদ্ধ আত্মভাবে এই স্বরূপের পরিচয়

শ্রুতি বলিয়াছেন, হৃদয়ে যে আত্মভাব সতত বর্ত্তমান,
সাধক তাহাকেই ব্রহ্মরূপে গ্রহণ করিবেন। এই আদেশের
সারবত্তা নিম্নে সবিস্তারে ব্যাখ্যাত হইতেছে। যাহা অবস্থা-
বিশেষে প্রত্যক্ষ বা অনুমিত হয়, যাহার অভাব কল্পনা করা
সম্ভব, তাহাকে ব্রহ্ম বা মূল কারণ বলা যায় না, যেহেতু
মূল কারণ অন্যনিরপেক্ষ অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ। বিশ্বে যাহা কিছু
আছে, সকলেরই অভাব কল্পনা করিতে পারি, কিন্তু আপনার
অভাব কল্পনার অতীত, কারণ তাদৃশ কল্পনার জন্য আপনার
অস্তিত্ব অঙ্গীকার করিতে হয়। শঙ্কা হইতে পারে, মূর্চ্ছা
ও সুপ্তিতে এই আত্মবোধের অবসান ঘটে। কিন্তু যাহা
এইরূপে লুপ্ত হয়, তাহা প্রকৃতপক্ষে দেহাত্মজ্ঞান, দেহে চেতনার

বিকাশ। সুতরাং বিশুদ্ধ আত্মবোধে শ্রুতিনির্দ্দিষ্ট নিষেধের সীমা অতিক্রম করি অর্থাৎ তত্ত্বের সন্ধানে ইহা প্রত্যাখ্যাত হয় না। বস্তুতঃ আমার অভিজ্ঞতায় আত্মবোধ কেবল অনপলাপ্য সত্য নহে, যাবতীয় ব্যবহারের তাহা আলম্বন। সকলের অভিজ্ঞতাই এইরূপ, আর এই আত্মবোধ অন্যান্য উপলব্ধির মত নহে। ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানে কিংবা অনুমানে বোদ্ধা, বোধরূপ তাঁহার ক্রিয়া ও তাঁহার অধিগত বিষয়ে ভেদ অনুভূত হয়। কিন্তু আত্মভাবে আমি আমাকেই জানি আর সে জানায় মধ্যবর্ত্তিতা বা ক্রিয়াক্রম নাই।

কিন্তু এই আত্মভাব কি নিরন্তর একরূপ? দিবাভাগে আমি নানা কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকি; তথাপি অনুচিন্তনের ফলে দেখি, একই আত্মভাব প্রত্যেক ব্যাপারের পশ্চাতে বর্ত্তমান, সুতরাং ব্যাপারগুলি বিভিন্ন হইলেও তাহাতেই গ্রথিত। কিন্তু স্বপ্নে এই যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন হয়, কারণ তখন আমি অন্য ব্যক্তি হই, ভিন্ন রাজ্যে বাস করি; আমার রুচি ও চেষ্টা অন্য আকার ধারণ করে। আর গভীর নিদ্রায় এই স্বপ্নকালীন আত্মবোধও বিলীন হয়; ফলে কোন কামনা বা বিষয়বোধ থাকে না; কেবল এক অবিশেষ আনন্দ উপভোগ করি, যাহার তুলনা জাগরণ ও স্বপ্নের বিচিত্র ও আয়াসযুক্ত সুখে নাই। এইরূপে প্রতিদিন তিন প্রকার আত্মভাবের পরিচয় আমি পাই, অথচ আমার সাতত্য বা পূর্ব্বাপর অনন্যতাবোধ অক্ষুণ্ণ থাকে। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, এই ত্রিবিধ অবস্থার সাধারণ আশ্রয়রূপে অন্য এক আত্মাববোধ আছে। তাহার লয়োদয় নাই, অবস্থা অনুযায়ী বিকারও নাই, আর পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ আত্মবোধ তাহারই অস্পষ্ট, বিভক্ত ও বিচিত্র ছায়ামাত্র। মূঢ়তাবশতঃ আমি সেই চরম আলম্বনের সন্ধান

লই না, যদিও আমার প্রত্যেক অনুভবে ও উদ্যমে তাহার অস্তিত্ব প্রকারান্তরে অঙ্গীকৃত হয়, কারণ আমার দৈনন্দিন অভিন্নতা খ্যাপনের অন্য কোন হেতু নাই। তাহাই বস্তুতঃ আমার অন্তরতম সত্তা বা আত্মা, দেহপিঞ্জরে শুদ্ধ চৈতন্যের আবির্ভাব।

প্রশ্নোপনিষদে তাঁহাকে ষোড়শ কলা বা অবয়ব যুক্ত পুরুষ বলা হইয়াছে(১)। পিপ্পলাদের উপদেশ অনুসারে জীবদেহে তাঁহার অধিষ্ঠান, আর অহঙ্কার, পঞ্চপ্রাণ, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় তাঁহাতে উদ্ভূত হইয়া তাঁহারই আশ্রয়ে ব্যবহার সৃষ্টি করে। সুতরাং জীবের শ্রদ্ধা, বীর্য্য, তপস্যা ও অন্যান্য কর্ম্মের তিনিই একমাত্র কারণ। কিন্তু উক্ত ষোড়শ কলা তাঁহাতে বিলীন হইলেও তাঁহার কোন ক্ষতি হয় না, বরং তাঁহার অমরত্ব পরিস্ফুট হয়। অতএব তাঁহার মহত্ব উপলব্ধি করিলে মরণের আর ভয় থাকে না। ঋষির এই উক্তিতে ব্যবহারের উৎপত্তি ও অবসান সংক্ষেপে অথচ বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। অবিনাশী ও অব্যয় আত্মা নিখিল ব্যবহারের চরম কারণ, আর তাঁহাকে এই সঙ্কীর্ণ ও নশ্বর শরীরেই অন্বেষণ করিতে হয়, যদিও তিনি ব্রহ্ম।

কিন্তু জীব ও ব্রহ্মে প্রভেদ বিস্তর: সুতরাং অভেদ অনুচিন্তনে সত্যের অপলাপ হয় না কি? জ্ঞানে বিষয়ের প্রেরণা, আকাঙ্ক্ষায় অভাবের কশাঘাত, কর্ম্মে অনুকূল অবস্থার অপেক্ষা ও ভোগে অতৃপ্তির তিক্ততা—এ সকলই জীবের সঙ্কীর্ণতা, পারতন্ত্র্য ও পরিণাম খ্যাপন করে। ব্রহ্ম পূর্ণ, নিরপেক্ষ, ও নির্ব্বিকার। তিনি আশ্রয় ও জীব আশ্রিত। মুণ্ডক বলিয়াছেন,—তিনি বৃহৎ; তাবৎ লোক ও

(১) প্রশ্নোপনিষৎ ৬;

লোকবাসী তাঁহাতে অবস্থিত। ব্রহ্মের এই অপরিসীম মহত্ত্বে ও জীবের সর্ব্ববিধ দৈন্যে সঙ্গতি কোথায়? বিসদৃশ পদার্থদ্বয়ে সাদৃশ্য কল্পনা কি সিদ্ধির উপায় হইতে পারে?

এবংবিধ আপত্তির বিরুদ্ধে বলা যায়, নিত্যস্থির আত্মার সহিত একত্ব পরিকল্পনা আদিষ্ট হইয়াছে, চিরচঞ্চল উপাধির সহিত নহে। ব্রহ্মের বর্ণনায় মুণ্ডক বলিয়াছেন, জ্যোতিষ্কগণ তাঁহার প্রভায় উজ্জ্বল, আর এ প্রভা যে চৈতন্যের তাহা স্পষ্ট, যেহেতু তাহাদিগের প্রকাশে অন্য প্রকাশকের প্রয়োজন না হইলেও, সাক্ষিরূপ চৈতন্যের অপেক্ষা থাকে। সাধকের আত্মাও সাক্ষিস্বরূপ, কারণ তাঁহার যাবতীয় চিত্তবৃত্তি আত্মার সাক্ষিত্বে অনুভবে পরিণত হয়। বস্তুতঃ প্রত্যক্ষ, অনুমান, ভোগ ও চেষ্টা সকলই অধিকৃত ঘটনা, আর আত্মা বা আমিই তাহাদিগের অধিকারী। পরন্তু তাহারা অশেষবিধ ও অস্থায়ী হইলেও, আত্মা বা বিশুদ্ধ আত্মবোধ সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্র একরূপ। সুতরাং চিন্ময়ত্ব ও নিত্যতায় আত্মা ও ব্রহ্মে সারূপ্য বর্ত্তমান।

শুদ্ধ ও অশুদ্ধ আত্মভাব

কিন্তু আত্মভাব কি সতত অবিকৃত থাকে? কে সম্পদে চরিতার্থ ও বিপদে অবসন্ন হয়? জীবনের তাবৎ প্রচেষ্টা কাহার জন্য? বস্তুতঃ আমিই অবস্থা অনুসারে কখন সন্ত্রস্ত, কখন উৎফুল্ল, কখন বা শান্তির প্রয়াসী হই, আর আমার জন্যই যাবতীয় প্রযত্ন। অথচ অবস্থা বিপর্য্যয়ে আমার অন্তরতর সত্তা যে অক্ষুণ্ণ থাকে, এ ধারণাও বাধিত হয় না। মুণ্ডক এই রহস্য উপলব্ধি করিয়া বলিয়াছেন, সখ্যভাবাপন্ন ও সাহচর্য্যে অভ্যস্ত দুইটি সুন্দর পক্ষী একই বৃক্ষে বাস করে; তাহাদিগের একটি স্বাদু ফল ভক্ষণ করে; অন্যটি কিন্তু কিছুই গ্রহণ করে না, কেবল সহচরের ভোগ দর্শন করে(১)। এই

(১) মুণ্ডক ৩।১।১;

কবিসুলভ বর্ণনায় ভোগভূমি সংসারই বৃক্ষ, রূপরসাদি বিষয় তাহার স্বাদু ফল, ভোগাভিলাষী জীব ক্ষুধার্ত্ত পক্ষী আর তাহার সহচর শুদ্ধ দ্রষ্টৃভাব, কারণ উহা ব্যতীত ভোগ ও ভোক্তৃত্ব সিদ্ধ হয় না। কঠোপনিষৎও বলিয়াছেন, কর্ম্মের অবশ্যম্ভাবী ফলভোগার্থ জীবদেহের শ্রেষ্ঠ স্থান হৃদয়গুহাতে দুইজন আতপ ও ছায়ার মত নিত্যসম্বদ্ধভাবে অবস্থান করেন, অর্থাৎ বিসদৃশ হইলেও ছায়া যেরূপ আতপের অনুগামী হয়, পরিণামী ভোক্তৃভাবও সেইরূপ চিরশান্ত সাক্ষিমাত্র আত্মভাবের সংস্পর্শে প্রকট হইতে থাকে(১)।

জীবে আত্মার পঞ্চকোষরূপ উপাধি

তৈত্তিরীয় পঞ্চ কোষের বর্ণনায় এই তত্ত্ব আরও বিশদ করিয়াছেন(২)। তাহার মর্ম্ম এইরূপ:—মানবদেহ অন্নে গঠিত ও পুষ্ট হইলেও তাহার সর্ব্বত্র প্রাণবায়ুর চেষ্টা বর্ত্তমান, কারণ শ্বাসাদি ক্রিয়ার অবসানে দেহের সকল অংশই বিনষ্ট হয়। পুনশ্চ প্রাণবায়ুর চলাচল মানসিক ক্রিয়ার আনুষঙ্গিক, যেহেতু সংজ্ঞাহীন দেহে প্রাণবায়ুর গতি থাকে না। বিষয়বোধ ও তৎসম্বন্ধে আলোচনা মনের ক্রিয়া, কিন্তু বোদ্ধার অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিশ্চয়াত্মিকা অনুভূতি ব্যতীত তাহা সম্ভব নহে। অতএব সম্বদ্ধ অথচ বিবিধ ক্রিয়ার পরিচয় জীবনে পাওয়া যায়, আর আত্মার উদ্দেশে যে এই সহযোগ তাহাও সুস্পষ্ট। দেহ, প্রাণ, মন ও বুদ্ধি বিভিন্ন ক্রিয়াসাধক, কিন্তু আত্মার জন্যই তাহারা ক্রিয়াশীল হয়। কেহ বলিতে পারেন কি—অন্তরে বিষয়জ্ঞান বা সুখদুঃখবোধ বা সঙ্কল্প ও চেষ্টা হইতেছে, কিন্তু আমার জন্য নহে? বস্তুতঃ আত্মাই তাবৎ ব্যবহারের কেন্দ্রস্বরূপ। কেবল তাহাই নহে,—সাধকগুলিও আত্মাভিমানী, যেহেতু তাহাদিগের তৎপরতায় আত্মার জন্ম ও তাহাদিগের

(১) কঠোপনিষৎ ১।৩।১; (২) তৈত্তিরীয় ২।১-৫;

লয়ে আত্মার মরণ কল্পিত হয়। আত্মার মরণ নাই সত্য, কারণ আত্মার সাক্ষিত্ব ব্যতীত মরণও প্রকট বা প্রকৃত হইতে পারে না। অথচ আত্মা ও মরণশীল দেহাদি যে একীভূত হয় ইহাও সাধারণ অভিজ্ঞতা।

আর একটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। প্রাণন, মনন ও অধ্যবসায় সাধারণতঃ আনন্দপ্রদ। কিন্তু দেহাদি যদি কুঠারাদিবৎ যন্ত্রমাত্র হয়, তাহাদিগের পক্ষে সুখদুঃখবোধ অসম্ভব। অতএব আমরা তিনটি সমস্যার সম্মুখীন হই, পরার্থে দেহাদির সমবেত চেষ্টা ও সেই চেষ্টায় স্বাচ্ছন্দ্যবোধ এবং তাহাদিগের আত্মারূপে পরিচয়। আর এই সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য স্বীকার করিতে হয় যে উক্ত করণবর্গ চৈতন্যময় আত্মারই বিবিধ প্রকাশ ও তজ্জন্য চেতনাযুক্ত। তিনি আনন্দময়, রসস্বরূপ, সুতরাং তাহারাও আনন্দের ভাগী। তৈত্তিরীয় বলিয়াছেন,—হৃদয়াকাশে আনন্দময় না থাকিলে কেহ অপান চেষ্টা বা প্রাণন ক্রিয়া করিত না, চিন্তা ও অধ্যবসায় ত পরের কথা(১)। পূর্ব্বে আত্মার দ্বিবিধভাবে যে বিরোধের উল্লেখ করা হইয়াছে, ঋষি এইরূপে তাহার সঙ্গতি করিয়াছেন। মুখ্য আত্মা স্বয়ংসিদ্ধ, স্বপ্রকাশ; কিন্তু মানবদেহে তিনি যেন পাঁচটি কোষে পরিবৃত। তাহাদিগের মধ্যে আনন্দ সর্ব্বাপেক্ষা আভ্যন্তর, কারণ আনন্দভোগ কিংবা তাহার আশা ব্যতীত জীবনধারণ অসম্ভব। বিজ্ঞান দ্বিতীয় কোষ, যেহেতু স্বীয় অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিশ্চয়জ্ঞান জীবের সর্ব্ববিধ ব্যাপারে অনুস্যূত। আর তাহার পরে মন, প্রাণ ও দেহ যথাক্রমে কোষবৎ থাকায় জীব পূর্ণাঙ্গ হয়। কিন্তু তাহাদিগকে আত্মাও বলা হইয়াছে, কারণ তাহাদিগের মধ্যে

(১) তৈত্তিরীয় ২।৭;

আত্মভাব সতত বর্ত্তমান। বস্তুতঃ আত্মবোধবর্জ্জিত বুদ্ধি ও মন কল্পনীয় নহে, আর মন ও বুদ্ধির অভাবে প্রাণ ও দেহ অচিরে বিনষ্ট হয়।

কিন্তু চিত্তেন্দ্রিয়যুক্ত দেহ বহু, আর বিরাট ও বিচিত্র জগৎ কোন দেহের অন্তর্বর্ত্তী নহে। সুতরাং ধারণা হইতে পারে,—সর্ব্বময় ব্রহ্মের তুলনায় আত্মা ক্ষুদ্র যদিও প্রত্যেক আত্মা স্বীয় দেহের কারণ ও আশ্রয়। অথচ তৈত্তিরীয়ে ও অন্যান্য প্রামাণিক উপনিষদে বহুস্থলে আত্মা ও ব্রহ্মে ঐক্য প্রচারিত হইয়াছে; আত্মার বহুত্বপ্রতিষেধও নানা উপদেশে পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ কঠোপনিষদের উক্তি দেওয়া হইল। অনল যেরূপ ইন্ধনের তারতম্যে বিভিন্ন আকার ধারণ করে, বায়ু যেরূপ আশ্রয় অনুসারে নানাবিধ বোধ হয়, প্রাণিগণের অন্তরাত্মা এক হইলেও দেহাদিভেদে ভিন্ন প্রতীত হন। কিন্তু ইহা প্রতীতিমাত্র; সূর্য্য যেরূপ মলিন বস্তুর সংস্পর্শে মলিন হয় না, আত্মাও উপাধির সঙ্কীর্ণতা ও দোষে কলঙ্কিত হন না, কারণ তিনি স্বরূপে উপাধি হইতে ভিন্ন(১)। এই প্রকারে উপমার আলোকে মৃত্যু কেবল তত্ত্ব প্রকাশ করেন নাই, যুক্তির সূত্রও দিয়াছেন। দৃশ্য দেশে ও কালে বিভক্ত এবং বিসদৃশ গুণযুক্ত বলিয়া বহু। কিন্তু দৃশ্যের লক্ষণ বা অবস্থা আত্মা বা দ্রষ্টার স্বরূপে আরোপ করিলে তাঁহাকে দৃশ্যশ্রেণিভুক্ত করা হয়। দেশ ও কাল দৃশ্যের অধিকরণ, সুতরাং তিনি দেশকালাতীত, আর গুণ অনুভূত বিষয় বলিয়া তিনি নির্গুণ। অতএব আত্মা এক ও বিভু; তিনি বহু নহেন; উক্ত পঞ্চকোষ বিবিধ হওয়ায় তাঁহাতে বহুত্ব কল্পিত হয়।

আত্মা ও ব্রহ্ম

(১) কঠোপনিষৎ ২।২।৯, ১১

আত্মা ও ব্রহ্মে ঐক্য অঙ্গীকার করিবার পক্ষে আর একটি আপত্তি পরীক্ষা করিতে হইবে। তাহা এইরূপ :—আত্মা-প্রকাশক ও বাহ্য জগৎ প্রকাশ্য ; দীপালোকে তিমিরাচ্ছন্ন স্থান দৃষ্টিগোচর হয়, কিন্তু সেই স্থানের অস্তিত্ব দীপালোকের উপর নির্ভর করে না ; আত্মার সহিত জগতের সম্পর্ক অনুরূপ নহে কি ? এই সংশয়ের বিস্তৃত আলোচনা উপনিষদে নাই, কারণ দ্রষ্টাবিযুক্ত দৃশ্য যে সত্তাহীন কল্পনা তাহা সর্ব্বত্রই স্বতঃসিদ্ধ সত্যরূপে গৃহীত হইয়াছে। যাহা হউক, বিচারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমরা কৌষীতকিতে পাই, আর তাহার মর্ম্ম এইরূপ :—চক্ষুকর্ণাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও হস্তপদাদি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় কর্ত্তৃক বাহ্য জগতের সহিত যাবতীয় ব্যবহার নিষ্পন্ন হয়। সুতরাং জগৎও দশ প্রকার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে গঠিত। কেবল তাহাই নহে, ইন্দ্রিয় ও তাহার বিষয়ে সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য ; শ্রোত্রের অভাবে শব্দ থাকে না আর শব্দের অভাবে শ্রোত্র থাকে না, এইরূপ। অতএব উভয়ের কোনটিকে পৃথক্ বস্তুরূপে গ্রহণ করা অন্যায্য। তথাপি বিষয় ও বিষয়বোধ যে বিবিধ তাহা স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু মূলতত্ত্ব এক আর এই নানাত্ব তাঁহার বিভিন্ন বিকাশ, কারণ আত্মভাবের আশ্রয়েই নানাত্বের আবির্ভাব। অতএব চক্রের বেষ্টনী যেমন অরগুলিতে স্থাপিত আর অরগুলি চক্রনাভিতে, বিষয়ও সেইমত ইন্দ্রিয়ে আর ইন্দ্রিয় চৈতন্যস্বরূপ আত্মাতে বিধৃত। ইনি অজর, অমর ও আনন্দময়। ইনিই প্রকৃত লোকপাল, সর্ব্বেশ(১)।

চেতনাযুক্ত দেহাদিতে আত্মবোধ আছে, সত্য ; কিন্তু তাহা সঙ্কীর্ণ ও লয়োদয়শীল। বিশুদ্ধ আত্মভাবে পরিচ্ছেদ বা

(১) কৌষীতকি ৩।৪-৭ ;

বিকার সম্ভব নহে, কারণ তাহা সাক্ষিরূপে সর্ব্ববিধ বিকার ও পরিচ্ছেদের আশ্রয়। ছান্দোগ্য দহরবিদ্যার উপদেশে এই পরম তত্ত্বের মহিমা বিবৃত করিয়াছেন(১)। তাহার তাৎপর্য্য এইরূপ :—ব্রহ্ম সর্ব্বত্র বিদ্যমান; কিন্তু মানবের পক্ষে আত্মা-রূপে তাঁহাকে হৃদয়ে উপলব্ধি করাই সঙ্গত। এই হৃদয় ক্ষুদ্র বটে; তথাপি ইহাতে তাঁহার পূর্ণ প্রকাশ, কারণ তিনি নিষ্কল ও নিরঞ্জন, অর্থাৎ দেশ, কাল বা নিমিত্ত তাঁহাকে অবচ্ছিন্ন করে না। আত্মার বিভাগ কিরূপ হইবে, আর তাঁহার সীমাই বা কোথায়? যখনই তাঁহার সীমা ও নানাত্ব কল্পনা করা হয়, তখনই দৃষ্টি প্রকৃতপক্ষে পঞ্চকোষের প্রতি। বিশুদ্ধ আত্মভাব উপলব্ধি করা কঠিন, সন্দেহ নাই। কিন্তু উপলব্ধির জন্য সম্যক্ চেষ্টা করিতে হইবে, যেহেতু তাহাই শ্রেষ্ঠ সাধনা। তাহাতে যত অগ্রসর হওয়া যায়, পরিচ্ছেদ তত অপসৃত হইতে থাকে। অবশেষে সিদ্ধি লাভ করিলে সকলই সাধকের আয়ত্ত হয়, কারণ আত্মবোধের আশ্রয় ব্যতীত কখন কিছু প্রকট হয় নাই বা হইবে না। যাহাকে ব্যবহিত, অতীত বা অনাগত বলা হয়, তাহা ব্যক্তিগত দেহ, মন বা বুদ্ধি হইতেই পৃথক্, আত্মা হইতে কদাপি বিযুক্ত নহে। সুতরাং আত্মতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হইলে অভাব ও পারতন্ত্র্য চিরতরে অপগত হয়।

আত্মাই ভূমা

কিন্তু দেবদুর্লভ ঐশ্বর্য্য ও এই কঠোর সাধনার উদ্দেশ্য নহে। ছান্দোগ্য নিম্নোক্ত আখ্যায়িকায় প্রকৃত উদ্দেশ্য প্রকাশ করিয়াছেন(২)। দেবগণ মৃত্যুভয়ে বেদবিহিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু অগভীর জলে ধীবর যেরূপ মৎস্য দেখিতে পায় ও বিদ্ধ করে, মৃত্যু যজ্ঞের পশ্চাতে দেবতাদিগকে সেইরূপ লক্ষ্য করিল। সুতরাং আনুষ্ঠানিক ব্যাপার পরিহার

(১) ছান্দোগ্য ৮।১; (২) ছান্দোগ্য ১।৪।২,৩;

পূর্ব্বক তাঁহারা ব্রহ্মধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। মৃত্যু এস্থলে ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে; জরা, ব্যাধি ও শোক তাহার অন্তর্গত। ঋষির অভিপ্রায় এই,—অস্থায়ী ও দুঃখদিগ্ধ অস্তিত্ব হইতে নিষ্কৃতির জন্য ব্রহ্মচিন্তার একান্ত প্রয়োজন, কারণ কেবল তাহার ফলে ব্রহ্মের অনবদ্য সাম্য ও শান্তি লাভ হয়, অর্থাৎ পরিণাম ও দুঃখকে সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করা যায়।

এই তত্ত্ব অন্যত্র অন্য ভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে। সনৎকুমার নারদকে বলিয়াছিলেন,—জীব অনাবিল সুখের প্রয়াসী, কিন্তু অল্পে সুখ নাই। গৃহ, ভার্য্যা, হিরণ্য দাস ও পশু অল্পের মধ্যেই গণ্য, যেহেতু ইহারা পরতন্ত্র ও নশ্বর। যাঁহাতে অন্যের প্রভাব লক্ষিত হয় না, যিনি স্বীয় মহিমাতে প্রতিষ্ঠিত অথবা মহিমার অপেক্ষাও যাঁহার নাই, তাঁহাকে লাভ করিলে প্রকৃত সুখ হয়, যেহেতু তিনি পূর্ণ, নিরপেক্ষ ও একরূপ বা নির্বিকার। এই লক্ষণ কিন্তু আত্মার, কারণ বিশুদ্ধ আত্মবোধে অন্য কোন বোধের অপেক্ষা নাই, যদিও তাহাই সর্ব্ববিধ বোধের আশ্রয়। সুতরাং ঋষি তাঁহাকে ভূমা বা নিরতিশয় আখ্যা দিয়াছেন(১)।

ভূমা ধ্যান

ভূমার বর্ণনার পরেই ভূমা-ধ্যানের প্রকৃষ্ট পদ্ধতি ব্যাখ্যাত হইয়াছে(২)। শ্রবণ ও মননের ফলে এই সর্ব্বময় তত্ত্ব সম্বন্ধে উপযুক্ত ধারণা লাভ করিয়া, সাধক আপনাকে ঊর্দ্ধে ও অধোভাগে, অগ্রে ও পশ্চাতে, দক্ষিণে ও বামে অবস্থিত দেখিবেন; বস্তুতঃ তিনিই সমুদায় এবংবিধ চিন্তা দ্বারা পরম পদার্থ হইতে আপনার অভেদ অনুভব করিতে যত্নবান হইবেন। অভ্যাসবশে এই ঐক্য অনুচিন্তনে সামর্থ্য জন্মিলে অহঙ্কারের সঙ্কীর্ণতা ও রাগদ্বেষের আবিলতা অপগত হয়।

(১) ছান্দোগ্য ৭।২৩,২৪; (২) ছান্দোগ্য ৭।২৫

ব্রহ্ম তখন আত্মাকারে অন্তরের অন্তরে প্রকট হন। এ প্রকাশের তুলনা নাই। অন্য কোন জ্ঞানে বিষয় ও বিষয়ীর ভেদ অপনীত হয় না; অধিকন্তু বিষয়মাত্রেই সঙ্কীর্ণ ও তাহা স্বীয় প্রকৃতি অনুসারে বিষয়ীকে নিরূপিত বা বদ্ধ করে। বিশুদ্ধ আত্মভাবে এতাদৃশ অবচ্ছেদ বা স্বল্পতা নাই; কিন্তু নাই বলিয়াই তাহার ধারণা দুর্লভ ও অস্পষ্ট, কারণ সাধারণতঃ ব্যবহারিক জ্ঞানই আমাদিগের সম্বল, আর তাহার পশ্চাতে নিত্য সর্ব্বাশ্রয় জ্ঞান থাকিলেও, দৃষ্টি বুদ্ধিবৃত্তিকে সচরাচর অতিক্রম করে না। এমন কি, বিষয়-বিষয়ী ভেদে অভ্যস্ত চিত্ত তাদৃশ ভেদরহিত তত্ত্বকে অজ্ঞান বা অবস্তু বলিতে প্রবৃত্ত হয়।

বস্তুতঃ ব্যবহারে অভিনিবেশ উক্ত সাধনার পক্ষে সাংঘাতিক অন্তরায়, কারণ ব্যবহারের বিভাগ ও বৈচিত্র্য পরম তত্ত্বের অখণ্ডতা ও সাম্য আবৃত করে। ফলে, তাঁহার কোন কোন বিশেষ প্রকাশে দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়, আর সেইগুলিকে পৃথক্ পৃথক্ দেবতারূপে অর্চ্চনা করিবার প্রবৃত্তি জন্মে। বৃহদারণ্যক এই সকল দেবতাকে অপূর্ণ আত্মা বলিয়াছেন, যেহেতু ইহারা এক ও অদ্বয় আত্মার সঙ্কীর্ণ পরিচয়। তুচ্ছ লাভের আশায় মানব এই ক্ষুদ্র দেবগণের উপাসনা করে; তাদৃশ উপাসনা অজ্ঞানপ্রসূত; প্রকৃত আত্মাই উপাস্য, কারণ তাঁহাকে জানিলে সকলই জ্ঞাত ও আয়ত্ত হয়। কিন্তু এই উপলব্ধি কোথায় ও কিরূপে হইতে পারে? ক্ষুর যেরূপ ক্ষুরাধারে আচ্ছাদিত থাকে, আত্মাও সেইরূপ দেহের নখাগ্র পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইলেও সাধারণতঃ অপ্রত্যক্ষই থাকেন(১)। সুতরাং দেহের মর্ম্মস্থলে তাঁহার অধিষ্ঠান, এই প্রতীতির

(১) বৃহদারণ্যক ১।৪।৭;

সাহায্যে নির্ম্মল ও স্থির চিত্তে তাঁহার ধ্যান করিতে হয়। যাহারা উপাসকের অন্তরতম সত্তায় ও উপাস্যে ভেদ করে, তাহাদিগের অজ্ঞতার সীমা নাই, কারণ তাহারা আত্মার সর্ব্বাধিষ্ঠাতৃত্ব অস্বীকার করে। বৃহদারণ্যক তাহাদিগকে গৌণ দেবগণের পশু বলিয়াছেন, যেহেতু তাহারা চরম তত্ত্বের সন্ধান না লইয়া তাঁহার অনিত্য ও অপ্রধান বিভূতির সেবায় রত থাকে(১)। আত্মাকে অতিক্রম করে, সংসারে এমন কিছুই নাই।

আত্মা ও ঈশ্বর

ঈশোপনিষৎ পূর্ণ আত্মা সম্বন্ধে বিশদ অথচ সংক্ষিপ্ত উপদেশ দিয়াছেন(২)। এ স্থলে তাহাই অবলম্বন করিয়া আমরা আত্মার স্বরূপ ও মহিমার ব্যাখ্যা করিব। শ্রুতি বলেন, আত্মা জ্যোতির্ম্ময়, অর্থাৎ তাঁহার প্রকাশ পরাধীন নহে; তিনি শুদ্ধ চৈতন্য, সুতরাং পরপ্রকাশ্য বিষয়ের মত তাঁহার লয়োদয় নাই; তিনি স্বপ্রকাশ বলিয়াই স্বয়ম্ভু, সনাতন। দেহ স্থূল বা সূক্ষ্ম উভয়ই নশ্বর; অতএব তিনি দেহযুক্ত নহেন। অথচ তিনি সর্ব্বদর্শী। ইন্দ্রিয়গ্রাম বিষয়বোধের দ্বারস্বরূপ আর মন তাহাদিগের অধীশ; কিন্তু তিনি মনের অধিপতি। আর মনই বিষয়ের স্থান বলিয়া তিনি বিষয়েরও অধীশ্বর। বস্তুতঃ চিরকালই তিনি কর্ম্মোপযোগী ভোগ্য বস্তুনিচয়ের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। প্রজাপতিগণ এ বিধানে তাঁহার নিমিত্তমাত্র।

শান্তচিত্তে আত্মাবোধ আত্মার প্রতিকৃতিরূপে সাধারণতঃ গৃহীত হয়, কারণ তাহা বিষয়বোধ অপেক্ষা অন্তরতর আর বিষয়বোধের মত পরপ্রদত্ত, পরিণামী ও বিবিধ নহে। সুতরাং সংশয় হয়, আত্মাকে বিচিত্র, বিকারী ও বিজাতীয় বিষয়বোধের মূল বা কারণ বলা সঙ্গত কি? কিন্তু এতাদৃশ সংশয় প্রাচীন

(১) বৃহদারণ্যক ১।৪।১০; (২) ঈশোপনিষৎ ৮;

উপনিষদ্‌গুলির অকুণ্ঠ অদ্বৈতবাদে স্থান পায় নাই। বৃহদারণ্যক বলিয়াছেন,—তাবৎ জীব ও জীবনিবাস আত্মা ব্যতীত অন্য কিছু নহে, সুতরাং আত্মাকে জানিলে সমুদায় অবগত হওয়া যায়। ছান্দোগ্য শাণ্ডিল্য বিদ্যার প্রস্তাবনায় এই অভিমতই প্রকাশ করিয়াছেন(১), আর ভূমাতত্ত্ববিদের উপলব্ধিও ইহার সমর্থক বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে(২)। আত্মার মহিমা আত্ম-বোধেই পর্য্যবসিত; বিষয়বোধ ভ্রান্তি কিংবা তাহার জন্য স্বতন্ত্র-সত্তার প্রয়োজন—এ অভিমত প্রাচীন উপনিষদে গৃহীত হয় নাই। পরন্তু যাবতীয় প্রকাশের আত্মাই পর্য্যাপ্ত বা নিরপেক্ষ কারণ, এই তত্ত্ব তপস্যালব্ধ অনুভূতি বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে।

অন্তর্জগতে আত্মা ব্যাপক ও অধ্যক্ষ

তাদৃশ উপলব্ধির আমরা অধিকারী নহি। সুতরাং শ্রুতিতে আত্মার সর্ব্বময়ত্ব ও সর্ব্বাধিষ্ঠাতৃত্ব সম্বন্ধে কোন যুক্তির সূত্র আছে কি না, তাহা দেখিতে চাহি। কেনোপনিষৎ বলিয়াছেন, প্রতি বোধে আত্মার বিদ্যমানতা অনুভূত হইলে তিনি পরিজ্ঞাত হন(৩)। সত্য বটে, আত্মা ব্যতীত বোধ নাই, কারণ আমার সর্ব্বপ্রকার বোধের আমিই সাক্ষী, আর এই সাক্ষ্যে তাহাদিগের উদ্ভব, বিকাশ ও বিলয় ঘটে। কিন্তু আমি কি? এখন আমি বৃদ্ধ, ক্ষীণদৃষ্টি ও পরিশ্রান্ত, অর্থাৎ দেহের জরা, ইন্দ্রিয়ের বৈকল্য ও চিত্তের অবসাদ আপনার পরিচয়রূপে অঙ্গীকার করি। পূর্ব্বে আমি সম্পন্ন ও কর্ম্মিষ্ঠ গৃহস্থ ছিলাম, অর্থাৎ বিষয়ের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ও তাহার ব্যবহারে নিপুণতা আপনার পরিচয়রূপে গ্রহণ করিতাম। অতএব সকল সময়েই এই আত্মভাব বিশেষিত বোধরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। অধিকন্তু, পলে পলে নব নব বিষয়ের অনুরোধে ইহা আরও বিশেষিত

(১) ছান্দোগ্য ৩।১৪।২; (২) ছান্দোগ্য ৭।২৫; (৩) কেনোপনিষৎ ২।৪

হইয়াছে। দর্শনে দৃষ্টরূপ, শ্রবণে শ্রুত শব্দ, মননে চিন্তাধারা ও বিজ্ঞানে সিদ্ধান্ত আমাকে প্রভাবিত করে আর পূর্ব্বেও করিয়াছে। বস্তুতঃ আত্মপরীক্ষার ফলে দেখি, আমাতে সকলই বোধ। কিন্তু বোদ্ধার অভাবে বোধ অসম্ভব। সুতরাং স্বীকার করিতে হয় যে বিষয়বোধ ও সাধারণ আত্মবোধের পশ্চাতে তাহাদিগের পরম আশ্রয়রূপে প্রকৃত বোদ্ধা বা বিজ্ঞাতা আছেন। তাঁহাকেই শ্রুতিতে আত্মা বলা হইয়াছে।

প্রমাণ আত্মার সাক্ষিত্ব

তিনি প্রচ্ছন্ন অতএব অন্তরতম, অথচ বোধময় অন্তর্জগতে তিনি পরিব্যাপ্ত, কারণ কোন বোধই বোদ্ধাবিযুক্ত নহে। তিনি সতত একরূপও বটে, কারণ বোধ বিবিধ হইলেও সাক্ষিত্বে ভেদ হয় না, আর সে সাক্ষিত্বের বিরাম নাই। চিত্ত পরিণামের সমাহার বলিয়া প্রসিদ্ধ; কিন্তু আত্মা নিত্য ও নির্ব্বিকার না হইলে পরিণাম পরিণামরূপে অনুভূত হইত না। শঙ্কা হইতে পারে,—বিশেষিত, ক্ষণস্থায়ী প্রত্যয়নিচয়ের অবিরত প্রবাহ লক্ষ্য করিয়া তাহাদিগকে এক সনাতন, চিরস্থির পুরুষের সাক্ষ্যরূপে কল্পনা করা হইয়াছে, প্রকৃতপক্ষে প্রত্যয়ের অবাধিত অনুক্রম ব্যতীত অন্য কিছু নাই। কিন্তু স্মৃতি ও প্রত্যভিজ্ঞা সম্ভব হয় কিরূপে? প্রত্যয়পরম্পরায় সাদৃশ্য থাকিতে পারে, কিন্তু সে সাদৃশ্যের উপলব্ধি হয় কেন? কোন প্রত্যয়ই ত পূর্ব্ব বা পর প্রত্যয়কে জানিবার অবসর পায় না। অধিকন্তু সকল প্রত্যয়ই যে জ্ঞাত বিষয়রূপে অনুভূত হয়, তাহার সঙ্গত ব্যাখ্যা কি হইতে পারে? দর্শনে এতাদৃশ যুক্তির সন্নিবেশ আছে, উপনিষদে নাই; তথাপি দ্রষ্টৃত্ব বা সাক্ষিভাবের বিস্তৃত বর্ণনায় উপনিষৎ যুক্তি ও সিদ্ধান্তের পূর্ব্বাভাষ দিয়াছেন।

যুক্তি ও সিদ্ধান্তের উল্লেখ করিলাম। কিন্তু শ্রুতির উপদেশ

অনুমানে পর্য্যবসিত হয় নাই। আত্মাকে আমরা দেখি না বটে; কিন্তু যাবতীয় বৃত্তির পশ্চাতে তিনি যে বর্ত্তমান এ উপলব্ধি সম্ভব। উষস্ত চাক্রায়ণ অজ্ঞতাবশতঃ আত্মার অবস্থান সম্বন্ধে স্পষ্ট নির্দ্দেশ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর মত আত্মাও বিষয়ীভূত হইতে পারেন। আর এই ভ্রান্ত বিশ্বাস অপনোদনের জন্য যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছিলেন,—দৃষ্টির দ্রষ্টাকে দেখিবে না, শ্রুতির শ্রোতাকে শ্রবণ করিবে না, চিন্তার আশ্রয়কে প্রত্যক্ষ করিবে না, কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্যবোধের প্রকাশককে নির্ণয় করিতে পারিবে না; অথচ তোমার আত্মা যে তোমার দৃষ্টি, শ্রুতি প্রভৃতির পরম কারণ তাহা অনুভব করা নিতান্ত অসম্ভব নহে, যেহেতু তিনি শুদ্ধ চৈতন্যরূপে তোমার মধ্যেই আছেন(১)। বস্তুতঃ চিত্তবৃত্তি-গুলিতে আমরা এমনই নিবিষ্ট হই যে তাহাদিগের উৎপত্তি ও আশ্রয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসার অবসর থাকে না। অথচ আগ্রহ সহকারে এই প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণ করিলে অন্তর্জগতে আত্মার অধিষ্ঠাতৃত্ব সুস্পষ্ট হয়।

বহির্জগতে ও আত্মা ব্যাপক ও অধ্যক্ষ

কিন্তু বহির্জগতের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ কিরূপ? বিশ্বের যে কোন বস্তুকে পরীক্ষা করিলে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ ও ইহাদিগের সহভাবী কাঠিন্যাদিগুণ ভিন্ন অন্য কিছু পাওয়া যায় না। আর ইহাদিগের প্রত্যেকটি যে বিশেষিত অনুভব তাহা প্রসিদ্ধ। বাহ্য অবকাশে ইহারা স্থাপিত হয় সত্য; কিন্তু বাহ্য ও আন্তর তুলনামূলক বোধমাত্র। বস্তুতে এতাদৃশ চিহ্ন নাই; স্বপ্নের বিষয়গুলিও বাহ্য অবকাশে নিবেশিত হয়। অতএব বহির্জগৎ ও অন্তর্জগতের মত বোধের সমষ্টি। কিন্তু বোদ্ধা ব্যতীত বোধ নাই, আর এই তত্ত্ব অঙ্গীকার করিয়া

(১) বৃহদারণ্যক ৩।৪।২;

ঐতরেয় বলিয়াছেন,—বিশ্বের উপাদানভূত আকাশ, বাতাস, আলোক, জল ও ভূমি জ্ঞানময় আত্মার আশ্রয়ে বাস্তব ও ক্রিয়াশীল হয়(১)। তথাপি আপত্তি হইতে পারে,—তাবৎ বিশ্ব জ্ঞানের বিষয় হইলেও, জ্ঞান হইতে একান্ত ভিন্ন কোন শক্তিনিচয় আছে, যাহার ক্রিয়ার ফলে বিভিন্ন ও পরিণামী অনুভব উদ্রিক্ত হইয়া বোধাত্মক বিশ্বের আকার ধারণ করে। কিন্তু শক্তি অপ্রত্যক্ষ বলিয়া কার্য্য হইতে ভিন্ন হইলেও অত্যন্ত ভিন্ন হইতে পারে না, যেহেতু কার্য্যেই তাহার পরিচয়। সুতরাং যে সকল বিবিধ ও সঙ্কীর্ণ প্রত্যয়ে বিশ্ব রচিত তাহাদিগকে কোন জড় শক্তির অভিব্যক্তি বলা অযৌক্তিক।

জড়শক্তি অযুক্ত কল্পনা

বস্তুতঃ দৃশ্যাত্মক জড়জগতে অদৃশ্য শক্তির অবকাশ কোথায়? পরিণাম প্রবাহেই তাহা পর্য্যবসিত। কেহ কেহ বলেন, শক্তি সূক্ষ্ম ক্রিয়া। কিন্তু তাদৃশ উক্তিতে ক্রিয়ার কারণ নির্দ্দেশ করা হয় না। বৃক্ষলতা দিনে দিনে বর্দ্ধিত হয়, আর এইরূপে বহুদিন গত হইলে, সেই বৃদ্ধির প্রচয় আমরা প্রত্যক্ষ করি। সুতরাং দৈনন্দিন বৃদ্ধির উল্লেখে শক্তিরূপ কারণের সন্ধান দেওয়া হয় না কেবল ক্ষুদ্র বিষয়ের অবধারণে ইন্দ্রিয়ের অক্ষমতা অঙ্গীকার করা হয়। অল্প ও অধিক পরিবর্ত্তনে যে জাতিগত ভেদ নাই, একটি শক্তি ও অন্যটি ক্রিয়া নহে, তাহা স্পষ্ট যেহেতু স্থানান্তরে গতি কিংবা রূপান্তরপ্রাপ্তিকে ক্রিয়া বলে, আর ইহারা শক্তির প্রকাশমাত্র। অতএব জড়শক্তির কল্পনায় এই সাধারণ অভিজ্ঞতার অপলাপ করিয়া থাকি।

আত্মাই শক্তিমান

ব্রহ্ম বা চিন্ময় পুরুষ শক্তির প্রকৃত আধার; তিনি শক্তিমান, আর তাঁহার শক্তির পরিচয় সৃষ্টিতে। প্রত্যেক পরিণামই অভিনব সৃষ্টি; পূর্ব্বগামী পরিণাম তাহার উপলক্ষ্য-

(১) ঐতরেয় ৩।৩

মাত্র, প্রবর্ত্তক বা শক্তিযুক্ত কারণ নহে। কঠোপনিষদে বলা হইয়াছে,—ব্রহ্ম স্বীয় একরূপকে বহুধা করেন, আর যাহা কিছু চঞ্চল বা পরিণামী তাঁহাতে উদ্ভূত হয় এবং বিবিধ আকার ও গতি লাভ করে(১)। তাহাদিগের আবির্ভাব ও পরিণতি উভয়ই প্রকৃতপক্ষে বিসৃষ্টি। শ্বেতাশ্বতর বলিয়াছেন, উহা উর্ণনাভের দেহ হইতে তন্তুজাল বিস্তারের মত, অর্থাৎ উহাতে পৃথক্ উপাদানের প্রয়োজন হয় না(২)। কিন্তু উপদেশের সম্পূর্ণ তাৎপর্য্য গ্রহণার্থ উপমার অনিবার্য্য সঙ্কীর্ণতা স্মরণ রাখিতে হইবে। উর্ণার রচনায় করণ ও আশ্রয়ের অপেক্ষা থাকে; বিশ্বসৃষ্টিতে তাদৃশ অপেক্ষাও নাই, কারণ কোন আশ্রয় বা করণ চৈতন্যকে অতিক্রম করে না। তৈত্তিরীয় বলিয়াছেন, ব্রহ্ম সুকৃত অর্থাৎ অন্যনিরপেক্ষ কারণ, যেহেতু জগতে তাঁহার আত্মপ্রকাশ ব্যতীত অন্য কিছু নাই, আর এই জ্ঞানগর্ভ উক্তিতে সৃষ্টি ও শক্তির যথার্থ রূপ পরিস্ফুট(৩)।

কেবল জড় জগতে কেন, জীবলোকেও যে স্বতন্ত্র শক্তির উদাহরণ নাই, এই তত্ত্ব কেনোপনিষৎ একটি সুন্দর আখ্যায়িকার আকারে প্রকাশ করিয়াছেন(৪)। কোন দেবাসুর সংগ্রামে শত্রু নিহত হইলে দেবগণের ধারণা হইল তাঁহাদের শৌর্য্যই সাফল্যের প্রকৃষ্ট কারণ। তখন সত্য প্রকাশার্থ ব্রহ্ম তাঁহাদিগের সমীপস্থ হইলেন। কিন্তু চিত্ত মোহান্ধ থাকায় তাঁহারা সেই উপাস্যের মহিমা উপলব্ধি করিলেন না। সুতরাং পরাক্রমে অগ্রগণ্য বলিয়া অগ্নি ও বায়ুকে আগন্তুকের পরিচয় গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হইল।

(১) কঠোপনিষৎ ২।৩।২; (২) শ্বেতাশ্বতর ৬।১০, ১১

(৩) তৈত্তিরীয় ২।৬, ৭; (৪) কেনোপনিষৎ ৩।১-১০

তখন ব্রহ্ম উভয়কে একই প্রশ্ন করিলেন,—তাঁহাদিগের শক্তি কিরূপ ? অগ্নি বলিলেন তিনি তাবৎ বস্তু দগ্ধ করিতে পারেন, আর বায়ু বলিলেন এমন কিছু নাই যাহা তিনি আত্মসাৎ করিতে অক্ষম। কিন্তু শক্তি পরীক্ষার্থ তাঁহাদিগকে একখণ্ড তৃণ দেওয়া হইলে, অগ্নি তাহা ভস্মীভূত করিতে পারিলেন না আর বায়ু তাহা ধারণ করিতে অপারগ হইলেন। উপাখ্যানের উপদেশ অতি স্পষ্ট ; সকল ব্যাপারেই জ্ঞানময় ব্রহ্মের কৃতিত্ব ; এমন কি, শ্রেষ্ঠ দেবগণও তাঁহার শক্তি-প্রকাশের প্রণালীমাত্র।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, দৃশ্যনিচয়ের মধ্যে অদৃশ্য শক্তির অন্বেষণ করা বৃথা। শক্তির উৎপত্তি ও প্রকাশ সম্বন্ধে আরুণি দৃষ্টান্ত দ্বারা স্বীয় পুত্র শ্বেতকেতুকে প্রকৃষ্ট উপদেশ দিয়াছিলেন(১)। শ্বেতকেতু পিতার আদেশমত বিশাল বটবৃক্ষের একটি ফল আনিলে তাহা দ্বিখণ্ড করিতে আদেশ দেওয়া হইল। বিদীর্ণ ফলের মধ্যে শ্বেতকেতু বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজ দেখিলেন। পরে তাদৃশ বীজের অভ্যন্তরে কি আছে দেখিবার জন্য আদিষ্ট হওয়ায়, শ্বেতকেতু একটি বীজ বিভক্ত করিলেন। কিন্তু কিছুই দেখিলেন না। তখন পিতা বলিলেন,—যাহা সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম বলিয়া তোমার ইন্দ্রিয়ের অগোচর তাহাই উক্ত বটবৃক্ষের চরম কারণ, আর কেবল বটবৃক্ষের কেন, সমগ্র বিশ্বের তাহাই মূল ; কিন্তু মানবহৃদয়ে তাহার সন্ধান লইতে হইবে, যেহেতু বহির্জগতে তাহার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায় না।

আরুণির এই উপদেশ মহাবাক্য মধ্যে পরিগণিত। ইহার তাৎপর্য্য নিম্নে যথাসাধ্য প্রকাশ করিতেছি। বিশ্বে কিছুই আকস্মিক নহে। সুতরাং বনস্পতিতে এমন কিছু নাই যাহা

(১) ছান্দোগ্য ৬।১২

পূর্ব্বে বীজে ছিল না। অথচ তাহার শাখা, প্রশাখা ও পল্লবের সম্পূর্ণ কারণ বীজে প্রত্যক্ষ হয় নাই। বীজ হইতে অঙ্কুর উদ্গত হইয়াছিল, তাহাই ক্রমে বিতস্তি পরিমাণ তরুর আকার ধারণ করিল, আর বহুবর্ষব্যাপী বিস্তারের ফলে সেই ক্ষীণ, খর্ব্ব তরু প্রকাণ্ড মহীরুহে পরিণত হইয়াছে,—এতাদৃশ বর্ণনায় প্রকৃত কারণের উল্লেখ নাই, কেবল পরিণামক্রমের ইতিহাস আছে। প্রশ্ন এই,—কোন্ শক্তি বা সত্তা নানাপ্রকার অন্তরায় অতিক্রম করিয়া বিভিন্ন অবস্থায় ও বিবিধ উপায়ে বটবৃক্ষরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে? তাহা যে অতীন্দ্রিয়, সে বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই, যেহেতু মূল, কাণ্ড, শাখা বা পত্রে কোথাও তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না। আর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে স্থির ধারণা ও উপায় অবলম্বনে সপ্রতিভভাব তাহার যে অঙ্গীভূত, ইহাও স্বীকার করিতে হয়। কেবল পাদপে কেন, সর্ব্ববিধ দেহে বুদ্ধি ও চেষ্টার পরিচয় সুস্পষ্ট। বিভিন্ন ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য ও উপায় বিবিধ বটে, কিন্তু অধিষ্ঠাতৃত্ব একইরূপ। সুতরাং কোন অমেয় তত্ত্ব যে বিশ্বে আত্মপ্রকাশ করিতেছে, এই সিদ্ধান্তে শ্রদ্ধান্বিত হওয়া উচিত।

কিন্তু সেই পরমতত্ত্ব কি প্রকার? বহির্জগতে এই প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর নাই। সুতরাং ঋষি পুত্রকে 'তুমিই তাহা' বলিয়া অন্তর্জগতের প্রতি পুত্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ দৃষ্টি অন্তর্মুখ ও স্থির হইলে সঙ্কল্প, চেষ্টা প্রভৃতি যাবতীয় বৃত্তি আত্মবোধে একীভূত হয়। প্রথমে এই আত্মবোধ অস্পষ্ট, চঞ্চল ও দেশকালাবচ্ছিন্ন থাকে, সন্দেহ নাই; কিন্তু তপস্যার প্রভাবে দৃষ্টি সম্পূর্ণরূপে স্থির হইলে, আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান হয়। আর এই জ্ঞান সাক্ষাৎকারের মতই। কঠোপনিষৎ বলিয়াছেন,—'তিনি এই' এইভাবে আত্মাকে

অন্তরের অন্তরে প্রত্যক্ষ করিয়া যোগিগণ পরম আনন্দ উপভোগ করেন, যদিও বিষয়রূপে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করা অসম্ভব, যেহেতু সকল বিষয়ই তাঁহার দীপ্তিতে দীপ্যমান বা বাস্তব হয়(১)। মাণ্ডুক্যের উপদেশ আরও স্পষ্ট, কারণ বলা হইয়াছে—বিশ্ব ব্রহ্মের প্রকাশ হইলেও মানবহৃদয়েই তিনি প্রত্যক্ষযোগ্য(২)।

আত্মতত্ত্ব কি তাহা আলোচিত হইল। তথাপি শ্রুতির নির্দ্দেশ সম্বন্ধে কয়েকটি সংশয়ের পরীক্ষা এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কোন কোন মনীষীর মতে জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞানের সহযোগে আত্মভাব রচিত হওয়ায় মূলতত্ত্বের অখণ্ডতা তাহাতে নাই; সুতরাং জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় ব্যতিরিক্ত নিরালম্ব ও নির্বিষয় জ্ঞানই পরমতত্ত্ব, আর তাহাকে আত্মা বলা হয়, যেহেতু জ্ঞান সর্ব্বব্যাপী অর্থাৎ জ্ঞানের অতীত সত্তা নাই। কিন্তু তাদৃশ জ্ঞান সত্তাবিযুক্ত অভিকল্পনা নহে কি? সদ্যোজাত শিশুর ও মোহাচ্ছন্ন ব্যক্তির জ্ঞান এইরূপ মনে হইতে পারে। প্রকৃতপক্ষে তাহা জৈবভাবের অস্ফুট বোধ আর তাহাতেও জ্ঞাতা থাকেন যদিও সাময়িক জড়তাবশতঃ বিশ্লেষণের ক্ষমতা থাকে না।

অন্যান্য মনীষীর মতে যাবতীয় দৃশ্য পরিহৃত হইলে যে অক্রিয় দ্রষ্টৃভাব থাকে, তাহাই আত্মা বা ব্রহ্ম। এই নির্বচনে ধ্যানের উৎকৃষ্ট পদ্ধতি উপদিষ্ট হইয়াছে, কারণ অস্থায়ী ও বিক্ষেপজনক দৃশ্যের প্রভাবে চিত্ত আলোড়িত থাকিতে নিত্য, নির্বিকার তত্ত্বের ধ্যান হয় না। কিন্তু দৃশ্য ও দ্রষ্টা অনুবন্ধী, অবিচ্ছেদ্য ভাব, পূর্ব্ব ও পশ্চিম বা অধঃ ও ঊর্দ্ধের মত। পূর্ব্ব সম্বন্ধে পৃথক্ চিন্তা সম্ভব হইলেও,

(১) কঠোপনিষৎ ২।২।১৪,১৫; (২) মাণ্ডুক্য ২।

পশ্চিমের ধারণা তাহাতে উপলক্ষিত থাকে। তাহারা বিপরীত দিক্‌রূপে প্রতীত হয় সত্য ; তথাপি তাহারা স্বতন্ত্র পদার্থ নহে। বস্তুতঃ দেশই তত্ত্ব, আর পূর্ব্বাদি দিক্ তাহার অন্তর্গত পরস্পরসাপেক্ষ ভাব। দ্রষ্টা ও দৃশ্যের সম্বন্ধ এই-রূপই। দর্শনে তাহাদিগের অভিব্যক্তি ও মিলন, আর আত্ম-ভাব চিরন্তন বলিয়া দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন নিত্য। কিন্তু এই দর্শন মূলতঃ বা মুখ্যতঃ লয়োদয়শীল বিষয়ের নহে। দ্রষ্টা আপনাকে আপনি দর্শন করেন ; সুতরাং ইহা ক্রিয়াও নহে, যেহেতু ইহাতে কর্ত্তা অবিকৃত থাকেন অথচ ক্রিয়ার আকর্ষণে কর্ত্তার গতি কিংবা বিকার ঘটে। অতএব বিশুদ্ধ আত্মভাবে চরম তত্ত্বের অখণ্ডতা ও নিরপেক্ষতা বর্ত্তমান। তাদৃশ আত্মভাবের ধারণা করা আমাদিগের মত বিষয়াসক্ত জীবের পক্ষে কঠিন বটে, কিন্তু কঠিন হইলেও অসম্ভব নহে, কারণ আত্মাই জীবের অন্তরতম সত্তা।

স্বতন্ত্র পদার্থের সংমিশ্রণে যৌগিক পদার্থের উৎপত্তি হয়। কিন্তু আত্মভাবের তথাকথিত উপাদানগুলি কি স্বতন্ত্র পদার্থ ? দ্রষ্টৃত্ব তাহাদিগের মধ্যে প্রধান, সন্দেহ নাই ; কিন্তু দর্শন ও দৃশ্য তাহাতে অনুস্যূত নহে কি ? অন্যপ্রকার দৃশ্যের অভাবে আত্মদর্শন নিবারিত হয় না বলিয়া শুদ্ধ চৈতন্য দ্রষ্টার সার্থক নাম, আর এই আত্মদর্শনই মুখ্য বলিয়া 'নিজবোধরূপ' লক্ষণে তাঁহার সুস্পষ্ট পরিচয়। যাঁহারা বিশ্লেষণের অত্যন্ত পক্ষপাতী, তাঁহাদের স্মরণ রাখা উচিত যে ধারণা সুকর হইবে বলিয়া মন এক ও অভিন্ন বস্তুর বিবিধ গুণ বা ভাবের পৃথক্ পৃথক্ আলোচনা করে ; কিন্তু তাদৃশ বিভাগে প্রকৃত ভেদ সূচিত হয় না। বস্তুতঃ আত্মভাবের তাদৃশ বিশ্লেষণ চূড়ান্ত বলিয়া গ্রহণ করিলে চরম তত্ত্বের অবধারণে ব্যাঘাত ঘটে।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,—দ্রষ্টার দর্শনের অবসান নাই(১)। বিষয়ের অভাবে বিষয়বোধ বিলুপ্ত হইলেও আত্মদর্শন অব্যাহত থাকে—ইহাই তাঁহার উপদেশের তাৎপর্য্য। আর অনুরূপ উপদেশ স্বভাস, স্বপ্রকাশ ও চৈতন্যস্বরূপ আখ্যায় নিহিত।

শ্রুতির অদ্বৈতবাদ

কিন্তু আত্মা কেবল স্বপ্রকাশ নহেন ; পরপ্রকাশের হেতুও তিনি। সুতরাং প্রশ্ন হয়,—দ্বিতীয়, স্বতন্ত্র তত্ত্বের প্রমাণ এই পরবোধে নাই কি ? শ্রুতির মতে কিন্তু আত্মাতেই বিশ্বের উৎপত্তি ও বিকাশ। দ্রষ্টৃত্ব বা সাক্ষিভাবে নানাত্ব নাই বটে ; কিন্তু দৃশ্য অশেষবিধ হইতে পারে। সাগরে যেরূপ উর্ম্মিমালা উদ্ভূত, স্ফীত ও বিচূর্ণিত হয়, এই বিস্তৃত ও বিচিত্র জগতের যাবতীয় পরিণাম আত্মা বা ব্রহ্মেই ঘটে। প্রত্যেক উর্ম্মি যেরূপ সাগরজল ব্যতীত কিছু নহে, প্রত্যেক বস্তুতে বোধের অতিরিক্ত কিছুই নাই। উর্ম্মির মত, আশ্রয় হইতে তাহার প্রভেদ আকারে ও অবস্থানে অর্থাৎ বিশেষে। সে আশ্রয় বা উপাদান আত্মার অন্তর্গত অবিশেষ দৃশ্যভাব। কিন্তু বিশেষ ব্যতীত বিষয়রূপে প্রকাশ অসম্ভব, আর বিশেষে সঙ্কীর্ণতা অনিবার্য্য। অথচ দৃশ্যভাব দ্রষ্টৃত্বের মতই অমেয়, যদিও স্বভাবতঃ তাহা বৈচিত্র্যের আকর। সুতরাং সীমাহীন দেশে ও কালে আর সংখ্যাতীতরূপে তাহার উদ্ঘাটন হয়। এই উদ্ঘাটন প্রকৃতপক্ষে আত্মপ্রকাশ। কিন্তু সৃষ্ট, সঙ্কীর্ণ জীব যে ইহাকে অন্য পদার্থের সমাহাররূপে গ্রহণ করে তাহাও ন্যায্য ও স্বাভাবিক।

আত্মাকে জ্ঞানময় বলিতে কাহারও আপত্তি নাই। তথাপি বিশেষিত ও অবিশেষ জ্ঞানে জাতিগত ভেদ করা হয়। বিশেষে অনাত্মা কর্তৃক আত্মা অনুরঞ্জিত হন কিংবা আত্মার

(১) বৃহদারণ্যক ৪।৩।২৩।

সান্নিধ্য অনাত্মাকে চেতনাযুক্ত করে, এই দ্বিবিধ ব্যাখ্যা দার্শনিকগণ গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব তাঁহাদিগের মতে অবিশেষভাব শুদ্ধ ও মৌলিক আর বিশেষিত বোধ বিসদৃশ পদার্থদ্বয়ের সংযোগে উৎপন্ন। এতাদৃশ সংযোগের উদাহরণ আমরা জড়জগতে পাই বটে; কর্দ্দমাক্ত জলের পীতাভ বর্ণ আর অয়স্কান্তের সন্নিহিত লৌহখণ্ডে নূতন শক্তির সঞ্চার প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত। কিন্তু জড়জগতে সকল বস্তুই বোধের বিবিধ রূপ অর্থাৎ সমজাতীয়, সুতরাং তাহাদিগের ঘনিষ্ঠতা স্বাভাবিক। পক্ষান্তরে আত্মা ও অনাত্মায় ভেদ মৌলিক ও একান্ত বলিয়া গৃহীত হয়, সুতরাং তাহাদিগের মধ্যে সংযোগ বা সংক্রমণের সম্ভাবনা কোথায়? আর এই অনাত্মাই বা কি? যাহা পর বলিয়া বোধ হয় তাহাই অনাত্মা, এবংবিধ স্থূল বিভাগ অগ্রাহ্য। দর্শনসম্মত অন্য বর্ণনায় অনাত্মা স্বরূপে অব্যক্ত অথচ তাহার বিকাশ বা বিকার জ্ঞেয়। কিন্তু এই লক্ষণ দুইটি আত্মা বা ব্রহ্মে নাই কি? তিনি ইন্দ্রিয় ও মনের অগোচর অথচ বিষয়ের দ্রষ্টারূপে তাঁহাকে অন্তরে উপলব্ধি করা সম্ভব। পার্থক্যের আর একটি সূত্র,—আত্মা সতত একরূপ অথচ অনাত্মা অবিশেষ হইলেও বিশেষের অফুরন্ত নির্ঝর। কিন্তু আত্মাকে বিশেষের উৎস বলিতে আপত্তি কোথায়? জ্ঞানেই বিশেষ ও সংখ্যা বাস্তব হয়। বিচারে এইরূপ বিবিধ কূট প্রশ্নের আমরা সম্মুখীন হই।

বিষয়ী ও বিষয়ে ভেদ যে ঐকান্তিক নহে, উভয়ই যে পরম তত্ত্বের অন্তর্গত, এই উপদেশ বৃহদারণ্যক মধুবিদ্যা নামক প্রসিদ্ধ প্রকরণে দিয়াছেন(১)। উপদেশটি বিশদ ও বিস্তৃত, আর ইহার রচনাপদ্ধতিও চমৎকার। যাহা হউক, ইহার

(১) বৃহদারণ্যক ২।৫

সামান্য ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি। ঋষি বলিয়াছেন ঃ—আকাশ, বাতাস, অনল, সলিল ও পৃথিবী প্রাণিজাতের মধু, আর এই প্রাণিসমূহ উহাদিগের মধু, অর্থাৎ জীবলোক ব্যতীত জীবের অস্তিত্ব ও অভ্যুত্থান সম্ভব নহে, আর জীবের অভাবে জীবলোকের প্রসার ও বৈচিত্র্য অলীক হয়; বিষয় ও বিষয়ীতে এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের কারণ উভয়েই অব্যয় ও তেজোময় আত্মা বর্ত্তমান; রথনেমি ও রথনাভির মধ্যে অরগুলি যেরূপ স্থাপিত, সমুদায় জীব ও জীবনিবাস আত্মাতে সেইরূপে নিহিত; বস্তুতঃ তিনিই যাবতীয় বিষয় ও বিষয়ী।

মধুবিদ্যার ব্যাখ্যায় যুক্তি নাই। তথাপি সংশয় নিরসনের জন্য যুক্তিতর্কে প্রবৃত্ত হইয়াছি, কারণ সংশয় দূর করিবার ইহাই উপায় বলিয়া স্বীকৃত। কিন্তু চরম তত্ত্বের নির্ণয়ে তর্ক যে অপ্রতিষ্ঠ তাহা মুক্তকণ্ঠে অঙ্গীকার করি। পাঠক লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, এই বিচারে আত্মার পরিবর্ত্তে আত্মবোধই পরীক্ষিত হইয়াছে। স্বয়ং আত্মা পরীক্ষণীয় নহেন,(১) সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে যুক্ত ধারণার জন্য আত্মবোধ বা আত্মভাবের আলোচনা করা হয়। এই আত্মভাব কিন্তু মনে আত্মার প্রতিরূপ মাত্র; আর মন বহির্মুখ ও চঞ্চল থাকিতে এই প্রতিকৃতি অস্পষ্ট, অপূর্ণ, এমন কি বিকৃত হয়। পরন্তু বিচারের বাহুল্য এ সকল দোষ সংশোধন করিতে পারে না, কারণ বিচারও সেই বিকৃত, সংস্কারদুষ্ট মনের বৃত্তি। বৃহদারণ্যক বলিয়াছেন, বহু বাক্য কেবল বাগিন্দ্রিয়কে অবসন্ন করে(২)। তৈত্তিরীয় বলিয়াছেন, বাক্য ও মন ব্রহ্মের উদ্দেশে নিয়োজিত হইলে সন্ধান না পাইয়া প্রতিনিবৃত্ত হয়(৩)। আর এই জন্য সংযতচিত্তে প্রজ্ঞাসাধন আদিষ্ট হইয়াছে।

---

(১) বৃহদারণ্যক ২।৪। ৪; (২) বৃহদারণ্যক ৪।৪।২১; (৩) তৈত্তিরীয় ২।৯;

সূক্ষ্ম বিচার এই প্রজ্ঞাসাধন নহে। যিনি প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, এমন কি মনের মন, তাঁহার ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধে এই বিতর্কপ্রবণ মনের উক্তি চরম হইতে পারে না। উপনিষদে দেখি, ব্রহ্মজ্ঞান স্পষ্ট ও নির্দ্দোষ হইবে এই আশায় জিজ্ঞাসু তত্ত্বদর্শীর উপদেশপ্রার্থী হইলে তত্ত্বদর্শী স্বীয় অনুভূতি বাক্যে যথাসম্ভব প্রকাশ করিয়াছেন ও অনুরূপ অনুভূতি লাভের জন্য উপযুক্ত সাধনার আভাস দিয়াছেন; পক্ষান্তরে কৌতুহলের প্রেরণায় কিংবা বিচারে প্রতিষ্ঠার জন্য বাদানুবাদ করিলে তিরস্কারই লাভ হইয়াছে(১)। সে ভর্ৎসনার তাৎপর্য্য এইরূপ :—যে দেবতা অনুমানের বিষয় নহেন, যাঁহাকে তর্কজালে সীমাবদ্ধ করা যায় না, তাঁহার সম্বন্ধে অতিপ্রশ্ন অনুচিত; কিন্তু আস্তিক্য বুদ্ধি ও আপ্ত বাক্যে শ্রদ্ধা থাকিলে চিত্তসংযম ও নিদিধ্যাসনের ফলে তাঁহার তত্ত্ব অধিগত হয়। সে সিদ্ধি ত শেষ কথা, পরাগতি; সাধনায় কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেও যে অনুভব হয় তাহার তুলনায় অনুমান নিকৃষ্ট আর যুক্তিতর্ক অকিঞ্চিৎকর। ছান্দোগ্য উন্নত সাধকের বর্ণনায় বলিয়াছেন, তিনি ধ্যানযোগে ব্রহ্মের নির্গুণ ও নির্বিশেষ ভাব হইতে তাঁহার বিচিত্র প্রকাশে গমন করেন, পুনরায় সেই জ্যোতির্ম্ময় রূপ হইতে ভেদরহিত সুতরাং দুরধিগম্য ভাবে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, অর্থাৎ তাদৃশ অনুক্রমে কোন বিরোধ বা অসঙ্গতি অনুভব করেন না; তখন তাঁহার সকল পাপ অপগত হয়, দেহরূপ আবরণ তাঁহাকে আর আচ্ছন্ন করে না, তিনি কৃতকৃত্য হন(২)।

মাণ্ডুক্যে পূর্ণ ব্রহ্মের বর্ণনা—তিনি চতুষ্পাৎ

মাণ্ডুক্য বলিয়াছেন, জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, এই ত্রিবিধ অবস্থা আমরা সাধারণতঃ লাভ করি; সুতরাং তিনটিতেই

(১) বৃহদারণ্যক ৩।৬; (২) ছান্দোগ্য ৮।১৩

আত্মার পরিচয় গ্রহণ করিতে হইবে। জাগরণে আমাদিগের ভোগভূমি ও কর্ম্মক্ষেত্র বিভিন্ন ও সীমাবদ্ধ বটে, কিন্তু সে আবেষ্টন দেহাবচ্ছিন্ন জীবের, আত্মার নহে, কারণ সমগ্র বিশ্ব চৈতন্যস্বরূপ আত্মার বিষয় আর কেবল বিষয় নহে, তাঁহার অবয়ব অর্থাৎ তাঁহাকে কখন অতিক্রম করে না। সুতরাং তিনি সপ্তাঙ্গ ; স্বর্গ তাঁহার মস্তক, রবি চক্ষু, অনল আনন, আকাশ দেহ, অন্ন ও জল উদর ও পৃথিবী পাদ, আর বায়ু এই সকল অঙ্গে প্রবাহিত। এই বিশাল জগতের কিয়দংশ প্রত্যেক মানব গ্রহণ ও ব্যবহার করে, আর তাদৃশ ব্যবহারের উপায় পঞ্চপ্রাণ, দশ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত হয়। কিন্তু আত্মাই প্রকৃত গ্রহীতা, যেহেতু ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি উপলব্ধির দ্বারমাত্র। সুতরাং যাবতীয় বিষয় তাঁহাতে উদ্ভুত হইলেও এই সকল প্রবেশপথে তাঁহার সমীপে আনীত হয়। বিশ্ব প্রকাশের ইহাই পদ্ধতি। ইহতে বিষয় বাহ্য ও স্থূল অর্থাৎ ব্যক্তি বিশেষের বোধমাত্র নহে, আর বিষয়ী বৈশ্বানর অর্থাৎ যাবতীয় প্রাণীর সমষ্টি। অতএব বহির্দ্দেশে জ্ঞেয় বস্তু, অন্তরে জ্ঞানরূপ ক্রিয়া আর তাহার পশ্চাতে স্বয়ং জ্ঞাতা জাগরণে যেন পৃথক্। কিন্তু জ্ঞাতা ব্যতীত জ্ঞান নাই, আর জ্ঞেয় কখন জ্ঞানের অতীত নহে, যদিও ব্যক্তিগত বোধে তাহা আবৃত থাকিতে পারে। সুতরাং জ্ঞানময় আত্মাই মূলতত্ত্ব, আর জাগরণে আমরা তাঁহার অন্যতম পরিচয় পাই।

স্বপ্নে চক্ষুশ্রোত্রাদি বহির্মুখ করণবর্গ নিষ্ক্রিয় থাকে, তথাপি দর্শনশ্রবণাদি ক্রিয়ার ব্যাঘাত হয় না, কারণ ইন্দ্রিয়গুলি নিশ্চেষ্ট হইলেও ইন্দ্রিয়াধীন মন বাসনাময় স্বপ্নরাজ্য সৃষ্টি করে। এই রাজ্য জাগ্রদবস্থার বিশ্বের মত বিস্তৃত, আর উক্ত উনবিংশতি প্রকারেই অর্থাৎ শব্দস্পর্শাদিরূপে

ইহার উপলব্ধি হয়, কিন্তু উপলব্ধির জন্য বাহ্য বস্তুর অপেক্ষা থাকে না। সুতরাং স্বপ্নেও আত্মা সপ্তাঙ্গ ও উনবিংশতি-মুখ অথচ জাগ্রৎ অবস্থায় যে বিষয়গুলি স্থূল ও বাহ্য বলিয়া অনুভূত হইয়াছিল, স্বপ্নে তাহারা মনেই সূক্ষ্ম আকারে আবির্ভূত হয়, অর্থাৎ জ্ঞাত বিষয় ও জ্ঞানাখ্য ক্রিয়ায় প্রভেদ থাকে না, জ্ঞান এইরূপে বিষয়নিরপেক্ষ হওয়ায় আত্মা তৈজসরূপে প্রতিভাত হন। কিন্তু সুষুপ্তিতে মনও নিশ্চল হয়। ফলে, স্বপ্নের বৈচিত্র্যময় বৃত্তিগুলি স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করিয়া এক অবিশেষ চেতনার আকার ধারণ করে। এই ঘনীভূত ভাব রজনীর অন্ধকারে বিবিধ বস্তুর একরূপতার মত। ইহাতে কোন প্রকার আয়াস নাই, সুতরাং কষ্টও নাই, অর্থাৎ আত্মা এই অবস্থায় আনন্দময় ও আনন্দভুক্ হন, আর উক্ত অবিশেষ চেতনাই আনন্দ উপভোগের দ্বার বা উপায় হয়।

অতএব জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিতে আত্মা কালাবিচ্ছিন্ন ও দ্বৈতভাবযুক্ত, অর্থাৎ বিভিন্ন সময়ে তাঁহার রূপ বিবিধ আর প্রত্যেক রূপে বিষয় ও বিষয়ীর মধ্যে অল্পাধিক পার্থক্য বিদ্যমান। কিন্তু নিত্য ও অনিত্য পদার্থে প্রভেদ আয়ত্ত হইলে আত্মার কালাতীত ও উপাধিমুক্ত ভাব উপলব্ধি করা সম্ভব হয়। এই ভাবে তিনি বাহ্য বা আন্তর বিষয়ের গ্রহীতা নহেন, এমন কি, তন্দ্রা বা সুষুপ্তির স্তিমিতরূপও তাঁহার বিষয় নহে। পরন্তু সর্ব্ববিধ জ্ঞেয় বস্তুর অভাব হওয়ায় তাঁহাকে আর প্রাজ্ঞ বলা যায় না, অথচ তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও ব্যবহার-যোগ্য অচেতন পদার্থ নহেন। তবে তিনি কি? মন তাঁহার এই নির্বিশেষ ভাব নির্ণয় করিতে অক্ষম, সুতরাং বাক্যও তাহা নির্দ্দেশ করিতে অপারগ। এইমাত্র বলা যায় যে তাহাতে নানাত্ব ও বিক্ষেপ নাই, তাহা মঙ্গলময়, পবিত্র ও একমাত্র সৎ পদার্থ,

আর বিশুদ্ধ আত্মপ্রত্যয়ই তাহার নিদর্শন। কিন্তু আত্মার এই অনন্ত ও অবিকার্য্য ভাব দুরধিগম্য হইলেও উপলব্ধি করিতে হইবে, কারণ ইহা অজ্ঞাত থাকিতে সংসারের নিবৃত্তি নাই।

এই বর্ণনায় মায়াবাদ বা অজ্ঞেয়বাদের আভাস নাই

উপদেশের কোন কোন অংশ স্বতন্ত্রভাবে গ্রহণ করিলে মনে হয় মায়াবাদ ও অজ্ঞেয়বাদের পূর্ব্বাভাষ এই শ্রুতিতে আছে। কিন্তু ঋষি উপক্রমেই বলিয়াছেন,—যাহা কিছু ছিল, আছে বা হইবে সকলই ব্রহ্ম, যদিও কাল তাঁহার সীমাবন্ধন নহে। আর ব্রহ্ম সম্বন্ধে চারি প্রকার ধারণার উল্লেখ থাকিলেও কোনটিকে অলীক বা অযুক্ত বলা হয় নাই। চতুর্ব্বিধ অবস্থায় আমরা তাঁহাকে চারি ভাবে পাই, ইহাই ঋষির বক্তব্য; কোন ভাবকে প্রত্যাখ্যান বা উপেক্ষা করা তাঁহার অভিপ্রায় নহে। উপনিষদ্‌টির আদ্যোপান্ত আলোচনা করিলে দেখা যায় ওঁকার ধ্যান সম্বন্ধে বিশদ ও বিস্তৃত নির্দ্দেশ দেওয়াই তাঁহার উদ্দেশ্য। ওঁকার ব্রহ্মের শ্রেষ্ঠ বাচক; সুতরাং তাহা জপ করা ও তাহার অর্থ চিন্তা করা বিধেয়। কিন্তু অর্থ চারি ভাগে বিভক্ত; প্রথম তিনটিতে ব্রহ্ম উপাধিযুক্ত আর চতুর্থে তিনি উপাধিমুক্ত। সুতরাং নির্ব্বাণকামীর পক্ষে চতুর্থ অর্থের ভাবনা বিশেষ উপযোগী হইলেও সমগ্র তত্ত্ব উপলব্ধি করিবার জন্য অর্থচতুষ্টয় গ্রহণ করিতে হইবে। মাণ্ডুক্যের আদেশ এইরূপ, অতএব ইহাতে মায়াবাদের ভূমিকা নাই।

তথাপি চতুর্থ পাদের বর্ণনায় নিষেধবাচক শব্দের যেরূপ বাহুল্য, তাহাতে সংশয় হয়, ঋষি প্রকারান্তরে অজ্ঞেয়বাদ অঙ্গীকার করিয়াছেন, অন্ততঃ ব্যবহারের ঊর্দ্ধ্বে তাঁহার দৃষ্টি প্রসারিত হয় নাই। কিন্তু উপসংহারে বলা হইয়াছে, পরমার্থ লাভের জন্য ব্রহ্মের এই অমাত্র ভাবই বিশেষরূপে জ্ঞাতব্য, কারণ ইহা ব্রহ্মের স্বরূপ বা শুদ্ধ চৈতন্য। আর ইহাকে

অচিন্ত্য ও অব্যপদেশ্য বলিয়া ঋষি ক্ষান্ত হন নাই, পরন্তু শান্ত, শিব ও অদ্বৈত, এই ত্রিবিধ লক্ষণে বিভূষিত করিয়াছেন। বস্তুতঃ সুখে ও দুঃখে, যৌবনে ও জরায়, আয়াসে ও অবসরে চৈতন্যের রূপ একই ; এমন কি, ব্যক্তিভেদেও তাহার রূপান্তর হয় না, যেহেতু তাহা স্ববোধমাত্র। তাহা স্থির, নচেৎ বিশ্বব্যাপী অস্থিরতার মধ্যে শান্তির আহ্বান আসে কোথা হইতে ? তাহা অদ্বৈত, নতুবা সুস্পষ্ট বিচ্ছেদ ও বহুত্ব উপেক্ষা করিয়া মৌলিক অভেদ অনুচিন্তনে প্রবৃত্তি হয় কেন ? তাহা মঙ্গলময়, নচেৎ বাহ্য ও আন্তর বিরোধ ও বিপর্য্যয় সত্ত্বেও কল্যাণের প্রত্যাশা সম্ভব হয় কিরূপে ?

কিন্তু শ্রেষ্ঠ ভাবের এই লক্ষণগুলি কি কেবল অনুমানের বিষয় ? বিশেষ জ্ঞান অনুমানের দেয় নহে, আর বিশেষ জ্ঞানের জন্যই প্রযত্ন আদিষ্ট হইয়াছে। সে প্রযত্ন সম্বন্ধে সঙ্কেত ও ঋষি দিয়াছেন। মর্ম্ম এইরূপ :—যাহা কিছু আছে সকলই ব্রহ্ম বটে, কিন্তু অন্তরে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিতে হয়(১), কারণ তথায় তিনি সন্নিহিত অথচ বহির্জগতে নামরূপের ঘন ব্যবধান। অন্তরেও মন, অহঙ্কার ও বুদ্ধির সঙ্কীর্ণতা ও চাঞ্চল্য তাঁহাকে আবৃত করে, সত্য ; তথাপি এই আবরণ অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছ, আর নিত্যানিত্যবিবেক এই আবরণ উন্মোচন করে। তখন উপলব্ধি হয়, জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিতে আত্মভাব বিবিধ হইলেও তাহার ভেদ উপাধিগত অর্থাৎ স্বরূপে আত্মা নিত্য ও সতত একরূপ। ঈদৃশ বিবেকে প্রতিষ্ঠা অসামান্য সন্দেহ নাই, কিন্তু অসম্ভব নহে, আর ব্রহ্মের উপাধিমুক্ত ভাব যে বিজ্ঞেয় তাহা মাণ্ডুক্য স্পষ্টই বলিয়াছেন। সুতরাং অজ্ঞেয়বাদ তিনি প্রচার করেন নাই।

(১) মাণ্ডুক্য ২

ব্রহ্মের মহিমা ও স্বরূপের বর্ণনা মাণ্ডূক্যে সংক্ষিপ্ত অথচ সুসম্বদ্ধ। • পরিচয়ে ত্রুটি পরিহারের জন্য উক্ত ভাবদ্বয়কে চতুর্ধা বিভক্ত করা হইয়াছে। সুতরাং জাগরণ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও শান্তভাব, এই চারি প্রকার অবস্থার উল্লেখ আমরা পাই। অথচ এই উক্তিতে ব্রহ্মের অখণ্ড্য একতা প্রত্যাখ্যাত হয় নাই। কার্ষাপণ অভগ্ন মুদ্রা হইলেও মূল্য নির্দ্ধারণের জন্য তাহাকে যেরূপ চারিভাগে গণনা করি, সেইমত ব্রহ্ম স্বরূপে নিরংশ বা নানাত্ববর্জ্জিত হইলেও সম্যক্ ধারণার জন্য ঋষি তাঁহাকে চারি পাদে পরিচিত করিয়াছেন। বিষয়াসক্ত ব্যস্ত জীব তাঁহার শান্তভাবের সন্ধান পায় না, আর ব্যবহারের উপযোগ লক্ষ্য করিয়া জাগরণের অভিজ্ঞতাকে প্রাধান্য দেয়। কিন্তু স্বপ্ন অলীক কিংবা নিদ্রা অভাব নহে, যেহেতু জাগরণের মতই তাহারা অনুভবযোগ্য। অতএব এই ত্রিবিধ অবস্থাতে ব্রহ্মের পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে ও অবশেষে তাঁহার সমাহিত ভাব সম্বন্ধে যথাসম্ভব নির্দ্দেশ দিয়া ঋষি বর্ণনা পূর্ণাঙ্গ করিয়াছেন। বস্তুতঃ এই উপাধিমুক্ত ভাবেই ব্রহ্ম চরাচরের উৎপত্তি ও বিলয়স্থান। সুতরাং ইহা অজ্ঞাত থাকিতে তাঁহার উপলব্ধি একদেশিক ও পরোক্ষ হয়।

প্রশ্ন হইতে পারে,—বিশ্বে সকলই যখন ব্রহ্মের প্রকাশ আর তিনি নিষ্কল, তাঁহার সম্যক্ উপলব্ধি কঠিন হয় কেন? কিন্তু বিশ্ব বিশেষের সমাহার আর বিশেষের উদ্ভবেই ব্যবধানের উৎপত্তি, কারণ সীমা ব্যতীত বিশেষ অসম্ভব। ইন্দ্রিয়গুলির গ্রহণসামর্থ্যও সীমাবদ্ধ, সুতরাং বিশেষের অবধারণে তাহারা সীমাই অন্বেষণ করে। বিবিধ বিষয়ের একত্র অনুচিন্তন সম্ভব বটে, কিন্তু চিত্তেরও সঙ্কীর্ণতা প্রসিদ্ধ, আর তাহাতে বিষয়ের প্রতিচ্ছায়া স্থির হয় না। ফলে, এই সকল জ্ঞানসাধক

জ্ঞানের অল্পাধিক আবরকও সচরাচর হয়, অন্ততঃ নিত্যস্থির তত্ত্বের সন্ধান দিতে তাহারা প্রায়শঃ অসমর্থ। সুতরাং মধ্যাহ্নে প্রখর অংশুমালায় পরিবৃত হইলেও সূর্য্যমণ্ডল যেমন অনায়াসে দৃষ্টিগোচর হয় না, যদিও সেই অংশুমালা দৃশ্য-জাতকে উদ্ভাসিত করে, ব্রহ্মের স্বরূপও তেমনই তাঁহার বিশ্বব্যাপী মহিমায় আচ্ছন্ন থাকে। তথাপি এই স্বরূপ অবগতির জন্য সাধনা একান্ত আবশ্যক, কারণ জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে শান্তি সকলেরই কাম্য, কিন্তু শান্তি প্রপঞ্চের বিস্তারে নাই।

অন্যত্র ব্রহ্মকে আনন্দও বলা হইয়াছে(১)। স্বরূপের প্রকাশেই আনন্দ। পরাধীন ও কামান্ধ জীবে তাদৃশ প্রকাশ প্রতিকূল শক্তি কর্ত্তৃক নিয়ত ব্যাহত হয়, তাহার করণবর্গের দ্যোতনাও সীমাবদ্ধ; সুতরাং তাহার আনন্দ অল্প। অদ্বিতীয় তত্ত্বের প্রকাশে কিন্তু কোন অন্তরায় নাই, পরপ্রদত্ত করণের অপেক্ষাও নাই; সুতরাং তাঁহার প্রকাশ ও আনন্দ উভয়ই অপরিসীম। বৃহদারণ্যক বলিয়াছেন,—অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গ যেরূপ চতুর্দ্দিকে ধাবিত হয়, আত্মা হইতে প্রাণ, ইন্দ্রিয়গ্রাম, সকল দেবতা ও সমুদায় ভূত নির্গত হইতেছে(২)। এই সর্ব্বব্যাপী ও স্বাভাবিক প্রকাশের যে সীমা নাই তাহা প্রসিদ্ধ; সুতরাং তজ্জনিত আনন্দের যে ইয়ত্তা নাই তাহাও স্বীকার্য্য। তথাপি আপত্তি হয়, আনন্দে প্রকাশের অপেক্ষা আছে আর প্রকাশ লয়োদয়শীল; অতএব নিত্যতত্ত্ব ব্রহ্ম ও অনিত্য বা নৈমিত্তিক আনন্দে প্রভেদ সুস্পষ্ট। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন বটে যে তিনি সলিলের মত অর্থাৎ তাঁহাতে ভেদ বা বিভাগ নাই আর দ্রষ্টা হইলেও তিনি অদ্বিতীয়; সুতরাং

(১) তৈত্তিরীয় ২.৭; (২) বৃহদারণ্যক ২।১।১৯

দর্শন তাঁহার অঙ্গীভূত নহে। কিন্তু আরও বলা হইয়াছে, দ্রষ্টার দৃষ্টি কখন বিলুপ্ত হয় না। এই দৃষ্টি কি তবে শক্তিমাত্র, কেবল সম্ভাবনা? তাহাকে বাস্তবে পরিণত করিবার জন্য কোন্ নিমিত্ত বা বিষয়ের অপেক্ষা থাকে? ঋষি ত অন্য স্বতন্ত্র তত্ত্ব অঙ্গীকার করেন নাই। বস্তুতঃ দ্রষ্টার আত্মদর্শন কখন নিবারিত হয় না, আর তাহাই মৌলিক ভাব। কিন্তু দৃশ্যভাবে আত্মা অশেষবিধ আকার ধারণ করেন, অর্থাৎ জ্ঞানময় সত্তা নানারূপে স্বতঃ স্ফুরিত হন, যদিও দ্রষ্টৃভাব অক্ষুণ্ণ ও অবিভক্ত থাকে। জ্ঞানের এই সর্ব্বাঙ্গীন ও স্বাভাবিক অভিব্যক্তি অচেতন শক্তির বিকাশরূপে কল্পিত হয় বটে, কিন্তু বোধাত্মক প্রপঞ্চের পশ্চাতে অন্য প্রকার শক্তির অবকাশ নাই। অতএব সৃষ্টি প্রকৃতপক্ষে বিসৃষ্টি বা বিষয়রূপে আত্মপ্রকাশ। ঋষি মৈত্রেয়ীকে বলিয়াছিলেন—ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়, আর কেবল এই দুই জাতি কেন, যাবতীয় জীব ও জীবনিবাস আত্মা বা ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছু নহে(১)।

ব্রহ্মে সগুণ ও নির্গুণ ভাব

এই সৃষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ব্রহ্মকে সগুণ বলা হইয়াছে, তাঁহার জন্মের উল্লেখ করা হইয়াছে। বিশ্ব লয়োদয়শীল, যেহেতু বিষয়রূপে কোন প্রকাশ কালাতীত হইতে পারে না। সুতরাং এই প্রকাশিত বিশ্বের ইতিহাস অর্থাৎ উৎপত্তি ও বিকাশ স্মরণ করিয়া শ্রুতি প্রকাশক আত্মাকে জাত ও উপচিত বলিয়াছেন। বস্তুতঃ বিশ্বের সহিত আত্মার সম্বন্ধ খ্যাপনের জন্যই ব্রহ্ম ও হিরণ্যগর্ভে ভেদ করা হইয়াছে। ব্রহ্ম নিত্য, কিন্তু সগুণ ভাব নিত্য নহে। যাবৎ বিশ্ব বিদ্যমান, তাবৎ হিরণ্যগর্ভ বা সগুণ ভাবের পরিচয়। বিশ্ব তিরোহিত হইলে সে ভাবের আর অবকাশ থাকে না। কিন্তু আশ্রিতের

(১) বৃহদারণ্যক ২।৪।৬;

অপসরণে আশ্রয় বিকল হয় না, সুতরাং ব্রহ্ম অক্ষুণ্ণ থাকেন। বনস্পতির বিস্তৃত ছায়ায় অগণিত বীজ অঙ্কুরিত হইয়া ক্ষুদ্র তরুলতার আকার ধারণ করে, অথচ তাহাদিগের নাশে বনস্পতির সঙ্কোচ বা রূপান্তর ঘটে না। বিশ্বও ব্রহ্মের মহিমায় উৎপন্ন হইয়া বিবিধ ভোগ্যরূপে পরিপূর্ণতা লাভ করে আর অনিবার্য্য পরিণামের ফলে অবশেষে লীন হয়, অথচ এই লয় ব্রহ্মে বা শুদ্ধ চৈতন্যে রেখাপাত করে না।

আশ্রিত ও আশ্রয়ে সাপেক্ষতা যে নৈসর্গিক ব্যাপারেও পরস্পর নহে, এই সত্য প্রকাশার্থ উপমাটি দেওয়া হইল; বস্তুতঃ সর্ব্বগত ও সর্ব্বাতিগ ব্রহ্ম আর দেশকালাবচ্ছিন্ন বনস্পতিতে সাদৃশ্য অল্পই, যেহেতু আশ্রিত তরুলতা বনস্পতির বাহিরে বিদ্যমান অথচ তাবৎ বস্তু ও ব্যক্তি ব্রহ্মের অন্তর্গত। প্রকৃত তত্ত্ব এই,—চৈতন্যরূপে তিনি লয় ও উদয়ের সমভাবে সাক্ষী, অতএব সগুণ ও নির্গুণ ভাবের উল্লেখে কেবল স্বরচিত উপাধির আবির্ভাব ও তিরোভাব লক্ষিত হয়, স্বরূপে বৈলক্ষণ্য সূচিত হয় না। এই নির্গুণ শব্দটি আমরা আর একবার পরীক্ষা করিব। তাবৎ বস্তু ও ব্যাপারের পরিচয় তাহাদিগের গুণে বা ধর্ম্মে। সূর্য্যের পরিচয় তাহার অতুলনীয় আলোকে, অসহ্য উত্তাপে ও অখণ্ড মণ্ডলাকারে; ধূলিকণার পরিচয় তাহার ক্ষুদ্র আয়তনে, অল্পভারে ও ধূসর বর্ণে; চিত্তবৃত্তির পরিচয় তাহার বিষয়াকারে, চাঞ্চল্যে ও সুখ-দুঃখযোগে। কিন্তু যিনি তাবৎ গুণ বা বিশেষের প্রকাশক, সেই চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মে কোন্ গুণ বা বিশেষ আরোপ করিব? গুণমাত্রেই সীমা বা সঙ্কীর্ণতা সূচিত হয়। চৈতন্যের সীমা কোথায় ও কিরূপ? ব্যাপকতম গুণের আরোপেও চিন্ময় ব্রহ্ম অযথা পরিচ্ছিন্ন হন। সুতরাং তিনি নির্গুণ বা

গুণাতীত। কিন্তু কোন গুণ তাঁহার অতীত নহে, কারণ সর্ব্ববিধ গুণ বা লক্ষণ জ্ঞানেই বাস্তব হয়। ইহাই তাঁহার বিশ্বব্যাপী মহিমা, তাঁহার সগুণ ভাব। সুতরাং সগুণ ব্রহ্ম পৃথক্ তত্ত্ব নহেন, পরন্তু নির্গুণেই সগুণের প্রতিষ্ঠা, আর বিশ্ব থাকিতে এই দ্বিবিধ ভাবের সমাবেশে ব্রহ্ম পূর্ণ।

উপনিষদে সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর

এই সগুণ ব্রহ্মই উপনিষদের ঈশ্বর। যাজ্ঞবল্ক্য ইহার সম্বন্ধে প্রশস্ত ও বিশদ উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু তাহা বিভিন্ন জিজ্ঞাসুর বিবিধ সংশয় ভঞ্জনার্থ প্রদত্ত হইয়াছিল বলিয়া কোন বিশেষ উক্তিতে ঋষির উপলব্ধির সম্যক্ পরিচয় নাই। সুতরাং সমগ্র উপদেশের সার যথাসাধ্য সংগ্রহ করিয়া নিম্নে দিলাম। বিশ্ব পরিণামী আর বিশ্ববাসী জন্মমৃত্যুর অধীন, কিন্তু বিশ্বনাথ অক্ষর। ইনিই প্রকৃত বিজ্ঞাতা, আর বিশ্বে যাহা কিছু আছে বা ঘটে, সকলই বিশেষিত জ্ঞান। বিজ্ঞান কিন্তু কখন বিজ্ঞাতাকে অতিক্রম করে না। সুতরাং তথাকথিত বহির্জগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই; অক্ষর পুরুষই তাহার চরম আশ্রয়। স্বর্গ ও মর্ত্ত্য আকাশের অন্তরস্থ, সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই সীমাহীন অবকাশ বিজ্ঞাতায় অবস্থিত, কারণ অবকাশও একপ্রকার অনুভূতি। অল্পজ্ঞ জীব অধিকার অনুসারে ইহার জ্ঞানে জ্ঞানী হয়, সুতরাং তাহার পক্ষে জগৎ ও উহার আকাশরূপ আধার বাহ্য বটে। কিন্তু আধার বা আধেয় যাহাই হউক, কোন প্রকার বিষয়কে জ্ঞানের অতীত বলিলে অযোগ্যভাষণ হয়। কালের প্রবাহও ইহার অধীন, কারণ পারম্পর্য্যও একপ্রকার বিজ্ঞান। অতএব ইনি সর্ব্বাশ্রয়। আর কেবল তাহাই নহে, জীবের আবির্ভাবে ও স্থিতিতে ইহার মহিমা সুস্পষ্ট, যেহেতু শ্বাসাদি অযত্নসম্ভূত অথচ অপরিহার্য্য ক্রিয়ার কর্ত্তা জীব নহে। বস্তুতঃ বিজ্ঞাতাই

তাহার প্রাণের প্রাণ, মনের মন ও ইন্দ্রিয়গ্রামের দ্যোতক। নৈসর্গিক ব্যাপারেও তাঁহার অধিষ্ঠাতৃত্ব প্রকট, কারণ শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্ত্তিতা সর্ব্বত্র বিদ্যমান, আর অচেতনে এই দুইটি গুণ স্বাভাবিক নহে। অতএব পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও দ্যুলোক, সূর্য্য, চন্দ্র ও তারকাপুঞ্জ, তাবৎ জীব, জীববীজ ও ভোগ্যবস্তু ইঁহার বিবিধ শরীর; অন্তর্যামিরূপে ইনি তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করেন; অর্থাৎ আশ্রয় ও নিয়ন্তা উভয়ই এই অক্ষর পুরুষ; বাহিরে ও অন্তরে ইনি বিদ্যমান।

কিন্তু দেশে বিস্তৃত ও বৈচিত্র্যপূর্ণ বহির্জগতের লক্ষণ ইঁহার স্বরূপে নাই। আর অন্তর্জগৎ দ্রুতপরিণামী বৃত্তিনিচয়ের অনুক্রম হওয়ায় ইঁহার ন্যায় কালাতীত নহে। ইনি পৃথিব্যাদি বিভিন্ন দৃশ্যকে ও দেবনরাদি বিবিধ ব্যবহারিক দ্রষ্টাকে আপন সত্তায় পৃথক্ পৃথক্ রাখেন বলিয়া ইনি অদ্বিতীয়, অনুপম। বস্তুতঃ ইঁহাতে নানাত্ব নাই বলিয়াই ইনি নিখিল নানাত্বের আশ্রয় ও অবভাসক। ভোগ্য ও ভোক্তা, এই শব্দ দুইটি প্রচলিত অর্থে গ্রহণ করিলে, ইনি ভোক্তা বা ভোগ্য নহেন, কারণ সুখ দুঃখ ইঁহাতে নাই, অথচ ইনি চৈতন্যময়। সুতরাং ব্যবহারের মানদণ্ডে ইনি অপরিমেয়। তথাপি ইঁহার স্বরূপ ও মহিমা অবিদিত থাকিতে যজ্ঞ ও তপস্যার ফল অস্থায়ী হয়, ভোগ্য বিষয়ও মরীচিকার মত প্রতারিত করে; অতএব কোন প্রকার চরিতার্থতার সম্ভাবনা নাই। বহির্মুখ ইন্দ্রিয় ইঁহার তত্ত্বপ্রকাশে অসমর্থ বটে; কিন্তু শুদ্ধ ও সমাহিত মন ইঁহাকে হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রত্যক্ষ করে, আর তখন উপলব্ধি হয়, ইনি স্বপ্রকাশ, আদিকারণ ও সকলের শাসনকর্ত্তা।

আত্মা এই স্বপ্রকাশ; কারণ প্রতিজীবহৃদয়ে আত্মপ্রত্যয় সতত বর্ত্তমান, অবস্থা অনুসারে ইহা বিকৃত হইলেও কখন

বিলুপ্ত হয় না আর ইহার উদ্রেকে কোন নিমিত্তের অপেক্ষা নাই। অবসাদে ইহা লুপ্তপ্রায় ও নিদ্রায় সমাচ্ছন্ন হয় বটে; কিন্তু আত্মপ্রত্যয় আত্মার প্রতিকৃতি মাত্র আর মানসিক অথবা শারীরিক শ্রান্তি এই প্রতিকৃতিকে ম্লান করে, আত্মাকে কখন নিষ্প্রভ করে না। পরন্তু তাঁহার জ্যোতিতেই সকলের উদ্ভব। বিষয়ের পরিচয় অনুভবে বা অনুমানে অথচ অনুভব ও অনুমান নিয়ত আত্মপ্রত্যয়ের অনুষঙ্গ। প্রতিপক্ষ বলিবেন, আত্মজ্ঞান ও বিষয়জ্ঞান সংযুক্ত বটে; তথাপি আত্মাকে বিষয়ের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা বলা অন্য প্রতিজ্ঞা, আর সংযোগ অবিচ্ছেদ্য হইলেও ইহা প্রতিপন্ন হয় না। কিন্তু দ্রষ্টা ব্যতীত দর্শন অসম্ভব আর দর্শনের অতীত দৃশ্য নাই। সচরাচর দৃশ্যের আমন্ত্রণে দর্শন সম্পন্ন হয় সত্য; কিন্তু এই সাধারণ অভিজ্ঞতায় অহঙ্কার কর্ত্তা ও ইন্দ্রিয়বর্গ করণ, আর আত্মা ও অহঙ্কারে প্রভেদ উপেক্ষণীয় নহে, কারণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অহঙ্কার বা দেহাবচ্ছিন্ন অস্মিতা ও ইন্দ্রিয়গ্রাম বিবিধ, অথচ আত্মার অধিষ্ঠান সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা একই রূপ। বস্তুতঃ ইনি অজ, ধ্রুব ও মহান(১)।

উপনিষদে ব্রহ্ম ও আত্মা সমনাম। ব্রহ্ম শব্দে বাচ্যের অতুলনীয় মহিমাই উদ্দিষ্ট; তিনি নিরতিশয়, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যাহা কিছু আছে, সকলই তাঁহার অন্তর্গত। পক্ষান্তরে আত্মা শব্দে তাঁহার স্বরূপের স্পষ্ট নির্দ্দেশ, তিনি নিজবোধ-রূপ অর্থাৎ অধিকারী চৈতন্য। আত্মার নির্দ্দোষ বর্ণনা কঠিন, সন্দেহ নাই, কিন্তু আত্মা সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা নিতান্ত অস্পষ্ট নহে, কারণ আত্মবোধ জ্ঞানের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মৌলিক। আর সূত্রে মণিগুলির মত অন্যান্য প্রত্যয় ইহাতে গ্রথিত। বিশ্বও বোধাত্মক; রূপরসাদি অনুভব ইহার উপাদান; সুতরাং

(১) বৃহদারণ্যক ৪।৪।২৩, ২৪

ইহারও আত্মভাবে প্রতিষ্ঠা। পর বা অনাত্মরূপে ইহা গৃহীত হয় সত্য; কিন্তু এতাদৃশ দৃষ্টিভঙ্গী দেহাবচ্ছিন্ন পুরুষের বা অহঙ্কারের। বস্তুতঃ বিষয়মাত্রেই অনুভূতি সাপেক্ষ আর কোন অনুভূতি চৈতন্য বা স্ববোধ হইতে বিচ্যুত নহে।

বিচারে এই পর্য্যন্ত অগ্রসর হওয়া যায়, আর ইহাতে প্রত্যক্ষের সম্পূর্ণতা ও নিশ্চয়তা নাই। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, শান্ত, দান্ত, উপরত ও তিতিক্ষু হইয়া সমাধি অভ্যাস করিলে অন্তরেই আত্মা প্রত্যক্ষ হন, আর তখন সুস্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে তিনি বিশ্বকৃৎ ও বিশ্বনিয়ন্তা, লোক সকল তাঁহার আর তিনিই ঐ সকল লোক(১)। এ দৃষ্টি অবশ্য আমাদিগের নহে, কারণ সাধারণ ব্যবহারে বিষয়ী ও বিষয়ে ভেদ দুরতিক্রম্য। তথাপি ঋষি বলিয়াছেন, ঈশিত্বের পরাকাষ্ঠা আত্মাতেই বিদ্যমান, অন্যত্র নহে। সুতরাং তাঁহার মতে দ্বৈতবোধ অতিক্রম করা সম্ভব আর তাহা অতিক্রান্ত হইলে, আত্মাই যে প্রকৃত ঈশ্বর, এই প্রতীতি হয়।

ঈশ্বর সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা

ঈশ্বর সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা অন্য রূপ। ন্যায়পরতা, দয়া প্রভৃতি সর্ব্ববিধ উৎকৃষ্ট গুণের তিনি আধার। জগৎ তাঁহার সঙ্কল্পপ্রসূত; জীব তাঁহার সন্তান আর সন্তানের মতই ভরণ-পোষণপ্রার্থী অথচ আচরণে স্বতন্ত্র। তিনি অমূর্ত্ত; সুতরাং মূর্ত্ত জগৎ ও জীব তাঁহাতে অবস্থিত নহে, যদিও তাহাদিগের সৃজন ও পালনে তাঁহার প্রভাব প্রকট। জীবের মঙ্গল তাঁহার অভিপ্রেত, আর তাঁহার বিধান অনুসরণ করিলে কল্যাণ সুনিশ্চিত। কিন্তু লোভ মোহের বশে তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিলে, অনুকম্পা ও অনুগ্রহের জন্য প্রার্থনাই দোষক্ষালনের একমাত্র উপায়। বস্তুতঃ অনুতপ্ত চিত্তে ঈদৃশ প্রার্থনা আর

(১) বৃহদারণ্যক ৪।৪।১৩

অভাবপূরণের জন্য ঈশ্বরের পূজা দুর্ব্বল মানবের প্রধান সম্বল, কারণ কৃতকর্ম্ম ও তাঁহার প্রতি মনোভাব অনুসারে মানব পুরস্কৃত বা দণ্ডিত হয়। প্রাকৃতিক ঘটনাবলীও তাঁহার প্রবর্ত্তিত নিয়মের অনুগামী। সুতরাং তিনি বিশ্ব ও বিশ্ববাসীর নিয়ন্তা,—সাধারণ ধারণা এইরূপ, আর ইহাতে দ্বৈতভাব পরিস্ফুট।

এই ধারণা সৎপথে প্রবর্ত্তক হইলেও সদোষ

শ্রুতিও কোন কোন স্থলে বলিয়াছেন,—সৃষ্টির উপক্রমে ব্রহ্ম মানবের মতই কামনার বশে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন। এইরূপে ইচ্ছা, চিন্তা, সঙ্কল্প ও অধ্যবসায়, এমন কি ভয় পর্য্যন্ত তাঁহাতে আরোপ করা হইয়াছে(১)। ব্যবহারের জটিলতা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে ধর্ম্মভাবের বিকাশ হয়; সুতরাং উক্ত ধারণা সদোষ হইলেও তত্ত্বচিন্তায় একটি প্রসিদ্ধ স্তর। জড়বাদী বলেন আকস্মিকতাই সংঘাতের কারণ। শ্রদ্ধাহীন জিজ্ঞাসু বিশ্বের রচনায় ও সংসারের ব্যাপারে অব্যবস্থার প্রচুর দৃষ্টান্ত আবিষ্কার করেন। সুতরাং সংসার যে সঙ্কল্পপ্রসূত আর তাহার নিয়ন্ত্রণে উদ্দেশ্য ও উপায়ে সামঞ্জস্য বর্ত্তমান,—এই অনুমান সৃষ্টিস্থিতির সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা না হইলেও উক্ত লঘুচেতাগণকে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে প্রবর্ত্তিত করে। আর সেই জন্যই, বোধ হয়, ইহা উপনিষদে স্থান পাইয়াছে।

শ্রুতির শ্রেষ্ঠ উপদেশ এরূপ নহে। সঙ্কল্প ইচ্ছার অনুগামী আর ইচ্ছায় অভাব বা অপূর্ণতা নিহিত। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, ব্রহ্ম সর্ব্বময়, সুতরাং তিনি কেবল সদ্‌গুণের আধার নহেন, পরন্তু তেজ ও অতেজ, কাম ও অকাম, ক্রোধ ও অক্রোধ, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম তাঁহাতে সমভাবে বিদ্যমান(২)। কিন্তু স্বরূপে তিনি ইহাদিগের কোনটি নহেন বলিয়াই এই বিরুদ্ধ ভাবগুলির

(১) বৃহদারণ্যক ১।৪ (২) বৃহদারণ্যক ৪।৪।৫

তাঁহাতে সন্নিবেশ। আকাশ তুষার বা অনল, ভূমি বা সলিল নহে, অথচ ইহারা আকাশে অবস্থিত; ইহাদিগের কোনটি আকাশ হইলে, সকলের আকাশে অবস্থান সম্ভব হইত না কিন্তু ব্রহ্ম চরাচরের আশ্রয়মাত্র নহেন, তিনি সর্ব্বপ্রকারে তাহাদিগের কারণ। তাঁহাকে বিজ্ঞান ও আনন্দ বলা হইয়াছে। এই বিজ্ঞানের প্রসার অনন্ত আর আনন্দ ইহার সমবায়ী অর্থাৎ প্রযত্নের অপেক্ষা ইহাতে নাই। অথচ সমগ্র বিশ্ব ইহাতে উদ্ভূত হয়। বস্তুতঃ এই উদ্ভব ব্রহ্মের জ্ঞানময় তপস্যা অর্থাৎ জ্ঞানের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি, সরল ও অবাধ বিকাশ। বহির্জগতে এমন কিছু ঘটে না, অন্তর্জগতে এমন কোন ভাবের উদয় হয় না, যাহা এই বিকাশের অন্তর্গত নহে। সুতরাং ব্রহ্মের শাসন সর্ব্বব্যাপী, নিরন্তর ও অব্যবহিত; অনুকম্পার অনিশ্চয়তা বা বিচারের বিলম্ব তাহাতে নাই। জীব তাঁহার রাজ্যে স্বভাব অনুযায়ী কর্ম্ম করে আর কর্ম্মের অনুরূপ ফলভোগ তাহার হয়। অতএব তাহার স্বভাব, কর্ম্ম ও ভোগ, কোরক, পুষ্প ও ফলের মত সম্বন্ধ। অর্থাৎ সর্ব্বত্রই প্রজ্ঞার ঋজুপথ অনুসৃত হইয়া থাকে।

শ্রুতির ঈশ্বরবাদ অদ্বৈতবাদ হইলেও ধর্ম্মজীবনের অনুকূল

কিন্তু কোন কোন মনীষীর মতে এই অদ্বৈতবাদ ধর্ম্মাচরণের অনুকূল নহে আর মুক্তির আশ্বাস ইহাতে নাই। তাঁহারা বলেন, স্বভাবের আবেষ্টন যদি অনতিক্রম্য হয়, আর সেই সঙ্কীর্ণ আবেষ্টনের মধ্যেও কৃতকর্ম্মের নিগড় উন্নতির প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করে, তাহা হইলে মুক্তি অসম্ভব আর অভ্যুত্থান সুদূরপরাহত। কিন্তু বুদ্ধি বা শুভাশুভ বিচারের ক্ষমতা স্বভাবের অন্তর্গত, আর কর্ম্মদোষে চিত্ত নিতান্ত বিকল না হইলে, ইহাই কল্যাণের পথে প্রবর্ত্তিত করে। কেবল তাহাই নহে, সকল হৃদয়েই আত্মার অধিষ্ঠান, আর তাঁহার অনাবিল,

অনাসক্ত ভাবই শ্রেয়োলাভের পক্ষে শ্রেষ্ঠ প্রেরণা। সুতরাং মুক্তির পথ সকলের জন্যই উন্মুক্ত আছে। কিন্তু নিকৃষ্ট সংস্কার প্রবল থাকিতে এই পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। অতএব কামনা বা বিষয় ভোগের অভিলাষ বর্জ্জন করিতে হয়। তাহা কঠিন বটে, কিন্তু অসাধ্য নহে। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন ইহ জীবনেই আত্মাতে সম্পূর্ণরূপে অভিনিবেশ সম্ভব,(১) আর তাহাই পরম গতি। কিন্তু তাহার জন্য ঈশ্বরের কৃপাকটাক্ষ ভিক্ষা করা সঙ্গত নহে। বিষয়বৈরাগ্য ও প্রজ্ঞাসাধন দ্বারা মুক্তি অর্জ্জন করিতে হয়,—ইহাই তাঁহার ন্যায্য নিয়ম, কারণ বিষয় জীবকে বদ্ধ করে আর প্রজ্ঞা ও মুক্তি ভিন্ন নহে।

ব্রহ্মের উপাসনা প্রকৃতপক্ষে হৃদয়স্থ আত্মার উপাসনা

প্রাচীন উপনিষদে আত্মার উপাসনাই আদিষ্ট হইয়াছিল। তাহার পূর্ব্বে বহু দেবদেবীর অর্চ্চনা প্রচলিত থাকিলেও, ঋগ্বেদ বলিয়াছেন ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নি প্রভৃতি নামে একই দেবতাকে সদ্‌ব্রাহ্মণ যজ্ঞে আহ্বান করিতেন, সুতরাং প্রকারান্তরে আত্মার উপাসনাই হইত(২)। পরবর্ত্তী যুগে অন্যান্য ধর্ম্মের সংস্পর্শে ও আড়ম্বরপ্রিয়তার ফলে উপনিষদের সরল ও শুদ্ধ সাধনার অনাদর হয়। কিন্তু যে চিরন্তন সত্য সেই সাধনার মূলে ছিল তাহা অনাদৃত হয় নাই, কারণ পূজাপদ্ধতিতে ও জপে তাহার আভাস পাওয়া যায় আর হিন্দু এখনও উৎসবে ও ব্যসনে পরমাত্মাকে স্মরণ করেন। যাজ্ঞবল্ক্য অমর ভাষায় এই সত্য প্রচার করিয়াছেন। আত্মা তৃপ্ত হইবেন এই বিশ্বাসে মানব স্বর্গবাস ও মোক্ষ কামনা করে। আত্মা সেবা ও সম্পদে প্রীত হন এই বোধে সে স্ত্রী, পুত্র, ধন, জনে অনুরক্ত হয়। বস্তুতঃ তাহার সকল আশা, আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যমে আত্মপ্রসাদই লক্ষ্য, অর্থাৎ কোন প্রচেষ্টায় আত্মার ঊর্দ্ধে দৃষ্টি যায় না।

(১) বৃহদারণ্যক ৪।৪।১৪ ; (২) ঋগ্বেদ ২।৩।২২

অথচ তাহার আজীবন প্রযত্ন কদাচ সফল হয়। সুতরাং আত্মা প্রকৃতপক্ষে কি তাহা শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা স্থির করা উচিত। যাজ্ঞবল্ক্যের আদেশ এইরূপ(১)।

কিন্তু অধ্যাত্মচিন্তায় প্ররোচিত করিয়া ঋষি ক্ষান্ত হন নাই। কোন্ পথে অগ্রসর হওয়া আবশ্যক অর্থাৎ কিরূপ চিন্তাধারা ফলবতী হয় তাহাও তিনি বিশেষভাবে বলিয়া দিয়াছেন। জনকের সভায় কতিপয় পাণ্ডিত্যাভিমানী শাস্ত্রজ্ঞ তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞানের প্রামাণ্য পরীক্ষা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হন, আর সেই বিচারে এই বিবৃতি দেওয়া হয়। তাঁহারা ব্রহ্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিলেন অথচ ঋষি উত্তরে আত্মার সন্ধানই দিয়াছিলেন, অতএব জগৎকারণ ব্রহ্ম ও জীবহৃদয়ে অধিষ্ঠিত আত্মাতে তিনি ভেদ করেন নাই। এ বিষয়ে তাঁহার উপদেশ প্রশ্নোত্তরের আকারে নিম্নে ব্যাখ্যাত হইল।

প্রশ্ন—ব্রহ্ম কি প্রত্যক্ষযোগ্য? যদি সাক্ষাৎকার সম্ভব হয়, কোথায় ও কিরূপে তাহা হইতে পারে?

উত্তর—স্বীয় অন্তরেই তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব, কারণ যিনি তোমার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন, বিশ্বও তাঁহার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তোমার জীবনের আরম্ভ প্রাণবায়ুর চতুর্ব্বিধ সঞ্চারে। অথচ কোন বাহ্য জড়শক্তি এই সঞ্চারের কারণ নহে, যেহেতু তাহারা বর্ত্তমান থাকিতেও সঞ্চারের পরিসমাপ্তি হয়। বুদ্ধি প্রভৃতি মানসিক বৃত্তিও ইহার কারণ হইতে পারে না, যেহেতু তাহাদিগের উদ্ভব উক্ত সঞ্চারের পরে, পূর্ব্বে নহে। অতএব ব্রহ্ম বা প্রকৃত কারণ এই সকল তথাকথিত কারণ অপেক্ষা অন্তরতম, আর অন্তরতম বলিয়া তিনি আত্মা নামে প্রখ্যাত।

(১) বৃহদারণ্যক ২।৪।৫

প্রশ্ন—তোমাকে ব্রহ্মের স্বরূপ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলাম। তুমি কিন্তু তাঁহার কার্য্যের উল্লেখ করিলে। এই বিবরণ পরোক্ষ জ্ঞানের উপায় হইলেও প্রত্যক্ষ উপলব্ধির পক্ষে ইহাতে সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ নাই।

উত্তর—ব্রহ্মই তোমার সর্ব্ববিধ জ্ঞানের জ্ঞাতা। সুতরাং যতকাল ব্রহ্ম ও তুমি ভিন্ন এই দ্বৈতবোধ তোমার থাকিবে, ততকাল কার্য্য অনুধাবনপূর্ব্বক তোমাকে কারণের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। আপাততঃ এই সত্য স্মরণ রাখিও, আত্মা প্রচ্ছন্ন হইলেও তোমার নিজস্ব সুতরাং চিরতরে তোমার, আর জীবনে যাহা কিছু পাইয়াছ সকলই একদিন হারাইবে, সুতরাং তাহা ভাবী দুঃখের কারণ(১)।

প্রশ্ন—তুমি বলিয়াছ জীবের অন্তরে ব্রহ্মের অধিষ্ঠান। কিন্তু অন্তরে বিবিধ বৃত্তি বা মানসিক শক্তি বিদ্যমান। ইহাদিগের কোন্‌টিকে ব্রহ্ম বলিয়া গ্রহণ করিব।

উত্তর—যে সকল মানসিক শক্তির উল্লেখ করিলে, তাহাদিগকে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শোক, মোহ, জরা ও মৃত্যু বিক্ষুব্ধ, অভিভূত ও বিপর্য্যস্ত, এমন কি বিনষ্ট করে। একান্তবিনাশী দেহ ও ইন্দ্রিয়গ্রামের সহিত তাহাদিগের সম্বন্ধ নিকট। কিন্তু আত্মা স্বতন্ত্র, অন্যনিরপেক্ষ, সুতরাং কোন প্রকার অভাব বা আশঙ্কা তাঁহার নাই আর কিছুই তাঁহাকে আচ্ছন্ন করে না। এই তত্ত্ব অবগত হইলে সাধক সর্ব্ববিধ কামনা ত্যাগ করেন। পরে অভ্যাসের বলে এই উদার ও অনাসক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তিনি প্রকৃত ব্রাহ্মণ হন।

প্রশ্ন—তখন তাঁহার আচরণ কিরূপ হয় আর কোন্ আশ্রমে তিনি স্থিতি করেন?

---

(১) বৃহদারণ্যক ৩।৪।৫

উত্তর—কোন বিশেষ আশ্রম বা আচরণ এই চরিতার্থতার নিদর্শন নহে। আত্মার নির্লেপ ও সাম্যই লক্ষ্য, আর তাহার জন্য বিষয়বৈরাগ্য আবশ্যক হইলেও বিষয়বর্জ্জনের প্রয়োজন নাই(১)।

প্রশ্ন—তোমার নির্দ্দেশ অনুসারে আত্মায় অবহিত হইলে আমার দেহাবচ্ছিন্ন আত্মাকেই জানিব। ব্রহ্ম বা বৃহত্তমকে জানিবার উপায় তোমার নির্দ্দেশে কোথায়?

উত্তর—উপাধিতে তোমার দৃষ্টি নিবদ্ধ বলিয়া তুমি এই প্রকার আপত্তি করিলে। কিন্তু সকল ক্ষেত্রে আত্মা বা প্রাণ-সদৃশ নিয়ন্তা একই, কারণ কোন ক্ষেত্রের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ নহে। সুতরাং পৃথবী, অন্তরীক্ষ ও দ্যুলোক যিনি নিয়ন্ত্রিত করেন, তিনিই তোমার নিয়ন্তা। এ সকল তাঁহার বিভিন্ন শরীর বটে, কিন্তু তাঁহার সীমা নহে। হস্তপদাদি অবয়ব আকারে ও অবস্থানে ভিন্ন হইলেও অবয়বীর যেরূপ সমভাবে বশবর্ত্তী, সেইরূপ চরাচর অগণিত দেহের সমষ্টি হইলেও সর্ব্বত্র আত্মার আজ্ঞাবহ। বস্তুতঃ যে আত্মার সন্ধান স্বীয় হৃদয়ে পাইতেছ, তিনি ভিন্ন অন্য দ্রষ্টা বা বিজ্ঞাতা কোথাও নাই আর বিজ্ঞাতাই নিয়ন্তা যেহেতু দৃশ্যজাতের বিজ্ঞান ব্যতীত তাহাদিগের নিয়ন্ত্রণ অসম্ভব। সুতরাং তোমার আত্মার পরিচয়ে ব্রহ্মের সম্যক্ পরিচয় হয়(২)।

প্রশ্ন—নিয়ন্তার অধিষ্ঠান হৃদয়ে আর জীব ও জীবলোক আকাশে অবস্থিত। এমন কি, যাহা কিছু পূর্ব্বে ছিল বা পরে হইবে, সেগুলিও এই ব্যাপক আধারে স্থান পাইয়াছিল বা পাইবে। সুতরাং আত্মা অন্তর্য্যামী হইলেও চরম আশ্রয় নহেন। তাঁহাকে ব্রহ্ম বলিব কেন?

---

(১) বৃহদারণ্যক ৩।৫; (২) বৃহদারণ্যক ৩।৭।৩-২৩

উত্তর—আকাশকে শূন্য বা যাহাই বল, তাহা দৃশ্যের মধ্যে গণ্য, আর দৃশ্য কখন দ্রষ্টাকে অতিক্রম করে না। সুতরাং আকাশ ও তদন্তর্গত সকলই আত্মা বা চরম দ্রষ্টায় ওতপ্রোত-ভাবে বর্ত্তমান(১)।

ব্রহ্ম, আত্মা ও ঈশ্বর শব্দের বাচ্য একই, কেবল প্রয়োগে সামান্য ভেদ

এই দীর্ঘ আলোচনার ফলে দেখি, ব্রহ্ম, আত্মা ও ঈশ্বর একই তত্ত্বের বিভিন্ন নাম যদিও অর্থব্যাপ্তিতে কিছু প্রভেদ করা হয়। ব্রহ্ম শব্দ ব্যাপকত্ব, আত্মা জ্ঞানময়ত্ব ও ঈশ্বর নিয়ামকত্ব প্রকাশ করে, কিন্তু প্রত্যেক আখ্যাতে অন্য ভাবগুলি উপলক্ষিত থাকে। পক্ষান্তরে বিশ্বের পরিকল্পনায় ব্যাপ্য, জ্ঞেয় ও নিয়ম্য এই তিন ভাবই থাকে, যদিও প্রসঙ্গ অনুসারে তাহাদিগের একটি প্রধান হয়। প্রাচীনতম উপনিষদে দেব ও ঈশ্বর শব্দ বিরল, কিন্তু অনুযায়ী ভাব বহুস্থলে সুস্পষ্ট। বৃহদা-রণ্যক আত্মাকে সর্ব্বভূতের অধিপতি বলিয়াছেন ও তাঁহার অমোঘ প্রশাসনের উল্লেখ করিয়াছেন(২)। ঈশোপনিষদের প্রথম উপদেশ, বিশ্বে যাহা কিছু গতিশীল বা পরিণামী, তৎ-সমুদায়ই ঈশ্বরের আশ্রয়ে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়। কেনোপনিষ-দের প্রারম্ভে এই ভাব স্ফুটতর। কাহার প্রেরণায় মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গুলি স্ব স্ব বিষয়ে নিযুক্ত হয়? এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইলে ঋষি উত্তরে বলিয়াছেন, -যে দেবতা এই বিবিধ শক্তির কারণ তিনিই তাহাদিগকে প্রবর্ত্তিত করেন(৩)।

শ্বেতাশ্বতরে ঈশ্বরবাদ

তথাপি কোন কোন সমালোচকের মতে শ্বেতাশ্বতরেই ঈশ্বরতত্ত্ব প্রথম প্রচারিত হয়। এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না। শ্বেতাশ্বতরে দার্শনিক অনুসন্ধিৎসা আছে বটে, কিন্তু প্রাচীনতর উপনিষদ্‌গুলির নির্দ্দেশ উপেক্ষিত হয় নাই। যে চিন্তাধারার

(১) বৃহদারণ্যক ৩।৮।৩-৮; (২) বৃহদারণ্যক ৩।৮।৯;
(৩) কেনোপনিষৎ ১।১-২

ফলে ঈশ্বর সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা হয়, তাহার আভাস উপক্রমেই প্রশ্নের আকারে আছে। কোন সময়ে ব্রহ্মবাদিগণ ব্রহ্ম বিষয়ক আলোচনায় পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন :—ব্রহ্ম কিরূপ কারণ, উপাদান বা নিমিত্ত বা উভয়ই ? কোথা হইতে আমরা ব্যবহারোপযোগী দেহেন্দ্রিয় সম্পন্ন হইলাম ? কাহার প্রভাবে এই সংযোগ স্থায়ী ও জীবনধারণ সম্ভব হইতেছে ? ইহার অবসানে কোথায় স্থিতিলাভ করিব ? আর ইত্যবসরে কাহার নির্দ্দেশেই বা সুখ-দুঃখের পথে বিচরণ করিতেছি(১) ? প্রথম প্রশ্নটি সাধারণ। দ্বিতীয় ও চতুর্থ প্রশ্নে উপাদানই লক্ষ্য, যেহেতু উপাদান কারণে কার্য্যের উৎপত্তি ও লয় হয়। আর তৃতীয় ও পঞ্চম প্রশ্নে নিমিত্ত উদ্দিষ্ট, যেহেতু নিমিত্ত ব্যতীত ক্রিয়া বা গতি হয় না। শাস্ত্র বলিয়াছেন ব্রহ্ম নির্লিপ্ত, চিরস্থির ও সতত একরূপ, অথচ সংসারে জটিলতা ও পরিণাম সর্ব্বত্র। সুতরাং সংশয় হয় সৃষ্টি সম্বন্ধে শাস্ত্রের ব্যাখ্যা যথেষ্ট নহে ও তাহারই ফলে প্রশ্ন ও প্রতিপ্রশ্নের অবতারণা।

দর্শনে ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত ছয়টি কারণের উল্লেখ আছে, যথা—কাল বা পরিণামক্রম, স্বভাব বা প্রতি বস্তুর অন্তর্নিহিত ও প্রকাশোন্মুখ শক্তি, নিয়তি বা ভাবী কর্ম্মের বীজস্বরূপ কৃত-কর্ম্মের সংস্কার, আকস্মিক ঘটনা, আকাশাদি পঞ্চভূত যাহা-দিগের বিবিধ সঙ্ঘাত পরিণামের আধার হয়, আর চেতনাযুক্ত জীব যাহার সুখ-দুঃখরূপ ভোগে পরিণাম আত্মপ্রকাশ করে। ইহাদিগকেও ব্রহ্মবাদিগণ পরীক্ষা করিলেন, কিন্তু পরীক্ষায় সমস্যার সমাধান হইল না। প্রথম পাঁচটি জড় পদার্থ, সুতরাং সম্মিলিতভাবেও তাহারা কোন নিয়ম প্রবর্ত্তনে অসমর্থ অথচ সংসারে নিয়ম বিদ্যমান। আর জীবনচৈতন্যও এ নিয়মের

---

(১) শ্বেতাশ্বতর ১।১

প্রবর্ত্তক নহে, কারণ তাহার কর্ত্তৃত্ব থাকিলে জীবন সুখময় হইত, কিন্তু দুঃখের আধিক্যই নিয়ত দেখা যায়(১)।

অতএব অনুমান ব্যর্থ হওয়ায় ব্রহ্মবাদিগণ ধ্যানযোগে প্রবৃত্ত হইলেন। নিবিষ্টচিত্তে কোন তত্ত্বের অনুচিন্তনই ধ্যান; আর তাহা যোগও বটে, কারণ তত্ত্বের সান্নিধ্যলাভের পক্ষে ধ্যান অপেক্ষা প্রকৃষ্ট উপায় নাই। ব্রহ্ম বা হৃদয়স্থ আত্মা যে ব্রহ্মবাদিগণের ধ্যেয় হইলেন তাহা বলা বাহুল্য। এইরূপে সমাহিত হইয়া তাঁহারা দেখিলেন, ব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ অর্থাৎ সে প্রকাশের নিমিত্ত ও অবধি নাই; পূর্ব্বোক্ত কালাদি তথাকথিত কারণ তাঁহার প্রকাশের ধারা সুতরাং তাঁহার দ্বারা নিয়মিত, আর বিশ্বের পশ্চাতে যে শক্তি অনুমিত হয় তাহা তাঁহার অবাধ দ্যোতনা ব্যতীত অন্য কিছু নহে। প্রশ্ন হইতে পারে, এতাদৃশ তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানলাভার্থ ধ্যানেরই বা প্রয়োজন হইল কেন? যিনি পরম জ্যোতি, নিখিলের প্রকাশক, তিনি ত' সকল অবস্থায় প্রত্যক্ষ হইবেন। কিন্তু কার্য্যের বৈচিত্র্য যেরূপ কারণকে আবৃত করে, চরম তত্ত্বও সেই মত তাঁহার সংখ্যাতীতরূপে প্রচ্ছন্ন থাকেন(২)।

ভুবনত্রয়ে সেই প্রকাশময়ের আবির্ভাব, আর এই আবির্ভাবের নিয়ন্তাও তিনি, কিন্তু তাঁহার নিয়ন্ত্রণ জীবের কর্ত্তৃত্বের মত নহে। জীব অভীষ্টসিদ্ধির জন্য কর্ম্মে নিযুক্ত হয়; কর্ম্ম সম্পাদনের জন্য করণবর্গ ব্যবহার করে; করণগুলিও স্বতন্ত্র আধার বা উপাদান ব্যতীত ক্রিয়াশীল হয় না, আর তাদৃশ ক্রিয়ার ফলে তাহার বাহিরে ও অন্তরে পরিণাম ঘটে। কিন্তু সকলই যাঁহার অন্তর্গত, যাঁহাতে অতীত ও ভবিষ্যৎ সমভাবে বর্ত্তমান, তাঁহার উদ্দেশ্য কি হইতে পারে, আর স্বতন্ত্র

(১) শ্বেতাশ্বতর ১।২; (২) শ্বেতাশ্বতর ১।৩;

সাধক, উপাদান ও আধারই বা কোথায় ? সুতরাং সংসাররূপ বৃহৎ চক্র যে আবর্ত্তিত হইতেছে, তাহা সেই জ্যোতিঃস্বরূপের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি ব্যতীত কিছু নহে, অর্থাৎ বিশ্বাধিপ হইলেও তিনি অকর্ত্তা। অথচ তিনি বিশ্বে ওতপ্রোতভাবে আছেন বলিয়া তাঁহার নিয়ন্তৃত্ব অব্যাহত ও অবিরাম। কিন্তু বিশ্ব তাঁহার সীমা নহে, তাঁহার অতিক্রমণের প্রান্তও নাই, কারণ নির্বিশেষ ভাবের শেষ কে নির্দ্দেশ করিবে ? এই ভাব লক্ষ্য করিয়া প্রাচীনতর শ্রুতি তাঁহাকে প্রপঞ্চাতীত ও অক্ষর বলিয়াছেন। পরন্তু বিশ্বের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ বিচার করিয়া পরবর্ত্তী দর্শন তাঁহার দুরধিগম্য শক্তিকে প্রকৃতি আখ্যা দিয়াছেন। বস্তুতঃ তাঁহার স্বাভাবিক ও অপ্রতিহত জ্ঞানই পরম বল যেহেতু তাহা যাবতীয় ক্রিয়ার বা বিশ্বসৃষ্টির হেতু(১)।

অন্যত্র, বোধ হয়, পূর্ণ ব্রহ্মের এরূপ বিশদ ও বিস্তৃত বর্ণনা নাই। তাঁহার একদিকে যেন সাকার, পরিণামী ও পরতন্ত্র বিশ্ব, অন্য দিকে কারণকার্য্যপরম্পরার অতীত ও উপাধিবর্জ্জিত চিন্মাত্র তত্ত্ব আর মধ্যে নিরাকার নিয়ন্তায় এই বিপরীত কোটিদ্বয়ের মিলন। কিন্তু এতাদৃশ বিশ্লেষণে তত্ত্বে ভেদ অঙ্গীকৃত হয় নাই, তাহার ত্রিবিধ ভাবই পরিস্ফুট করা হইয়াছে। চিন্মাত্রভাবে তিনি নির্গুণ হইলেও বিশ্ব তাঁহার রূপ বা বিকাশ, আর দেশ ও কাল তাঁহার অন্তর্গত হওয়ায় তিনিই এই দেশকালাবচ্ছিন্ন বিকাশ নিয়ন্ত্রিত করেন, যদিও তাঁহাতে সংসারসুলভ কর্ত্তৃত্ব নাই। অতএব তত্ত্ব প্রকৃতপক্ষে একই। কিন্তু পরমার্থসিদ্ধির জন্য তাহা কোন্ ভাবে অর্চ্চনীয় ? দৃশ্যাত্মক বিশ্বের স্বতন্ত্র সত্তা নাই, আর ব্রহ্ম স্বরূপে অর্থাৎ

(১) শ্বেতাশ্বতর ৬।৮

স্বতন্ত্রভাবে বাক্য ও মনের অগোচর অথচ বিশ্বব্যাপারে তাঁহার নিয়ন্তৃত্ব জ্ঞান ও উপাসনার যোগ্য বিষয়। বস্তুতঃ নিয়ন্তাকে জানিলে প্রথমে ঐশ্বর্য্য ও পরে মুক্তি লাভ হয়, কারণ যাবতীয় বিকারী পদার্থের তিনি আশ্রয় ও প্রভু হইলেও নির্ব্বিকার ভাবেই তাঁহার সতত অবস্থান, অর্থাৎ স্বভাব হইতে তিনি কখন বিচ্যুত হন না(১)।

শ্বেতাশ্বতরে নিয়ন্তা সম্বন্ধে উপদেশ সংক্ষেপতঃ এইরূপ। তাঁহার হস্ত নাই অথচ সকলই তাঁহার আয়ত্ত, পদ নাই তথাপি তাঁহার গতি সর্ব্বত্র, চক্ষুকর্ণ নাই কিন্তু তাবৎ দর্শন ও শ্রবণ তাঁহারই। বস্তুতঃ এমন কোন বিজ্ঞেয় নাই যাহা তাঁহার অবিদিত। বহির্জগতে তিনি সর্ব্বত্র বর্ত্তমান আর অন্তর্জগতে অর্থাৎ জীবহৃদয়ে তিনি অন্তর্য্যামিরূপে অধিষ্ঠিত(২)। সুতরাং তাঁহাকে জানিলে সংসাররহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়। অধিকন্তু সর্ব্ব-ব্যাপী ও সর্ব্বাশ্রয় হইলেও তিনি নির্লিপ্ত, নিশ্চেষ্ট ও আনন্দময়, কারণ প্রপঞ্চ চৈতন্যের একান্ত আশ্রিত হইলেও চৈতন্য স্বতঃ-সিদ্ধ, অন্যনিরপেক্ষ। শুদ্ধ, শান্ত চৈতন্য বিশ্বে প্রকট নহে বটে, কিন্তু তাহাই ব্রহ্মের চরম ভাব, 'পরম ধাম', আর তাহাতে নিয়ন্তার চিরপ্রতিষ্ঠা, কারণ বিচিত্র ও বিকারী বিশ্বের আধার ও অধিপতি হইলেও তিনি নিষ্কল ও নিশ্চিন্ত, সতত চঞ্চল বস্তুজাতের মধ্যে বৃক্ষের মত স্তব্ধ, স্থির(৩)। অতএব তাঁহাকে জানিলে ক্ষর ও অক্ষর উভয়ই জানা হয়, আর তাদৃশ জ্ঞানের কালে সমুদায় বন্ধন ছিন্ন হয়, সমুদায় দুঃখ দূর হয় ও জন্মমৃত্যুরূপ আবর্ত্তনের অবসান ঘটে।

উপনিষদে ভক্তির স্থান

শ্রুতির নির্দ্দেশ অনুসারে ব্রহ্ম, আত্মা ও ঈশ্বরতত্ত্ব ব্যাখ্যাত

(১) শ্বেতাশ্বতর ১।১০,১২; (২) শ্বেতাশ্বতর ৩।১৯,২০;
(৩) শ্বেতাশ্বতর ৩।৯

হইল। গীতার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য এতদ্ব্যতীত ভক্তি, সাধনা ও মুক্তি সম্বন্ধে শ্রুতির উপদেশের কিছু আলোচনা আবশ্যক। কেহ কেহ বলেন, প্রামাণিক উপনিষদে ভক্তি উপদিষ্ট হয় নাই। তাঁহাদিগের যুক্তি এইরূপ,—শ্রুতি অনুসারে ব্রহ্মজ্ঞানই মুক্তিপ্রদ, আর এই জ্ঞানলাভের জন্য শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন পর্য্যাপ্ত, সুতরাং শ্রুতিসম্মত সাধনায় ভক্তির অবকাশ নাই; এমন কি, ভক্তি শব্দটিও প্রাচীনতম উপনিষদে বিরল, যদিও পরবর্ত্তী যুগের ধর্ম্মগ্রন্থে ইহার প্রচুর ব্যবহার দেখা যায়; তাহার কারণ উপনিষৎ অদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়াছেন, অথচ ভক্ত ও ভজনীয় এই দ্বিবিধ সত্তা ব্যতীত ভক্তি সম্ভব হয় না। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান বা পরা বিদ্যা ব্যবহারিক জ্ঞানের মত নহে, কারণ সত্যের প্রতি একান্ত শ্রদ্ধা ব্যতীত ইহা অর্জ্জন করা যায় না, আর যিনি 'সত্যের সত্য' তাঁহার প্রতি আন্তরিক অনুরাগ না থাকিলে ইহা চিত্তে প্রতিষ্ঠিত হয় না। দ্বিতীয়তঃ বাচ্যবাচক সম্বন্ধ সাধারণতঃ এরূপ ঘনিষ্ঠ নহে যে কোন বিশেষ বাচকের অভাবে বাচ্যের অভাব প্রমাণিত হয়। আর তৃতীয় যুক্তিতে সাধ্য ও সাধনার প্রভেদ উপেক্ষিত হইয়াছে। জীব ও ব্রহ্ম প্রকৃতপক্ষে অভিন্ন হইলেও উপদেশ ও বিচার দ্বারা ভেদবুদ্ধি বা জীবের স্বাতন্ত্র্যবোধ অপসৃত হয় না; কেবল পরানুরক্তির প্রভাবে তাহা হইতে পারে। সুতরাং অদ্বৈতবাদ ভক্তির বিরোধী নহে, বরং ভক্তি সহযোগেই এতাদৃশ জ্ঞান পূর্ণ ও ফলপ্রসূ হয়।

বৃহদারণ্যকে যাজ্ঞবল্ক্যের আত্মপ্রীতি সম্বন্ধে উপদেশ ভক্তিরসে আপ্লুত। আত্মা তৃপ্ত হইবেন এই ধারণায় মানব পত্নী, পুত্র, ধন, জন আকাঙ্ক্ষা করে। পরকালে স্বর্গলাভও

এই কারণে কাম্য হয়। কিন্তু ভ্রান্তিবশতঃ তৃপ্তির এই কল্পিত উপায়গুলিতে দৃষ্টি ক্রমশঃ এতই নিবদ্ধ হয় যে আত্মা আর লক্ষ্যের মধ্যে থাকেন না। তখন অনুরাগ মুখ্য বিষয়ী হইতে বিচ্যুত হইয়া গৌণ ও অনিত্য বিষয়ে কেন্দ্রীভূত হয়। আত্মা প্রকৃতপক্ষে নিত্য ও পূর্ণ, আর বিষয়গুলি স্বতন্ত্র বস্তু নহে। তিনি অন্তরতম অথচ চরম আশ্রয়; সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে বিশুদ্ধ জ্ঞান ও তাঁহার সহিত নিরন্তরাল মিলন সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়। ইহাই যাজ্ঞবল্ক্যের উক্তির মর্ম্ম, আর ইহাতে ভক্তিবিচ্ছিন্ন জ্ঞান উপদিষ্ট হয় নাই; বরং অহেতুকী ভক্তিই উপদিষ্ট হইয়াছে, যেহেতু আত্মার উপাসনায় বাহ্যবস্তু লাভ কিংবা বহিঃশত্রুদমন উদ্দেশ্য নহে। ছান্দোগ্যে আরুণি ও সনৎকুমার ভিন্ন পথে ব্রহ্মতত্ত্বে উপনীত হইয়াছেন। আরুণি বিশ্বব্যাপী বৈচিত্র্যের অন্তরে পরম দেবতার সন্ধান লইয়াছেন। তিনি সূক্ষ্মতম, সুতরাং দুরধিগম্য, তথাপি পরিণামী ও নশ্বর জগতে তিনিই একমাত্র নিত্য সত্তা ও প্রতি জীবের অন্তঃকরণে আত্মারূপে অধিষ্ঠিত। অতএব অন্য পদার্থ উপেক্ষা করিয়া তাঁহারই ধ্যান করিতে হইবে। সনৎকুমার বলিয়াছেন অস্থায়ী ও সীমাবদ্ধ বিষয়ে সুখ অল্প, সুতরাং তাহার প্রতি অনুরাগও সামান্য। পক্ষান্তরে, যাঁহাতে গ্রাহ্য ও গ্রহণরূপ তাবৎ বিষয় আবির্ভূত ও তিরোহিত হয়, যাঁহার হ্রাস, বৃদ্ধি বা সীমা নাই, তাঁহাকে পাইলেই পূর্ণ সন্তোষ। তিনি আত্মারূপে জীবহৃদয়ে আছেন, তাঁহাকে সতত স্মরণ রাখিলে কোন বন্ধন থাকে না। এতাদৃশ উপদেশে ভক্তির অভাব প্রমাণিত হয় কি ?

কেনোপনিষৎ বলিয়াছেন, যে দেবতা প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয়-বর্গকে স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত করেন, তাঁহারই এইগুলি বিশেষিত

শক্তি, অর্থাৎ কুঠারাদিবৎ ইহারা প্রযোক্তা হইতে ভিন্ন নহে। সুতরাং তিনিই ব্রহ্ম ও প্রকৃত উপাস্য; ইন্দ্রচন্দ্রাদি দেবতা ব্রহ্ম নহেন। মন যেন ব্রহ্মের নিকট যায় ও বার বার তাঁহাকে স্মরণ করে। তিনি ভজনীয় বলিয়া প্রখ্যাত, অতএব তাঁহারই আরাধনা কর্ত্তব্য(১)। কঠোপনিষৎ বলিয়াছেন, বেদত্রয় তাঁহাকে পূজনীয় বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন, বিবিধ তপস্যা তাঁহার উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হয়, মুমুক্ষুগণ তাঁহার সহিত মিলন কামনায় ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করেন(২)। তিনি সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা: একরূপ হইয়াও তিনি আপনাকে বহু প্রকার করিয়াছেন ও প্রত্যেক জীবের জন্য উপযুক্ত ভোগ্য বিধান করিতেছেন, আর হৃদয়মধ্যে তাঁহাকে দর্শন করিলে চিরশান্তি লাভ হয়(৩)। তৈত্তিরীয় বলিয়াছেন, যদি হৃদয়াকাশে আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্ম না থাকিতেন তাহা হইলে কেহই জীবন রক্ষায় প্রবৃত্ত হইত না। ব্রহ্ম ও আত্মার ঐক্য যিনি উপলব্ধি করেন, বিশ্বে তাঁহার ভয়ের কোন কারণ থাকে না(৪)। এ সকলই ত ভক্তির ভাষা। সুতরাং এই মাত্র বলা যায়,—তুচ্ছ স্বার্থসিদ্ধির জন্য কিংবা অন্ধ বিশ্বাসের প্রেরণায় ক্ষুদ্র দেবতার প্রতি অনুরাগ উপনিষদে বিহিত হয় নাই; জ্ঞানোজ্জ্বল চিত্তে যিনি পরা গতি রূপে প্রতিভাত হন, তাঁহারই আরাধনা আদিষ্ট হইয়াছে।

সাধনা—শ্রুতির মতে ব্রহ্মের শান্ত বা উপাধি-যুক্তভাব ও তাঁহার সর্ব্বময়ত্ব ও সর্ব্বাধিষ্ঠাতৃত্ব উভয়ই অনুধ্যানের যোগ্য বিষয়।

সাধনা সম্বন্ধে উপনিষদের উপদেশ সরল ও সুস্পষ্ট হইলেও তত্ত্বব্যাখ্যার মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে তাহা প্রদত্ত হইয়াছে। সুতরাং সম্যক্ ধারণার জন্য বিভিন্ন প্রকরণ হইতে তাহার সঙ্কলন আবশ্যক। এই সাধনার উদ্দেশ্য আত্মদর্শন। যাজ্ঞবল্ক্য

(১) কেনোপনিষৎ ১।৪-৮; (২) কঠোপনিষৎ ১।২।১৫;
(৩) কঠোপনিষৎ ২।২।১২; (৪) তৈত্তিরীয় ২।৭;

বলিয়াছেন আত্মাকে দর্শন করিতে হইবে, তাঁহার সম্বন্ধে যুক্ত উপদেশ গ্রহণ করিতে হইবে; পরে সেই উপদেশ অনুসারে চিন্তার প্রয়োজন, আর চিন্তার ফলে ধারণা সুনিশ্চিত ও সম্পূর্ণ হইলে সাক্ষাৎকারের জন্য ধ্যান আবশ্যক। প্রথম দর্শন হয় অপূর্ণ আত্মার অর্থাৎ তাঁহার কোন আংশিক প্রকাশের। পরে তত্ত্বদর্শীর নির্দ্দেশ মত বিচারের ফলে এই দোষ নিরাকৃত হইলে সাধক প্রগাঢ় ধ্যানের সাহায্যে আত্মার সহিত একীভূত হন। ইহাই সাক্ষাৎকার, সাধনার সিদ্ধি। কিন্তু ধ্যেয় সম্বন্ধে উপনিষৎ দ্বিবিধ আদেশ দিয়াছেন। সত্যকাম প্রথমে ব্রহ্মের সীমাহীন মহিমা লক্ষ্য করেন, তাঁহার সর্ব্বব্যাপিত্ব ও সর্ব্বাধিষ্ঠাতৃত্বই চিত্তকে অগ্রে অধিকার করিয়াছিল(১), পরে তাঁহার নির্লেপ ও নিত্যত্ব অধিগত হয়(২)। সনৎকুমারও প্রথমে মহিমার প্রসারে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন কিন্তু পরে বলিয়াছেন এই বিশ্বব্যাপী মহিমাতেও আত্মার প্রতিষ্ঠা নহে, কারণ তিনি স্বয়ংসিদ্ধ(৩)। বস্তুতঃ পরিণামের পশ্চাতে অপরিণামিত্ব, বহুত্বের আশ্রয়রূপে অনন্যতা চিত্তকে গভীর ভাবে আবিষ্ট করে। সুতরাং শাণ্ডিল্যবিদ্যায় প্রকারান্তরে বলা হইয়াছে, সর্ব্বত্র ব্রহ্ম দর্শনে চিত্ত শান্ত অর্থাৎ বিক্ষেপকর রাগদ্বেষ মুক্ত হয়।

সাধনার উক্ত পদ্ধতিটি পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু অন্যত্র শ্রুতির আদেশ যেন ইহার বিপরীত, কারণ সাধক অনিত্যের সংসর্গ বর্জ্জন পূর্ব্বক নিত্যতত্ত্বে একান্তভাবে অবহিত হইবেন—অভিপ্রায় এইরূপ। কঠোপনিষৎ চিরস্মরণীয় ভাষায় ইহার অভ্যাসক্রম ও যৌক্তিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন, আর সাংখ্যের বিশ্লেষণে ইহার স্বরূপ আরও

(১) ছান্দোগ্য ৪।৫-৮ ; (২) ছান্দোগ্য ৪।১৫ ; (৩) ছান্দোগ্য ৭।২৪

পরিস্ফুট হইয়াছে। উভয় শাস্ত্রই আমাদিগের আলোচ্য, কিন্তু বর্ত্তমান প্রকরণের অনুরোধে শ্রুতির নির্দ্দেশ এস্থলে আলোচিত হইবে। আর মর্ম্মগ্রহণ সুকর হইতে পারে এই আশায় প্রশ্নোত্তরের আকারে তাহার অর্থপ্রকাশ করিব।

জ্ঞানযোগ

প্রশ্ন—সাধ্য কি?

উত্তর—পারতন্ত্র্য ও অনিত্যতা হইতে নিষ্কৃতি। বিষয়ের কামনায় পারতন্ত্র্য অনিবার্য্য আর বিষয়মাত্রেই নশ্বর; ভোগায়তন দেহও অস্থায়ী। সুতরাং সম্ভব হইলে, নিত্য, নিরপেক্ষ, নিরাময়ভাবে চিরপ্রতিষ্ঠাই বাঞ্ছনীয়(১)।

প্রশ্ন—সাধক কে?

উত্তর—সুখদুঃখের ভোক্তা চিত্তেন্দ্রিয়যুক্ত জীব। বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয় তাহার ভোগসাধনে রত থাকে; ভোগ তাহারই জন্য: ইহারা করণ বা সেবক মাত্র। বুদ্ধি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করে ও তাহার সিদ্ধান্ত অনুসারে মনকে নিয়োজিত করে, আর মন ইন্দ্রিয়গুলিকে স্ব স্ব বিষয়ে প্রবর্ত্তিত করে। অতএব দেহকে রথরূপে কল্পনা করিলে জীবাত্মা রথিস্থানীয় হন, আর বুদ্ধি তাঁহার সারথী হয়। সুতরাং মন প্রগহরূপে, ইন্দ্রিয়গুলি রথে সংযোজিত অশ্বরূপে ও ভোগ্য বিষয় অতিক্রম্য পথরূপে কল্পনীয় হয়। এই সবিশেষ উপমার আলোকে ভোগের পদ্ধতি সুস্পষ্ট(২)।

প্রশ্ন—কিন্তু এবংবিধ ভোগ অনর্থের হেতু হয় কেন?

উত্তর—বুদ্ধি কার্য্যাকার্য্য নিরূপণে অসমর্থ হইলে কিংবা মন চঞ্চল ও অশুদ্ধ থাকিলে, বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়গুলি যথেচ্ছ বিচরণ করে। বাহ্য বিষয় লাভই তখন একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, কারণ বুদ্ধি উচ্চতর প্রয়োজনে করণবর্গকে নিযুক্ত করিতে পারে

(১) কঠোপনিষৎ ১।১।২৬-২৮; (২) কঠোপনিষৎ ১।৩।৩,৪

না। বিষয়লাভে কিন্তু তৃপ্তি নাই, বরং আকাঙ্ক্ষাই পুষ্ট হইতে থাকে। সুতরাং সুখদুঃখ ও জন্মমৃত্যুর আবর্ত্তন অনিবার্য্য হয়(১)।

প্রশ্ন—কিন্তু ভোক্তার পক্ষে ভোগ ব্যতীত অন্য কি সম্ভব? আর বুদ্ধিই বা উৎকৃষ্ট উদ্দেশ্য কিরূপে পাইবে?

উত্তর—স্বয়ম্ভূ ইন্দ্রিয়গুলিকে বহির্ম্মুখ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু জীবদেহে ভোক্তৃভাবের সহিত সাক্ষিস্বরূপ চৈতন্য সতত সংযুক্ত; বস্তুতঃ ভোক্তা ইঁহারই বিকৃত ছায়া মাত্র। জীব রমনীয় বস্তুর অন্বেষণে ব্যাপৃত থাকে বলিয়া ইঁহার সন্ধান পায় না, কিন্তু সূক্ষ্মতত্ত্ব অবধারণে ক্ষমতা লাভ করিলে ইঁহার মহিমা অবগত হয়। ইনি নিত্য ও নির্ব্বিকার অথচ সর্ব্ববিধ বিকারের চরম আশ্রয়, ইনি অশরীরী ও সর্ব্বগত, যদিও প্রতিদেহে ইঁহাকে দেশকালাবচ্ছিন্ন বোধ হয়। ইঁহাকে হৃদয়গুহায় অধিষ্ঠিত জানিলে ভোক্তা আর অনিত্য ও বিচিত্র ভোগের সহিত সহিত একীভূত হন না, অর্থাৎ বিষয়ভোগেই তাঁহার সার্থকতা এ ভ্রান্তি দূর হয়। জীব এইরূপে হর্ষশোকের অতীত হন(২)।

প্রশ্ন—সিদ্ধি বা অমৃতত্ত্বের জন্য আর কি অবশিষ্ট থাকে?

উত্তর—যে সাধক নিত্যানিত্যবিবেক লাভ করিয়াছেন ও মন যাহার ইন্দ্রিয়সংযমে তৎপর হইয়াছে, তিনি সর্ব্বব্যাপী দেবতার শান্তিরূপ শ্রেষ্ঠ ভাবের অধিকারী হন। আর ইহাই সংসারের মত দীর্ঘ ও বন্ধুর পথে চরম লক্ষ্য; যেহেতু ইহাতে উপনীত হইলে জন্মের পর মৃত্যু ও মৃত্যুর পর জন্ম এতাদৃশ অনুক্রম জীবকে আর ব্যথিত করে না। সম্যক্ জ্ঞানেই সুতরাং সকল প্রচেষ্টার পরিসমাপ্তি হয়(৩)।

(১) কঠোপনিষৎ ১।৩।৫,৭; (২) কঠোপনিষৎ ২।১।১, ২, ৪;
(৩) কঠোপনিষৎ ১।৩।৬, ৮, ৯

প্রশ্ন—মনোনিবেশ পূর্ব্বক তত্ত্বোপদেশ গ্রহণ কি তাহা হইলে সাধনার অন্তরঙ্গ ?

উত্তর—না, ব্রহ্মবিদ্যা অপরা বিদ্যার মত কেবল শ্রবণ বা অধ্যয়ন দ্বারা অধিগত হয় না, আর তীক্ষ্ণবুদ্ধি ব্রহ্মভাব প্রাপ্তির নিরপেক্ষ উপায় নহে ; কারণ ইন্দ্রিয় অসংযত আর চিত্ত চঞ্চল ও পাপাচরণে রত থাকিতে পরমার্থ লাভের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। অতএব নিত্যানিত্যে ভেদ হৃদয়ঙ্গম করিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলিকে সর্ব্বতোভাবে মনের অধীন করিবে, পুনরায় সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক মনকে প্রকাশস্বভাব শুদ্ধবুদ্ধির অনুগামী করিবে। এতাদৃশ বুদ্ধি বিষয় গ্রহণ করিলেও বিষয়ে আকৃষ্ট হয় না, বরং জ্ঞাতা রূপে জ্ঞেয় বিষয় হইতে স্বীয় স্বাতন্ত্র্য সতত অনুভব করে। কিন্তু কামনারহিত হইলেও এই 'জ্ঞানাত্মা' দেহীরূপেই প্রতিভাত হয়। সুতরাং সঙ্কীর্ণতা বর্জ্জন পূর্ব্বক ইহাকে সর্ব্বব্যাপী ও জ্যোতির্ম্ময় রূপে ধারণা করিবে। পরিশেষে এই মহত্তত্ত্বকে বিকারী বিশ্বের সংস্রববর্জ্জিত অর্থাৎ কেবল আত্মা বা শুদ্ধ চৈতন্যে নিবেদন করিবে। ইহাই ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ ভাব আর ইহার অনুধ্যানই সাধনার বা যোগের অন্তরঙ্গ(১)।

এই সাধনায় তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজন হয়, যেহেতু অপ্রধান তত্ত্বগুলির উদ্ভব ও আচরণ অবিদিত থাকিতে তাহাদিগকে উপদেশ অনুসারে নিয়মিত করা সম্ভব নহে। সুতরাং ইহা জ্ঞানমার্গ নামে প্রখ্যাত, আর শাস্ত্রপাঠ, বিচার পূর্ব্বক শাস্ত্রের অর্থনির্ণয় ও ধ্যান এই মার্গে পাথেয়রূপে সাধারণতঃ আদৃত। কিন্তু শ্রুতি পাণ্ডিত্য, মেধা ও শাস্ত্রানুশীলনে গুরুত্ব আরোপ করেন নাই, বরং স্পষ্টই বলিয়াছেন, যাহার ব্যবহার মন্দ ও চিত্ত অপবিত্র তাহার প্রজ্ঞা ব্যর্থ হয়(২)। তাহার কারণ

(১) কঠোপনিষৎ ১।৩।১০-১৩ ; (২) কঠোপনিষৎ ১।২।২৩, ২৪

অধ্যাত্মতত্ত্ব অধিগত করিবার জন্য নিবিড় ধ্যানের আবশ্যক, আর অশুদ্ধ চিন্তা ও অযুক্ত আচরণ তাদৃশ ধ্যানের পক্ষে সাংঘাতিক অন্তরায়। নিয়ম মত অধ্যাত্ম চিন্তা চিত্ত সংস্কারের পক্ষে অনুকূল বটে, কিন্তু তাহা যথেষ্ট নহে. কারণ অনিয়ন্ত্রিত ইন্দ্রিয়ের ইঙ্গিতে চিত্ত বিপথে বা বিভিন্ন পথে ধাবিত হয়, ফলে একাগ্রতা কখন প্রগাঢ় হয় না। সুতরাং নৈতিক উৎকর্ষ জ্ঞানযোগের সুদৃঢ় ভিত্তিস্বরূপ।

সকাম কর্ম্ম জ্ঞানযোগের পরিপন্থী; বিহিত কর্ম্মের নিষ্কাম আচরণ পরিপন্থী নহে

কঠোপনিষদের নির্দ্দেশ অনুযায়ী সাধনার প্রণালী বিবৃত হইল। অন্যান্য উপনিষদেও আমরা অনুরূপ উপদেশ পাই। তথাপি কয়েকটি বিষয় বিশদ হইবে বলিয়া কোন কোন উক্তির কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। বৃহদারণ্যক বলিয়াছেন,—আত্মার নিত্য মহিমা কর্ম্ম দ্বারা উপচিত বা অপচিত হয় না। এ স্থলে প্রপঞ্চ বা প্রকাশের মধ্যে ব্রহ্মের স্বরূপে অবস্থিতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই,—তিনি পরিণামের কেন্দ্র ও আশ্রয় হইলেও তাঁহার চৈতন্যরূপ সত্তার কোন ব্যত্যয় হয় না। অতএব ব্রহ্মভাব প্রাপ্তির জন্য সাধক চিত্তেন্দ্রিয়কে সংযত করিবেন, বিষয়ে আকৃষ্ট হইবেন না, পরন্তু ক্লেশসহনে তৎপর হইবেন। এইরূপে একাগ্রতা অভ্যাস করিলে তিনি স্বীয় আত্মাতেই আত্মাকে অবলোকন করিবেন, অর্থাৎ বিষয়ের গ্রহীতামাত্র সাত্ত্বিক বুদ্ধিতে পরমাত্মা বা শুদ্ধ চৈতন্যকে দেখিবেন(১)। এ স্থলে কর্ম্মত্যাগ আদিষ্ট হয় নাই। অন্যত্র বলা হইয়াছে বটে,—যাহারা অক্ষরকে না জানিয়া আহুতি প্রদান করে, বহুবর্ষব্যাপী তপস্যা করে, তাহাদিগের পুণ্যকর্ম্মার্জ্জিত সুখভোগ অস্থায়ী হয়(২)। কিন্তু ইহা জ্ঞানহীন সকাম কর্ম্মের নিন্দা, যাবতীয় কর্ম্মের নহে, যেহেতু ঋষি পরে

(১) বৃহদারণ্যক ৪।৪।২৩; (২) বৃহদারণ্যক ৩।৮।১০

বলিয়াছেন, কেবল বিদ্যায় রত হইলে ঘোর অন্ধকারেই থাকিতে হয়(১)।

এ সম্বন্ধে ঈশোপনিষদের উক্তি আরও স্পষ্ট, আর তাহার ভাবার্থ এইরূপ :—যাহারা অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া অনুরাগ কিংবা বিদ্বেষের প্ররোচনায় কর্ম্ম করে, তাহাদিগের শ্রেয়স্কর জ্ঞানলাভ করিবার সম্ভাবনা নাই সত্য ; কিন্তু যাহারা তত্ত্ব-জ্ঞানের প্রয়াসী হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা করে, তাহাদিগের ভবিষ্যৎ আরও ভয়ঙ্কর। অতএব বিহিত কর্ম্মের সম্পাদনে স্বীয় লাভালাভ বিচার করিবে না ; তাহা হইলে মৃত্যুকে জয় করিবে, যেহেতু লোভই মৃত্যুপ্রমুখ যাবতীয় অনর্থের কারণ। আর অজর, অমর ভাব প্রাপ্তির জন্য পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্জ্জন করিবে ও তাঁহাকে সতত স্মরণ রাখিবে(২)। বৃহদারণ্যক কামনাকেই মুক্তির পথে অন্তরায় বলিয়াছেন, কর্ম্মকে বলেন নাই। হৃদয় হইতে যাবতীয় কামনা দূরীভূত হইলে জীব ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হয় ও মৃত্যুর পরে অক্ষয় তেজঃস্বরূপ শ্রেষ্ঠ ভাব লাভ করে, কারণ দেহপাত কালে তাহার চিত্তেন্দ্রিয় সংক্রান্ত সর্ব্ববিধ দৌর্ব্বল্য ও সঙ্কীর্ণতা নির্ম্মোকের ন্যায় চিরতরে পরিত্যক্ত হয়,—এই তত্ত্ব যাজ্ঞবল্ক্য প্রকাশ করিয়াছেন(৩)।

ছান্দোগ্যে দেখি, বিষয়গ্রহণ রাগদ্বেষ বর্জ্জিত হইলে চিত্ত নির্ম্মল হয়, চিত্ত নির্ম্মল হইলে আত্মস্মৃতি স্থির হয়, আর এই পরম জ্ঞানে প্রতিষ্ঠা লাভ করিলে কোন বন্ধনই থাকে না। এতাদৃশ মুক্তির অর্থ বিষয়োপলব্ধির অবসান নহে, কারণ তত্ত্বদর্শী সকলই দর্শন করেন, অথচ রোগ, দুঃখ ও মৃত্যু তাঁহাকে ব্যথিত করে না, অর্থাৎ সম্যক্ দর্শনের ফলে এই

(১) বৃহদারণ্যক ৪।৪।১০ (২) ঈশোপনিষৎ ১১ ; (৩) বৃহদারণ্যক ৪।৪।৭

অনর্থগুলি তুচ্ছ বলিয়া প্রতীত হয়(১)। বাহ্য বিষয়ে অনু-রাগই জীবকে প্রতারিত ও পরাধীন করে। যাহা কিছু বাঞ্ছনীয়, সকলই তাহার হৃদয়াকাশে বর্ত্তমান। কিন্তু অজ্ঞ ক্ষেত্রস্বামী যেমন ক্ষেত্রের উপরে বার বার বিচরণ করিলেও ক্ষেত্রে প্রোথিত ধনের সন্ধান পায় না, তত্ত্বজ্ঞানহীন ব্যক্তি তেমনই হৃদয়াকাশরূপ ব্রহ্মলোকে নিয়ত যাইলেও অবিদ্যার প্রভাবে বহির্জগতে কাম্য বস্তুর অন্বেষণ করে(২)। বস্তুতঃ দেহস্থ চিত্তেন্দ্রিয় যাহা অন্যত্র লাভ করে কিংবা করে না, সে সকলই হৃদয়স্থ আত্মাতে নিহিত। কিন্তু দেহের মত এই হৃদয়াকাশ অস্থায়ী ও সসীম নহে। অতএব এই আকাশেই অনুধ্যান কর্ত্তব্য, কারণ আত্মা প্রাণিগণের মর্ম্মস্থলে অধিষ্ঠিত হইলেও স্বতন্ত্র, নিরপেক্ষ, তিনি দেশে অনবচ্ছিন্ন ও কালে অবিকৃত আর বিষয় তাঁহার জ্যোতিতে বস্তুত্ব লাভ করে। সুতরাং তিনিই উপাস্য। ছান্দোগ্যের এই উপদেশ দহরবিদ্যা নামে প্রসিদ্ধ(৩)।

মুণ্ডক যজ্ঞাদি কর্ম্মের নিন্দা করিয়াছেন বটে; কিন্তু সে অপবাদ জ্ঞানহীন সকাম কর্ম্মের(৪)। এই শ্রুতিতে আত্মা ও পরমাত্মা বা ব্রহ্মে কিছু প্রভেদও করা হইয়াছে, কিন্তু সে প্রভেদ কেবল সাধনার জন্য; তত্ত্বে ভেদ করা হয় নাই। ঋষি বলিয়াছেন, উপাসনায় ব্রহ্মবাচক প্রণব ধনুস্থানীয়, আত্মা শর ও ব্রহ্ম লক্ষ্য(৫)। এ রূপকের অর্থ সুস্পষ্ট। একাগ্রতার জন্য ওঁকার জপ করিতে থাকিবে ও তৎকালে কূটস্থ আত্মাকে স্মরণ করিবে। ধ্যান গভীর হইলে এই হৃদয়বাসী আত্মা সর্ব্ব-পরিচ্ছেদশূন্য, বিশ্বের মহৎ আশ্রয় ব্রহ্মরূপে প্রতিভাত হইবেন।

---

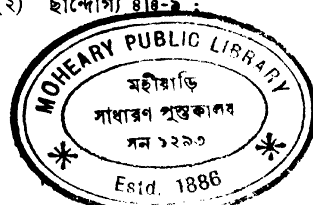
(১) ছান্দোগ্য ৭।২৬; (২) ছান্দোগ্য ৮।৩।২; (৩) ছান্দোগ্য ৮।১; (৪) মুণ্ডক ১।২।৯; (৫) মুণ্ডক ২।২।৪;

শর যেরূপ লক্ষ্যে মগ্ন হয়, সাধকের অন্তরস্থ আত্মা সেইরূপ ব্রহ্মের সহিত একীভূত হইবেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদিগের মধ্যে পার্থক্য কখনই নাই; জীব পার্থক্য কল্পনা করিয়া দুঃখভোগ করে। সুতরাং এই মোহ দূর করাই সাধনার উদ্দেশ্য। তৈত্তিরীয় বলিয়াছেন,—ব্রহ্ম ও আত্মা অভিন্ন, এই তত্ত্ব যিনি উপলব্ধি করেন নাই, ব্রহ্ম তাঁহার পক্ষে ভয়ের কারণ হন(১); অতএব অভয়প্রাপ্তির একমাত্র উপায় বুদ্ধিস্থিত আত্মা ও ব্রহ্মে একত্ববোধ। শ্বেতাশ্বতরেও অনুরূপ উপদেশই প্রদত্ত হইয়াছে, কেবল আত্মা ও ব্রহ্ম শব্দের পরিবর্ত্তে ঈশ ও দেব স্থানে স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে।

শ্রদ্ধা ও কর্ত্তব্য-পালনে এক-নিষ্ঠা মোক্ষ-প্রদ জ্ঞান লাভের অন্ত-তর উপায়।

আর এক কথা,—পরা বিদ্যা লাভের জন্য শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন আদিষ্ট হইলেও অন্য উপায় উপেক্ষিত হয় নাই। এ সম্পর্কে শাস্ত্রের উদার দৃষ্টি ও সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতায় যে কত প্রভেদ তাহা লক্ষ্য করা উচিত। সুতরাং তাহা সুস্পষ্ট হইবে, এই আশায় আমরা দুইটি আখ্যায়িকার কিছু আলোচনা করিব। আখ্যায়িকার একটি জবালাপুত্র সত্যকাম সম্বন্ধে(২), অন্যটি উপকোসল কামলায়নের কথা(৩), আর উভয়ই ছান্দোগ্যের মত প্রাচীন শ্রুতির অন্তর্গত। সত্যকাম উপযুক্ত আচার্য্যের আশ্রয়গ্রহণে প্রবৃত্ত হইয়া মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—তিনি কোন্ গোত্রীয়? কিন্তু মাতা উত্তরে বলিলেন, যৌবনে বহু পুরুষের পরিচর্য্যা তিনি করিয়াছিলেন, সুতরাং পুত্রের গোত্র কি তাঁহার পক্ষে বলা কঠিন। পরে উপনয়ন ও উপদেশের আশায় সত্যকাম গৌতমের সমীপে উপস্থিত হইলে, গৌতম তাঁহাকে গোত্র সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন, আর সত্যকামও

(১) তৈত্তিরীয় ২।৭; (২) ছান্দোগ্য ৪।৪-৯;
(৩) ছান্দোগ্য ৪।১০-১৫



এ বিষয়ে প্রাপ্ত সংবাদ আনুপূর্ব্বিক প্রদান করিলেন। তখন গৌতম সত্যকামকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—অব্রাহ্মণ কখন এতাদৃশ অপ্রিয় সত্য প্রকাশ করিত না; তুমি প্রকৃত ব্রাহ্মণ, সুতরাং পরিচয় নিন্দার্হ হইলেও আমি তোমাকে উপনীত করিব। কিন্তু উপনয়নের পরে সত্যকাম চারিশত দুর্ব্বল ও কৃশ ধেনুর অনুগমন করিতে আদিষ্ট হইলেন, আর তিনিও প্রতিশ্রুতি দিলেন, পশুগুলির সংখ্যা সহস্র হইলে গুরুগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। সুতরাং সত্য পালনার্থ তাঁহাকে বহুবর্ষ বন হইতে বনান্তরে ভ্রমণ করিতে হইল। অবশেষে পালিত পশুর সংখ্যা সহস্র হইলে যূথস্থ বৃষ তাঁহাকে ব্রহ্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিল, আর অগ্নি, হংস ও মদ্গু—সেই উপদেশ পূর্ণ করিল। সুতরাং ব্রহ্মবিদের মত অপূর্ব্ব জ্যোতিযুক্ত হইয়া তিনি আচার্য্যকুলে প্রত্যাগমন করিলেন।

উপকোসল কামলায়ন সত্যকামের শিষ্য। গুরুর আদেশ অনুসারে দ্বাদশ বর্ষ তিনি গৃহস্থিত অগ্নিত্রয়ের কায়মনোবাক্যে অর্চ্চনা করিলেন। কিন্তু গুরু প্রবাসে যাইবার পূর্ব্বে অন্যান্য শিষ্যকে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমনের অনুমতি দিলেন, তাঁহাকে কিছুই বলিলেন না। তখন কামলায়ন অনশনে প্রাণত্যাগ করিবেন স্থির করিলেন, আর গুরু-পত্নীর অনুরোধও সেই নিষ্ঠুর সঙ্কল্প হইতে তাঁহাকে বিচলিত করিল না। কিন্তু অর্চ্চিত অগ্নিত্রয় তাঁহাকে শান্তিপ্রদ উপদেশ দেওয়ায় তাঁহার অবসন্ন চিত্ত অশ্বস্ত হইল, আর গুরু প্রবাস হইতে আসিয়া সেই উপদেশ সম্পূর্ণ করিলেন।

সত্যকামের সাধনায় সত্যনিষ্ঠাই প্রধান, কারণ সত্যের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ন রাখিবার জন্য তিনি নিঃসঙ্কোচে কুলকলঙ্ক ব্যক্ত করিয়াছিলেন। অপ্রীতিকর অবগতির—অকুণ্ঠ প্রকাশ

সরলতার চূড়ান্ত নিদর্শন। তাদৃশ সরলতা সংসারে বিরল, সন্দেহ নাই ; কিন্তু বিরল হইলেও যিনি সত্যের সত্য তাঁহাকে উপলব্ধি করিবার জন্য একান্ত আবশ্যক। সত্যকামের শ্রদ্ধা ও কর্ত্তব্যপরায়ণতাও অনন্যসাধারণ। প্রত্যাখ্যানের সম্ভাবনা অগ্রাহ্য করিয়া তিনি শ্রদ্ধেয় আচার্য্যের নিকট পরম জ্ঞান লাভের জন্য আসিয়াছিলেন। তিনি প্রত্যাখ্যাত হন নাই বটে ; কিন্তু আচার্য্য তাঁহাকে গোচারণে নিযুক্ত করিলেন। তথাপি তিনি ক্ষুণ্ণ হইলেন না। গুরুর আদেশ আপতদৃষ্টিতে অন্যায্য হইলেও তাঁহার পক্ষে কল্যাণকর হইবে, এই স্থির বিশ্বাসে তিনি দীর্ঘকাল বিজন বনে কষ্টভোগ করিলেন। আর কর্ত্তব্যপালনে এই একনিষ্ঠা তাঁহাকে পরম জ্ঞানের অধিকারী করিল। কামলায়নের শ্রদ্ধা, কর্ত্তব্যবুদ্ধি আর বিনয়ও সামান্য নহে। গুরুগৃহে শাস্ত্রানুশীলনের পরিবর্ত্তে তাঁহাকে আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে নিযুক্ত করা হইয়াছিল, আর তাহাই তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে-সম্পাদন করিয়াছিলেন। তথাপি উপেক্ষিত হওয়ায় গুরুর প্রতি তিনি দোষারোপ করেন নাই, বরং আপনাকেই উপদেশের অযোগ্য পাত্র বিবেচনা করিয়া জীবন বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। অবশেষে এই নিরভিমান সাধকের নিষ্ঠার প্রভাবে বাক্‌শক্তিহীন অগ্নিও তত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ দিতে সমর্থ হইয়াছিল। উপাখ্যান দুইটিতে মনন ও নিদিধ্যাসনের উল্লেখ নাই ; আচার্য্যের তত্ত্বব্যাখ্যাও মুখ্য নহে ; পরন্তু নৈতিক উৎকর্ষ, ভক্তি ও বিষয়বৈরাগ্যকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং তাৎপর্য্য এই—শ্রদ্ধা, তিতিক্ষা, নম্রতা, সরলতা ও ইন্দ্রিয়সংযম পরম জ্ঞান লাভের পক্ষে পর্য্যাপ্ত হয় ; শাস্ত্রানুশীলনের অপেক্ষা থাকে না।

ব্রহ্ম বস্তুতঃ কখনই অপ্রকাশ নহেন। কিন্তু মলিন ও

অস্থির চিত্ত ব্রহ্মাভিমুখ হইলেও তাঁহার সম্বন্ধে অযুক্ত ধারণাই পোষণ করে। ইহাও প্রকৃতপক্ষে অদর্শন। বৃহদারণ্যক দৃপ্ত বালাকির উপাখ্যানে ঈদৃশ অপূর্ণ ও অনিশ্চিত ধারণার উদাহরণ দিয়াছেন(১)। পরন্তু আলোচিত উপাখ্যানদ্বয়ে আমরা দেখিলাম, নির্ম্মল ও শান্ত চিত্তে ব্রহ্ম আপনি প্রতিভাত হন, উপলক্ষ্য নামমাত্র, কারণ তিনি সর্ব্বগত ও জ্যোতির্ম্ময়। আপত্তি হইতে পারে—সূক্ষ্মতম তত্ত্ব উপলব্ধির পক্ষে ধ্যানের উপযোগিতা স্বীকার করি ; কিন্তু নির্ম্মল ও ব্রহ্মাভিমুখ চিত্ত যে বিশেষ প্রচেষ্টা ব্যতীত ব্রহ্মবিৎ হয়, ইহা স্বীকার করা কঠিন, কারণ প্রত্যেক জ্ঞেয় বস্তুই উপযোগী প্রচেষ্টা দ্বারা বিজ্ঞাত হইয়া থাকে ; কেবল জানিবার আগ্রহ যথেষ্ট হয় না। এতাদৃশ সংশয়ের বিরুদ্ধে আমরা একটি বৈজ্ঞানিক তথ্যের উল্লেখ করিব। আধুনিক শারীর বিজ্ঞান প্রতিপন্ন করিয়াছেন, চক্ষুগোলকে অষ্টবিধ দোষ থাকায় কোন বস্তুই যথাযথ দৃষ্টিগোচর হয় না। সুতরাং অধিকৃত দর্শনের জন্য দৃষ্টিশক্তির নিয়ত বা নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার যথেষ্ট নহে ; উক্ত দোষগুলির সমূলে উৎখাত প্রয়োজন। কিন্তু তাহা বর্ত্তমানে অসম্ভব, অথচ অশুদ্ধ ও অশান্ত মনের সংস্কার সাধ্যাতীত নহে। আর সংস্কৃত ও শান্ত মনে ব্রহ্ম বা সর্ব্বগত আত্মা যে যথাযথ প্রতিভাত হইবেন, কোন নির্দ্দেশ অনুসারে তাঁহাকে যে অন্বেষণ করিতে হইবে না, ইহাতে বিস্ময়ের কারণ কি ?

যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন বটে,—জ্ঞানী, শান্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু ও সমাহিত হইয়া অস্মিতা বা অহংভাবে ব্রহ্মকে দর্শন করেন। কিন্তু কর্ম্মত্যাগ বা অকস্মাৎ প্রব্রজ্যা অবলম্বন শান্ত ও দান্ত হইবার একমাত্র বা প্রকৃষ্ট উপায় নহে। ঋষিও

---

(১) বৃহদারণ্যক ২।১।১-১৪

স্বীকার করিয়াছেন যজ্ঞ, দান ও তপস্যা সাধনার অন্তর্গত। উপনিষদে এগুলির বিস্তৃত আলোচনা না থাকিলেও স্থানে স্থানে উল্লেখ আছে। আর এই প্রাসঙ্গিক উল্লেখই যথেষ্ট বলিয়া গ্রহণ করা উচিত; কারণ উপনিষৎ কর্ম্মনিবৃত্ত ভিক্ষুগণের জন্যই প্রধানতঃ অভিপ্রেত। তথাপি জ্ঞানযোগের উপাদেয়ত্ব স্বীকার করিতেই হইবে। শ্রবণ ও মনন কেবল ব্রহ্ম সম্বন্ধে অযুক্ত ধারণা নিরাকৃত করে না, পরন্তু চিত্তের উদ্দাম প্রবৃত্তিগুলিকেও কথঞ্চিৎ প্রশমিত করে। আর ধ্যানের প্রভাবে এই দ্বিবিধ উন্নতিই উপচিত হয়। কিন্তু বৃহদারণ্যক স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন যে কেবল বিদ্যায় রতি বা জ্ঞানানুশীলন পর্য্যাপ্ত নহে, আর ছান্দোগ্যের আখ্যায়িকা দুইটিতে দেখি শ্রদ্ধা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা পর্য্যাপ্ত হইতে পারে। অবশ্য সাধনা সম্বন্ধেই এই উক্তি, কারণ সিদ্ধি বা সাধনার সমাপ্তি জ্ঞানেই হইয়া থাকে। যাহা হউক, আমাদিগের আলোচনার ফলে মনে হয়, মুক্তিলাভের দ্বিবিধ উপায় শ্রুতি অনুমোদন করিয়াছেন; তন্মধ্যে জ্ঞানযোগে নৈতিক উৎকর্ষের অপেক্ষা থাকে আর অন্যটিতে কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার মহিমায় মোক্ষপ্রদ জ্ঞান আপনি উদিত হয়।

ব্রহ্মসাযুজ্যই মুক্তি: স্বর্গলাভ মুক্তি বা অমরত্ব নহে।

কিন্তু এই মোক্ষপ্রদ জ্ঞানের বিষয় কি, আর মোক্ষই বা কিরূপ অবস্থা? শ্বেতাশ্বতরের ভাষায় উত্তরে বলি, মানব যখন স্বীয় ক্ষুদ্র বাহুদ্বয় দ্বারা অসীম আকাশকে বেষ্টন করিবে, তখনই ব্রহ্মবিজ্ঞান ব্যতীত মোক্ষলাভ তাহার পক্ষে সম্ভব হইবে, তৎপূর্ব্বে নহে(১)। বস্তুতঃ এ সম্বন্ধে বিভিন্ন শ্রুতিতে কোন প্রকার মতদ্বৈধ নাই। অতএব ব্রহ্মই মোক্ষপ্রার্থীর জ্ঞেয়: ব্রহ্মকে জানিলে ব্রহ্ম হওয়া যায়, অর্থাৎ জরা, মৃত্যু, পাপ ও

(১) শ্বেতাশ্বতর ৬।২০

দুঃখের সংস্রব থাকে না,—শ্রুতির ইহাই অভিমত। আপত্তি হইতে পারে,—বস্তু বা অবস্থা জ্ঞাত হইলেই আয়ত্ত হয় না, যদিও অধিকারের জন্য জ্ঞান আবশ্যক। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান অপর জ্ঞানের মত নহে; সাধক ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত কিছু নহেন; সুতরাং উপাধিজনিত সঙ্কীর্ণতা বা মোহ অপগত হইলে তিনি ও ব্রহ্ম একীভূত হন। তখন আর কামনা, প্রচেষ্টা, লাভ ও ভোগের অবকাশ থাকে না। নদী যেরূপ বিবিধ দেশ অতিক্রম করিয়া অবশেষে সাগরে স্বীয় নাম ও রূপ বিসর্জ্জন দেয়, কৃতকৃত্য সাধকও তদ্রূপ বিকারী চিত্ত ও সঙ্কীর্ণ জ্ঞান বর্জ্জন পূর্ব্বক পরম পুরুষে অস্তমিত হন। এই ব্রহ্মসাযুজ্যই অমরত্ব, কারণ ব্যক্তিগত প্রত্যয়প্রবাহের অবসান ঘটিলেও আত্মার উচ্ছেদ হয় না। তিনি অবিনাশী আর জীবে জীবে পৃথক্ বোধ হইলেও অবিভক্ত ও অবিভাজ্য, অর্থাৎ বুদ্ধিস্থিত আত্মা ও বিশ্বাধিপে তত্ত্বতঃ ভেদ নাই। কেবল মোহবশতঃ ভেদ কল্পিত হয়, আর সেই মোহনাশেই মুক্তি। তাহা পূর্ণ আনন্দ ও পরা শান্তি।

শঙ্কক হয় ত বলিবেন,—শাস্ত্রে স্বর্গেরও ভূয়সী প্রশংসা আছে; তথায় দুঃখ সুখের দোসর নহে, ঐশ্বর্য্যেরও ইয়ত্তা নাই, আর যজ্ঞ ও দানের প্রভাবে স্বর্গ জয় করা যায়। পক্ষান্তরে ব্রহ্ম দুর্জ্ঞেয়, আর শান্ত ব্রহ্মভাব ও মানবের সুখদুঃখে চিত্রিত অনুভূতি বিসদৃস। সুতরাং স্বর্গের অনাবিল সুখ ও অবাধ ঐশ্বর্য্য কাম্য হইবে না কেন, বিশেষতঃ যখন কঠোর তপস্যা ব্যতীত ব্রহ্মভাব অধিগত হয় না? কিন্তু উপনিষৎ দিব্য ভোগের সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, জীব পুণ্যবলে দেবলোকে উন্নীত হয় বটে, কিন্তু কর্ম্মানুযায়ী ভোগ সাঙ্গ হইলে পুনরায় কর্ম্ম করিবার জন্য তাহাকে মর্ত্ত্যে আসিতে হয়। এতাদৃশ উত্থানপতন কখনই শ্রেয়ঃ নহে,

কারণ দুঃখের পরে সুখ বাঞ্ছনীয় হইলেও সুখের পরে দুঃখ হেয়।

আর এক কথা,—জন্মমৃত্যুর আবর্ত্তন চিরস্থায়ী হইলেও তাহা অমরত্ব নহে। এ তত্ত্বের আভাস আমরা উপনিষদে পাই, কিন্তু পুরাণের বিস্তৃত ও সবিশেষ বিবরণে—ইহা প্রচ্ছন্ন হইয়াছে। কালক্রমে জীব বিবিধ জীবন লাভ করে সত্য, কিন্তু মৃত্যু প্রতিবারে অতীত অনুভূতি আবৃত করায় নব পর্য্যায়ের সূচনা হয়। সুতরাং জন্মজন্মান্তরে জীবের একত্ববোধ অব্যাহত থাকে না। স্মৃতি ও প্রত্যভিজ্ঞা এই অনন্যতাবোধের সহায় বটে, কিন্তু জীব ইহাদিগকে মরণের পরপারে লইয়া যাইতে অক্ষম। অতএব একই জীব যে বহু জন্ম লাভ করিয়াছে এই সত্যের প্রমাণ তাহার অভিজ্ঞতায় নাই। বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়গ্রাম সংস্কার অনুসারে পরিবর্ত্তিত হইয়া বার বার আবির্ভূত হয়, ইহা স্বীকার করি, কারণ কোন শক্তির অত্যন্ত নাশ নাই। কিন্তু এই প্রকার লয়োদয়ে ও অমরত্বে প্রভেদ-বিস্তর, যেহেতু পূর্ব্বাপর অভেদবোধ ব্যতীত জীব স্বীয় অবিনাশিত্ব অঙ্গীকার করিতে পারে না। শাস্ত্রে ও পুরাণে জাতিস্মরের উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু তাহার দৃষ্টান্ত বিরল। বস্তুতঃ নিত্য ও নির্ব্বিকার আত্মাই বিভিন্ন জীবনে যোগ-সূত্ররূপ; সুতরাং তাঁহাতে অবহিত না হইলে, দেহযন্ত্রের সহিত জীবের নাশ প্রত্যক্ষের আকার ধারণ করে।

এই সত্যে ইঙ্গিত করিয়া যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,—আমরা ইহলোকেই আত্মাকে জানিতে পারি, কিন্তু না পারিলে আমাদিগের মহান বিনাশ হয়(১)। কঠোপনিষদে দেখি,—নচিকেতা স্বর্গলাভের উপায়স্বরূপ অগ্নিচয়নে দীক্ষিত হইয়াও

(১) বৃহদারণ্যক ৪।৪।১৪;

মৃত্যুর পরে মানবের অস্তিত্ব থাকে কি না জানিতে চাহিলেন(১), আর তাঁহার সংশয় দূর করিবার জন্য আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশদ উপদেশ দেওয়া হইল। অতএব যুক্ত অনুমান এই,—যজ্ঞাদি পুণ্য কর্ম্ম ও স্বর্গভোগে কারণকার্য্য সম্বন্ধ থাকিলেও ইহলোকে যজ্ঞকর্ত্তা ও পরলোকে ফলভোক্তা যে এক তাহা সুনিশ্চিত নহে, অথচ ঈদৃশ অনন্যতাবোধই অমরত্বের নিকষ, আর ইহার অভাবে প্রকৃত সান্ত্বনা, সন্তোষ বা কৃতার্থতা নাই। গীতার গুরুশিষ্য সংবাদে এ তথ্যটি সুস্পষ্ট হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন,—আমারই মত অতীতে তোমার বহু জন্ম হইয়াছিল, কিন্তু সে প্রাচীন কথা আমার স্মরণ আছে, অথচ তুমি বিস্মৃত হইয়াছ(২)। শ্রীকৃষ্ণ শুদ্ধ আত্মভাবে অবস্থিত; সুতরাং বার বার মরণের সম্মুখীন হইলেও তাঁহার অনন্যতাবোধ কখন বিচ্ছিন্ন হয় নাই। কিন্তু অর্জ্জুন স্বর্গলাভ বা প্রত্যাবর্ত্তন কিছুই স্মরণ করিতে পারেন না। ইহজীবনই তাঁহার সর্ব্বস্ব; পরলোক জনশ্রুতি মাত্র; সুতরাং অমৃতত্বের আস্বাদ তাঁহার অভিজ্ঞতায় নাই। তাৎপর্য্য এই,—জীবের অন্তরতম সত্তা অজর ও অমর বটে, কিন্তু তাহা অপ্রত্যক্ষ থাকিতে জীবের অমৃতত্ব প্রকট বা বাস্তব হয় না।

কামনা থাকিতে মুক্তি নাই অথচ ভোগের কামনাই স্বর্গের পথে প্রবর্ত্তক।

স্বর্গলাভ ও মোক্ষ যে এক নহে, এমন কি, তাহাদের সাধনা যে পরস্পরবিরুদ্ধ—এই তত্ত্ব যাজ্ঞবল্ক্যের উপদেশে পরিস্ফুট হইয়াছে। তাহার মর্ম্ম সংক্ষেপে দিতেছি। কামনা অনুসারে অধ্যবসায় হয়, অধ্যবসায় করণবর্গের সহযোগে কর্ম্মের আকার ধারণ করে, আর কর্ম্ম সুযোগমত ইহ বা পরলোকে ফলদানের জন্য প্রস্তুত থাকে। সুতরাং জরা বা ব্যাধির উপদ্রবে ভোগায়তন দেহ অব্যবহার্য্য হইলে মানব

(১) কঠোপনিষৎ ১।১।২০ (২) গীতা ৪।৫।

কর্ম্মানুযায়ী উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট দেহান্তরগ্রহণ করে। পুণ্যাত্মা এইরূপে দেবলোকে উন্নীত হন। উর্দ্ধগতির এই পথ পুরাতন ও বিস্তৃত, আর কামনা এই পথে প্রবর্ত্তক। বস্তুতঃ কামনার প্রভাবে প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গ্রাম জন্মজন্মান্তরে জীবের সহগামী হয়, আর পুণ্য ও পাপ তাহার অনুগমন করে। কিন্তু হৃদয়ে আত্মা বা সর্ব্বময় ব্রহ্মকে নিয়ত প্রত্যক্ষ করিলে কামনার আর অবসর থাকে না। মানবের অন্তরতম সত্তা প্রকৃতপক্ষে আনন্দময় আত্মা বা ব্রহ্ম, যদিও প্রাণাদি উপাধিযোগে তাহার হৃদয়ে সচরাচর কামনার উন্মেষ হয়, আর এই কামনা জন্ম-মৃত্যুরূপ অনর্থ সৃষ্টি করে। সুতরাং জ্ঞানের মহিমায় কামনা দূরীভূত হইলে উপাধি থাকিতেও সাধক মুক্ত বা ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন। ইহা তাঁহার শোকাতীত অভয় রূপ। তথাপি যত দিন তিনি দেহপিঞ্জরে বাস করেন, তত দিন নিরাধার ব্রহ্মে ও তাঁহাতে কিছু প্রভেদ থাকে। কিন্তু সর্পের নির্ম্মোকের মত দেহ যথাকালে পরিত্যক্ত হইলে, কামনার অভাবে প্রাণাদি উপাধির উৎক্রমণ অসম্ভব হয়। অতএব তিনি ব্রহ্মে লীন হন, অর্থাৎ তাঁহার ব্যক্তিগত পার্থক্য থাকে না। ইহাই তাঁহার অজর, অমর, পরম ভাব, আর বিদেহমুক্তি নামে ইহা প্রখ্যাত(১)।

কিন্তু ব্যক্তিত্বের অবসান কি বাঞ্ছনীয়, তাহার অবসানে কিছু থাকে কি? এতাদৃশ সংশয় নিরসনার্থ বলি, ব্যক্তিত্বের প্রত্যেক লক্ষণে অভাব বা সঙ্কীর্ণতা নিহিত। আমি মানব, সুতরাং দেব বা গন্ধর্ব্ব নহি; আমি কয়েকটি বিষয়ে অভিজ্ঞ ও কোন কোন কর্ম্মে নিপুণ, অর্থাৎ অন্য বিষয় আমার অধিগত নহে, অন্য কর্ম্মে আমার দক্ষতা নাই। এই প্রকার বেষ্টনের

ব্যক্তিত্বের নাশ সর্ব্বনাশ নহে।

(১) বৃহদারণ্যক ৪।৪।৫-৭;

পর বেষ্টন দ্বারা ব্যক্তিত্ব বা বৈশিষ্ট্য রচিত, আর বেষ্টন কখন প্রীতিকর নহে। বিশেষতঃ বেষ্টনের রচনায় দেশ, কাল ও নিমিত্তের প্রভাব সুস্পষ্ট। অতএব ব্যক্তিত্ব থাকিতে আমি স্বতন্ত্র নহি, আর পারতন্ত্র্যে অবিমিশ্র সুখ কোথায়? স্থিতি বা শান্তির সম্ভাবনাও নাই, যেহেতু ব্যক্তিত্বের কারণভূত অবস্থার নিত্য পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। সংক্ষেপে বলা যায়, আত্মপর ভেদে, বাহ্যান্তর বিভাগে ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত, আর অনাত্মলোকে ইহার অবস্থান, অর্থাৎ অনাত্মবোধ ইহার সীমা-বন্ধন; কিন্তু এই অবরোধক অনাত্মবোধ থাকিতে অসন্তোষ ও পরিণাম অপরিহার্য্য। তথাপি বহুর মধ্যে আত্মখ্যাপনে আমরা এতই অভ্যস্ত, বিবিধ সম্বন্ধের সংস্কার এমনই আমা-দিগের মজ্জাগত যে ব্যক্তিত্ব সঙ্কীর্ণতার নামান্তর হইলেও তাহার নাশে সর্ব্বনাশ কল্পনা করি। দেহপাতের 'পরে সংজ্ঞা থাকে না অর্থাৎ নাম ও রূপের লয় হয়—এই উপদেশে মৈত্রেয়ী উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাকে আশ্বস্ত করিবার জন্য বলা হইয়াছিল, বৈশিষ্ট্যের অভাবেও বিজ্ঞান অব্যাহত থাকে, আর অমরত্বে প্রতিষ্ঠার জন্য তাহাই পর্য্যাপ্ত(১)।

সাযুজ্যই প্রকৃষ্ট মিলন

এই তথাকথিত লয়বাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায় যে অভিমত প্রচার করেন, তাহার সপক্ষে যুক্তি নিম্নে দিতেছি। তাঁহারা বলেন,—জীব ও ব্রহ্মের সম্বন্ধে আমরা মিলনেরই পূর্ব্বাভাষ পাই, নিমজ্জনের নহে, আর জীবের কথঞ্চিৎ পার্থক্য ব্যতীত এই মিলন ও জড় পদার্থের সংমিশ্রণে কোন প্রভেদ থাকে না; বিশেষতঃ সামীপ্যের অনুভব ও তজ্জনিত সুখ মিলনের প্রাণ, অথচ জীবের নামরূপ বিলুপ্ত হইলে এতাদৃশ

(১) বৃহদারণ্যক ২।৪।১৩;

অনুভব অসম্ভব হয়; বস্তুতঃ ভক্ত সাধকের চরম লক্ষ্য আত্ম-বিস্মৃতি নহে, পরন্তু ভজনীয়কে চিরদিন শ্রদ্ধা ও অনুরাগ নিবেদন। ইহা উন্নত ভাব সন্দেহ নাই, আর শ্রুতিতেও কোন কোন স্থলে ইহার পরিচয় আছে। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য প্রমুখ অদ্বৈতবাদী ঋষিগণের চিন্তাধারা ও অনুভূতি অন্যরূপ। যিনি অন্তরতম, শুদ্ধ, নিত্য ও নির্ব্বিকার, যাঁহার আশ্রয়ে বস্তু ও ব্যক্তি প্রকট হয়, সেই চিন্ময় পদার্থই ত প্রকৃত সত্তা, আর সকলই তাঁহার আংশিক প্রকাশ ও অনিত্য। সুতরাং ধীমান তাঁহাকেই বরণ করেন, কিন্তু ব্যক্তিত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিতে তাঁহার সহিত নিরন্তরাল মিলন অসম্ভব, অথচ এবংবিধ মিলন বা একীভাব আত্মবিস্মৃতি নহে, পরন্তু আত্মভাবের পূর্ণ বিকাশ। শ্বেতাশ্বতর বলিয়াছেন, জীব আপনাকে ও নিয়ন্তাকে পৃথক্ কল্পনা করিয়া বৃহৎ সংসারচক্রে আবর্ত্তিত হয়। অতএব ব্যক্তিত্ব কেবল অকিঞ্চিৎকর নহে, ইহা মহান অনর্থের মূল। ইহার বর্জ্জনে কিংবা কামনার মত আবর্জ্জনার অপসারণে কোন শোচনীয় অপচয়ের আশঙ্কা নাই।

নিরবচ্ছিন্ন আত্মপ্রত্যয়ের প্রবাহ ও আত্ম-ভাবে অবস্থান এক নহে।

কোন কোন মনীষী বলেন,—যে আত্মভাবে অবস্থানের জন্য অদ্বৈতবাদী সর্ব্বস্ব পণ করেন, বৈচিত্র্যময় বিশ্বের সহিত তাহার সম্বন্ধ নাই, কল্যাণকর কর্ম্মে তাহার প্রেরণা নাই, তাহা নির্বিষয় চৈতন্য বা একাকার অনুভূতি মাত্র। এ অপবাদ ন্যায্য নহে। আত্মাকে উপলব্ধি করা যে জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য, অমৃতত্ব লাভের একমাত্র উপায়, তাহা যাজ্ঞবল্ক্য বার বার বলিয়াছেন বটে, কিন্তু আত্মা কি তাহাও তিনি বিবৃত করিয়াছেন। সুতরাং আত্মভাব সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা নির্ণয় করিবার জন্য সমগ্র বর্ণনাই গ্রহণ করা সঙ্গত, অথচ উক্ত সমালোচকগণ কোন কোন অংশ অগ্রাহ্য করিয়াছেন কিংবা

সেই সকল অংশে গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। উপেক্ষিত অংশের একটি উদাহরণ দিতেছি। ঋষি বলিয়াছেন, আত্মা বিশ্ব ও বিশ্ববাসীর আশ্রয় ও নিয়ন্তা আর নিখিল বিষয় ও বিষয়ীতে তিনি ওতপ্রোতরূপে আছে বলিয়া তাহারা সম্বদ্ধ(১)। এই নির্দ্দেশ সামান্য নহে; বস্তুতঃ মুমুক্ষুগণও ইহার সমুচিত আদর করেন, যেহেতু গহন শরীরে এই আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিলে স্রষ্টৃত্ব ও অধিষ্ঠাতৃত্ব আয়ত্ত হয়। উপরত হইয়া আত্মার ধ্যান করা উচিত, ইহাও ঋষির উপদেশ বটে; কিন্তু তাহার যৌক্তিকতা ও স্পষ্ট। আত্মার অশেষ মহিমায় সমাহিত হওয়া সম্ভব নহে, পরন্তু তাঁহার শান্ত, নির্লিপ্ত ভাব ধ্যানের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

তথাপি বলা হয়, ঋষির মতে সর্ব্বময়ত্ব ও সর্ব্বাধিষ্ঠাতৃত্ব মুক্তি নহে, মুক্তির পথে সর্ব্বোচ্চ সোপান মাত্র; নির্ব্বিশেষ ভাব বা শুদ্ধ চৈতন্যই চরম লক্ষ্য। আর এই অভিমতের সপক্ষে তাঁহার একটি প্রসিদ্ধ উক্তির উল্লেখ করা হয়। তাহা এইরূপ,—আত্মা নানাত্ববর্জ্জিত, তাঁহাতে নানাত্ব কল্পনা করিলে মৃত্যুর কবল হইতে নিষ্কৃতি নাই; সুতরাং তাঁহাকে একধা দর্শন করাই বিধি(২)। কিন্তু স্বরূপে একত্ব ও প্রকাশে নানাত্ব, ঋষি উভয়ই স্বীকার করিয়াছেন, আর আত্মার স্বরূপ ও প্রকাশে সম্বন্ধ যে ঘনিষ্ঠ তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। জীবের স্বভাবে ও আচরণে দেশ, কাল ও নিমিত্ত মধ্যবর্ত্তী হয়, কিন্তু অদ্বয় ব্রহ্মের অভিব্যক্তিতে মধ্যবর্ত্তিতার অবকাশ নাই, কোন বিশেষিত উদ্দেশ্যও তাঁহাতে আরোপ করা যায় না। বস্তুতঃ তাঁহার প্রকাশ কখন প্রচ্যুতি নহে, তাহা স্বভাবসিদ্ধ স্ফুরণের মত। অতএব প্রকাশ হেয়বোধে বর্জ্জন করিয়া মুমুক্ষু

(১) বৃহদারণ্যক ৪।৪।২২; (২) বৃহদারণ্যক ৪।৪।১৯,২০

কেবল স্বরূপে স্থিতির জন্য ব্যগ্র হইবেন কেন? এ বিশ্বই বা তাঁহার পক্ষে তিরোহিত হইবে কিরূপে? ইহা ত প্রবাহরূপে নিত্য ও ব্রহ্মেই প্রতিষ্ঠিত।

মুক্তির সবিশেষ বর্ণনা শ্রুতিতে নাই; কিন্তু মুক্তির পথে যে উদারতা, শান্তি ও নিত্যত্বের আভাস পাওয়া যায় তাহা স্বর্গ-সুখ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

প্রশ্ন হইতে পারে,—বিশ্ব কি তাঁহার বিষয়রূপে বর্ত্তমান থাকিবে? বিষয়বোধে দ্বৈতভাব অনুস্যূত, বিষয়ের সঙ্কীর্ণতাও বিষয়ীকে সীমাবদ্ধ করে, আর বিষয়ের পর বিষয়গ্রহণে বিক্ষেপ অনিবার্য্য; পক্ষান্তরে মুমুক্ষু নিরবচ্ছিন্ন শান্তির প্রয়াসী; দ্বৈত-বোধ, পরিচ্ছেদ আর পরিণামের ছায়াও তাঁহার পক্ষে অসহ্য নহে কি? অতএব উত্তরে বলি,—যাজ্ঞবল্ক্যের মতে স্বর্গাদি-লোক কৃতকৃত্য সাধকের হয় আর তিনিই এই সকল লোক হন(১)। জ্ঞেয় ও জ্ঞাতায় ভেদ যে ব্যবহারে সর্ব্বদা বর্ত্তমান তাহা স্বীকার করি। কিন্তু ব্যবহারের অতীত অবস্থায় এই পার্থক্যের অভাবে জ্ঞানভাণ্ডার যে আত্মপ্রত্যয়ে সঙ্কুচিত হয়, শ্রুতি তাহা অঙ্গীকার করেন নাই। মৈত্রেয়ীকে বলা হইয়াছিল, আত্মাকে জানিলে সকলই জানা যায় কারণ যাহা কিছু আছে সমুদায় আত্মার অন্তর্গত, অথচ তিনিই প্রকৃত জ্ঞাতা(২)। সুতরাং বিষয় ও বিষয়ীতে ভেদ অনিত্য ও আপেক্ষিক; মুক্তিতে তাহা থাকে না,—ইহাই ঋষির অভিমত; বিষয়ের বিলোপে একত্বের প্রতিষ্ঠা হয়, ইহা তাঁহার উপদেশ নহে। তিনি বলিয়াছেন বটে,—যতদিন ভেদবোধ থাকে ততদিনই আপনার অতিরিক্তরূপে বিষয়কে দর্শন, স্পর্শনাদি সম্ভব হয়। কিন্তু ইহাও বলা হইয়াছে যে আত্মবিজ্ঞান ব্যতীত তাবৎ বস্তু, ব্যক্তি ও জাতির জ্ঞান অনিশ্চিত ও অস্থায়ী হয়, কারণ সর্ব্ববিধ জ্ঞান এই বিজ্ঞানের অন্তর্গত।

ঈদৃশ বিজ্ঞান কিরূপ তাহা আমরা জানি না, কল্পনাও

(১) বৃহদারণ্যক ৪।৪।১৩; (২) বৃহদারণ্যক ৪।৫।৬,৭,১৫

করিতে পারি না। আর শ্রুতিতে ইহার বর্ণনা বিশদ ও বিস্তৃত নহে। বস্তুতঃ তাহা পর্য্যটকের ভ্রমণবৃত্তান্তের মত সুস্পষ্ট ও সবিশেষ হইলে বিস্ময়ের কারণ হইত। ব্রহ্মের পরিচয়ে শ্রুতি ভাষার দারিদ্র্য ও মনের দৌর্ব্বল্য মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিয়াছেন, সুতরাং মুক্তি বা ব্রহ্মপ্রাপ্তির বিবরণে শ্রুতি যে মুখর হন নাই, তাহা বিচিত্র নহে। কিন্তু শঙ্কা হইতে পারে, এই অজ্ঞাত ও অনির্দ্দেশ্য ভাবের জন্য আগ্রহ হইবে কেন? অতএব মুক্তির পূর্ব্ব অবস্থা লক্ষ্য করিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন,—তত্ত্বদর্শী সকলই দর্শন বা লাভ করেন, অথচ দুঃখ, রোগ ও মৃত্যু তাঁহাকে বিপন্ন করে না, কারণ চিত্ত শুদ্ধ হওয়ায় তাঁহার আত্মস্মৃতি কখন আচ্ছন্ন হয় না, আর সেই অবিপ্লবা আত্মস্মৃতির মহিমায় সর্ব্ববিধ বন্ধন ও মলিনতা অপনীত হয়(১)। এই উন্নত অবস্থাও আমাদিগের অপরিজ্ঞাত; কিন্তু সাধনার ফলে ইহার অভিমুখে সামান্য অগ্রসর হইলেও ইহার উপাদেয়ত্ব উপলব্ধি করা যায়।

ভূমিকার প্রয়োজন মত উপনিষদের পরিচয় দিলাম। তত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রুতির উপদেশ গীতায় সমাহৃত হইয়াছে ও সংগ্রহে প্রকৃত মর্ম্ম বিকৃত বা আবৃত হয় নাই, এখন ইহাই প্রতিপাদ্য। ত্রয়োদশ অধ্যায়ের কয়েকটি শ্লোকে ব্রহ্মের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আমরা পাই, আর তাহার ভাব ও ভাষা উভয়ই শ্রুতির। তাৎপর্য্য নিম্নে কিছু সবিস্তারে দেওয়া হইল।

গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ব্রহ্মের বর্ণনা ভাব ও ভাষায় শ্রুতির অনুগামী।

ব্রহ্মকে জানিতে হইবে, যেহেতু তাঁহাকে জানিলে মরণের আশঙ্কা থাকে না। তিনি মূল কারণ, অতএব অনাদি। কিন্তু চক্ষুশ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয় তিনি নহেন; অনুমানও তাঁহার প্রকৃষ্ট পরিচয় দিতে অক্ষম। তথাপি তাঁহাকে

(১) ছান্দোগ্য ৭।২৬।২

অবস্তু বলা যায় না, কারণ যাবতীয় শির, কর, পদ, কর্ণ, নয়ন ও আনন তাঁহারই। তাঁহাকে ইন্দ্রিয়যুক্ত বলিলে অযোগ্যভাষণ হয় এইরূপ আপত্তি হইতে পারে, যেহেতু ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান সঙ্কীর্ণ ও লয়োদয়শীল। কিন্তু ইন্দ্রিয় তাঁহার অবলম্বন নহে; বরং নিত্য ও পরিণামবর্জ্জিত চৈতন্যরূপে তিনি ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলিকে প্রকট বা চেতনাযুক্ত করেন। জীব ও ব্রহ্মে এই মহান প্রভেদ যে তিনি নির্লিপ্ত হইয়াও সর্ব্বব্যবহারাস্পদ। বিষয়জ্ঞান, বিষয়ে প্রবৃত্তি ও প্রবৃত্তির অন্তে অবসাদ, এই তিন প্রকার ব্যবহার প্রসিদ্ধ, আর সুখ, দুঃখ, ও মোহ ইহাদিগের অপরিহার্য্য লক্ষণ। কিন্তু ব্রহ্মের স্বরূপে বা চৈতন্যমাত্রে সুখ দুঃখ বা মোহ নাই অথচ চৈতন্য ব্যতীত ভোগ অসম্ভব। নদীবক্ষে তরঙ্গমালা আকারে ও অবস্থানে বিবিধ হইলেও প্রত্যেক ঊর্ম্মির অন্তরে ও বাহিরে যেরূপ কেবল জলই বিদ্যমান তদ্রূপ সংখ্যাতীত বৈচিত্র্য সত্ত্বেও তাবৎ ভোগের ব্রহ্মই একমাত্র কারণ বা উপদান। আর ভোগ্য সম্বন্ধে ও অনুরূপ ধারণাই সমীচীন, যেহেতু রূপরসাদি ভোগ্য সুখদুঃখাদি ভোগের মতই কোন অবস্থায় চৈতন্যকে অতিক্রম করে না, অর্থাৎ জীবে ও জীবলোকে ব্রহ্মই ওতপ্রোত ভাবে আছেন(১)।

তিনি সর্ব্বত্র সমভাবে বর্ত্তমান অথচ প্রত্যক্ষযোগ্য নহেন, ইহা প্রহেলিকার মত বোধ হয় বটে; কিন্তু তাঁহার প্রকাশ বিশ্বব্যাপী হইলেও স্বরূপে তিনি সূক্ষ্মতম অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ও চিত্তের অগোচর। কারণের সন্ধানে আমরা স্থূল হইতে সূক্ষ্মের দিকে অগ্রসর হই, আর বিবিধ কার্য্য হইতে কারণকে পৃথক্‌রূপে পাইলে এই অন্বেষণ সার্থক হয়। যথা, কঙ্কন

(১) গীতা ১৩।১২-১৫

কুণ্ডলাদি হইতে বিযুক্তভাবে স্বর্ণপিণ্ড দেখিয়াছি বলিয়া সুবর্ণকে অলঙ্কারের কারণরূপে স্থির করি। কিন্তু যিনি সর্ব্ববিধ অনুভবের কারণ তাঁহাকে অসম্বন্ধভাবে অনুভব করিব কিরূপে? বস্তুতঃ উপাধি অপনীত করিয়া তাঁহাকে বিষয়রূপে উপলব্ধি করা অসম্ভব। তত্ত্বজ্ঞ কিন্তু স্বীয় মার্জ্জিত বুদ্ধিতে তাঁহার অধিষ্ঠান উপলব্ধি করেন, যদিও অন্যের পক্ষে তিনি অবিজ্ঞেয়(১)।

আর এক আপত্তিঃ—ব্যক্তিভেদে জ্ঞান, সঙ্কল্প, চেষ্টা ও ভোগ ভিন্ন, আর প্রত্যেকের আত্মবোধ তাহার নিজস্ব বলিয়া প্রতীত হয়; এতাদৃশ বৈলক্ষণ্য ও বিচ্ছেদ থাকিতে চৈতন্য এক ও অদ্বয় বলিব কেন? ইহার উত্তরঃ—দেহেন্দ্রিয়াদি ভেদে অনুভূতি বিচিত্র ও বিযুক্ত হয়, আর দেহাত্মবোধ দুর্নিবার; সুতরাং চৈতন্য এক ও অখণ্ড হইলেও বহু ও বহুবিধ বলিয়া প্রতীত হন। বস্তুতঃ অদ্বয় ও নিষ্কল চৈতন্যেই জীবনিবহ উদ্ভূত হয়, তাঁহার আশ্রয়ে ব্যবহারভূমিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করে ও যথাকালে তাঁহাতেই বিলীন হয়। অতএব প্রত্যক্ষ সংসারের তিনিই অপ্রত্যক্ষ কারণ(২)।

প্রকাশক বলিয়া জ্যোতিষ্কদিগের সহিত ব্রহ্মের কখন কখন তুলনা করা হয় বটে; কিন্তু চৈতন্যের অভাবে আলোক ও অন্ধকারে প্রভেদ নাই, সুতরাং জ্যোতিষ্কগুলি পরপ্রকাশ্য, আর চৈতন্য স্বপ্রকাশ অর্থাৎ অন্ধকার বা অজ্ঞান তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। অতএব চূড়ান্ত মীমাংসা এইঃ—ব্রহ্ম স্বরূপে ও প্রকাশে জ্ঞান ব্যতীত অন্য কিছু নহেন; জ্ঞেয়ও তিনি, কারণ তাঁহাকে জানিলে সকলই জানা হয় আর মোক্ষপ্রাপ্তির পক্ষে কোন অন্তরায় থাকে না; কিন্তু চিত্ত মলিন

(১) গীতা ১৩।১৫; (২) গীতা ১৩।১৬

বিক্ষুব্ধ থাকিতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সম্ভাবনা নাই; পক্ষান্তরে ়ানাখ্য কয়েকটি নৈতিক ও আধ্যাত্মিক গুণের প্রভাবে চিত্ত বিশুদ্ধ ও স্থির হইলে ব্রহ্ম প্রত্যগাত্মারূপে স্বতঃ তাঁহাতে ়তিভাত হন অথবা চিত্ত যথাসম্ভব ব্রহ্মভাব ধারণ করে(১)।

গীতায় 'ব্রহ্ম' ও 'আত্মা' একই তত্ত্বের নাম হইলেও শব্দ দুইটিতে নির্দেশ তাঁহার দ্বিবিধ ভাবের প্রতি।

ব্রহ্ম ও আত্মা শ্রুতিতে পরম তত্ত্বের প্রসিদ্ধ নাম। কিন্তু আলোচ্য বিষয়ের অনুরোধে এই শব্দ দুইটি শ্রুতি ও গীতায় কখন কখন সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। জনককে শৈলিনি প্রভৃতি আচার্য্যগণ ব্রহ্মবিষয়ে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাতে এইরূপ প্রয়োগের উদাহরণ আমরা পাই। ব্রহ্মকে বাক্, প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র, মন ও হৃদয়রূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছিল, আর যাজ্ঞবল্ক্য ইহাদিগের আয়তন ও প্রতিষ্ঠার উল্লেখ করিয়া নির্দ্দেশের অপূর্ণতা যথাসম্ভব দূর করিয়াছিলেন(২)। গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগই লক্ষ্য; সুতরাং তত্ত্ব এক ও অভিন্ন হইলেও তাঁহাকে যেন দ্বিধা খণ্ডিত করা হইয়াছে। ব্রহ্মের বর্ণনায় দৃষ্টি বহির্দ্দেশে; তথায় বস্তুনিচয় বিবিধ ও বিযুক্ত হইলেও ব্রহ্মেই তাহাদিগের স্থিতি ও বিকাশ(৩)। কিন্তু অন্তর্জগতে তিনি সুখ, দুঃখ ও মোহের অতীত চৈতন্যমাত্র, আকাশের মত তাঁহার নির্লেপ আর রবির মত তাঁহার অবাধ প্রকাশ। সুতরাং এই প্রসঙ্গে আত্মাই তাঁহার সার্থক নাম(৪)।

এখন আপত্তি হইতে পারে:—বাচক ও বর্ণনার প্রভেদে বাচ্যের পার্থক্য সূচিত হয়; ব্রহ্মের নির্বচনে দ্রষ্টার উল্লেখ নাই আর আত্মার নির্দ্দেশে দৃশ্য পরিহৃত হইয়াছে; সুতরাং আত্মা ও ব্রহ্ম যে গীতায় সমনাম

(১) গীতা ১৩।১৬;
(২) বৃহদারণ্যক ৪।১।২-৭;
(৩) গীতা ১৩।৩০;
(৪) গীতা ১৩।৩২,৩৩

তাহা অঙ্গীকার করিব কেন? বরং ব্রহ্মে দৃশ্যজাতের কারণ ও আত্মায় দৃষ্টির হেতুভূত সত্তা লক্ষিত হইয়াছে, আর এইরূপে শাস্ত্র বিশ্বপ্রকাশের উপাদান ও নিমিত্ত নির্ণয় করিয়াছেন,—ইহাই সঙ্গত অনুমান। ঈদৃশ আপত্তিতে আমরা দ্বৈতবাদের মূলসূত্র পাই বটে; কিন্তু উপনিষদে অদ্বৈতবাদই প্রধানতঃ উপদিষ্ট হইয়াছে, আর গীতার আদ্যোপান্ত সাবধানে পরীক্ষা করিলে অনুরূপ উপদেশই আমরা পাই। অর্জ্জুন বিশ্বরূপ দর্শনের পরে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, ব্রহ্ম বেত্তা ও বেদ্য উভয়ই, সুতরাং চেতন ও অচেতনের চরম আশ্রয়(১)। বস্তুতঃ অমেয় তত্ত্বের কথা দূরে থাকুক, সুবিজ্ঞাত বিষয়েরও আমরা প্রকরণ অনুসারে বিভিন্ন নাম ও পরিচয় দিয়া থাকি। শরীরবিজ্ঞানে ও মনস্তত্ত্বে মানবের বর্ণনা একরূপ নহে; তথাপি বর্ণিত বিষয়ে বস্তুগত ভেদ অনুমিত হয় না।

কেহ কেহ বলেন,—শ্রুতি জীব ও ব্রহ্মে অভেদ প্রচার করিয়াছেন, অথচ গীতায় জীবের দুঃখভোগ ও পারতন্ত্র্য মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় ঘোষিত হইয়াছে। সুতরাং শ্রুতি ও গীতায় বিরোধ সুস্পষ্ট। কিন্তু মানব যে বিত্তময় পথে বিচরণ করিয়া পদে পদে লাঞ্ছিত হয় ও মৃত্যুকে বার বার বরণ করে,—এই সত্যের অপলাপ উপনিষৎ করেন নাই(২); তাহার অন্তরতম সত্তা যে ব্রহ্ম এই প্রবোধই দিয়াছেন। আর গীতায় আমরা অনুরূপ উপদেশই পাই। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে, জীব দেহযুক্ত হওয়ায় সুখ দুঃখ ও মোহ অনুভব করে আর ইহাদিগকে অবাস্তর বা উপসর্গ বোধে প্রত্যাখ্যান না করায় সে কামনার আবেষ্টনে আবদ্ধ থাকে।

(১) গীতা ১১।৩৮; (২) কঠোপনিষৎ ১.২।৩;

কিন্তু তাহার দেহ নশ্বর হইলেও নিত্য সত্তা হইতে বিযুক্ত নহে, আর এই নিত্য সত্তায় অবহিত হইলে সুখদুঃখ হেয় বোধ হয়, কারণ ইনি উপদ্রষ্টা অর্থাৎ যাবতীয় ব্যাপারের নির্লিপ্ত সাক্ষী। করণবর্গ স্বভাব অনুসারে স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত হয়; তাদৃশ ক্রিয়ার ইনি প্রবর্ত্তক বা নিবারক হন না, কেবল স্বীয় সাক্ষিত্বের প্রভাবে প্রকাশক হন; সুতরাং শব্দের প্রচলিত অর্থ অনুসারে ইনি কর্ত্তা নহেন, অনুমন্তা মাত্র। তথাপি ইনি ভর্ত্তা, কারণ বিশেষিত বোধ নির্ব্বিশেষ আত্মচৈতন্যেই উদ্ভূত হয়। ভোক্তাও ইনি যেহেতু কেবল ভোগ্য বস্তু দ্বারা ভোগ নিষ্পন্ন হয় না আর সুখদুঃখে চিত্রিত জীবন ভোগ্য বা জ্ঞেয় মধ্যেই গণ্য। বস্তুতঃ ইনিই সুখদুঃখের অধীন না হইয়া সুখদুঃখকে বাস্তব করেন; সুতরাং পরম পুরুষ ইঁহার সার্থক নাম(১)। সাধারণ ভোক্তৃত্বে ও এই পরম ভাবে প্রভেদ বিস্তর, আর শ্রুতিও ইহা নির্দ্দেশ করিবার জন্য ছায়া ও আতপের উপমা দিয়াছেন ও সংসার বৃক্ষে দুইটি বিসদৃশস্বভাব পক্ষীর কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু নিকৃষ্ট ভাবের প্রাবল্যেই জীবের বৈশিষ্ট্য যদিও উপযুক্ত সাধনার ফলে জীব ব্রহ্মভাব লাভ করিতে সক্ষম হয়।

গীতায় ব্রহ্মভাবের বর্ণনা।

গীতা ব্রহ্মবিচারে স্বল্পভাষী আর শব্দে ও অর্থে শ্রুতির অনুগামী হইলেও ব্রহ্মভাবের বিশদ ও বিস্তৃত বর্ণনা দিয়াছেন আর প্রসঙ্গক্রমে বিষয়টির বার বার উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাই সঙ্গত, কারণ যিনি বাক্য ও মনের অগোচর, তাঁহার সম্বন্ধে বহু বাক্য ব্যবহার বাগিন্দ্রিয়ের শ্রমমাত্র হইলেও যে ভাব লাভ করিবার জন্য প্রত্যেক

(১) গীতা ১৩।২১-২৩

সাধকই প্রয়াসী, উপদেষ্টার নিকট তাহার সবিশেষ বিবরণ প্রার্থনীয়। গীতায় এই প্রার্থনা চিত্তাকর্ষক ভাষায় পূর্ণ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণনির্দ্দেশে, পঞ্চম অধ্যায়ে সংসারজয়ের বর্ণনায়, ষষ্ঠ অধ্যায়ে যোগারূঢ়ের সমতা কীর্ত্তনে, দ্বাদশ অধ্যায়ে ভক্তিপ্রণোদিত নিষ্কাম কর্ম্মের বিশ্লেষণে, চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে গুণাতীতের প্রশংসায় আর অষ্টাদশ অধ্যায়ে জ্ঞানযোগের মহিমা খ্যাপনে আমরা ব্রহ্মভাবের ব্যাখ্যা পাই। নিম্নে তাহার মর্ম্ম সংক্ষেপে দেওয়া হইল।

চারিদিক্ হইতে নদনদীর জল সাগরে প্রবেশ করিলেও সাগর যেরূপ বেলাভূমি অতিক্রম করে না, তদ্রূপ ইন্দ্রিয় প্রণালীমুখে নানাবিধ ভোগ্যবস্তুর সন্ধান আসিলেও, আত্ম-জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত সাধকের চিত্ত কখন বিচলিত হয় না(১)। সুতরাং কামনা সর্ব্বতোভাবে পরিহারপূর্ব্বক তিনি কালক্ষেপ করেন, আর ইন্দ্রিয়গ্রামে আত্মবুদ্ধি, বিষয়ে মমতা ও কর্ম্মফলে স্পৃহা না থাকায়, ব্যবহারের জটিলতা ও বৈচিত্র্য সত্ত্বেও তিনি অনাবিল শান্তির অধিকারী হন(২)। ইহাই ব্রহ্মভাবে স্থিতি আর এ অবস্থান অবিচ্ছিন্ন হইলে অবশেষে ব্রহ্মে নির্ব্বাণলাভ হয় (৩)। উচ্চ ও নীচ, উপাদেয় ও হেয়, সকলই ব্রহ্মে বা আত্মচৈতন্যের আশ্রয়ে ব্যক্ত বা বাস্তব হয়; ব্রহ্ম কিন্তু তাহাদিগের গুণদোষের ভাগী হন না। তাঁহার এই সাম্য উপলব্ধি করিয়া যে সাধক প্রিয়লাভে উৎফুল্ল বা অপ্রিয় প্রাপ্তিতে ব্যাকুল হন না, তাঁহার ব্রহ্মে স্থিতি সিদ্ধ হয়(৪)। সুখদুঃখ তাঁহার পক্ষে সমান; সুবর্ণ ও মৃত্তিকা তুল্যমূল্য; নিন্দা ও প্রশংসা, মান ও অপমান, তিনি সমভাবে গ্রহণ

(১) গীতা ২।৭০; (২) গীতা ২।৭১;
(৩) গীতা ২।৭২ (৪) গীতা ৫।১৮-২০

করেন ; এমন কি, মিত্রের প্রতি অনুরাগ ও শত্রুর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেন না(১)। কেনই বা করিবেন? সাংসারিক উন্নতির জন্য তাঁহার কোন প্রকার আগ্রহ নাই। তিনি কামনাহীন, সুতরাং সতত প্রসন্ন ও সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন।

ব্রহ্মভাব লাভের জন্য কামনাই বর্জ্জনীয়, কর্ম্ম নহে—এবিষয়ে গীতা ও শ্রুতি একমত।

ইহলোকে ব্রহ্মভাব এই প্রকার। সুতরাং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ ও তজ্জনিত অবিচ্ছিন্ন শান্তিই মর্ত্ত্যে ব্রহ্মভাবের প্রকৃষ্ট লক্ষণ। কিন্তু শান্তিকামী সচরাচর কর্ম্মের অবসানে সিদ্ধি অন্বেষণ করেন, কারণ কর্ম্ম বিক্ষেপের হেতু ইহাই সাধারণ ধারণা। গীতা এই ধারণা অনুমোদন করেন নাই। মানবের পক্ষে নিঃশেষে কর্ম্মত্যাগ অসম্ভব; জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য কতকগুলি কর্ম্ম তাহাকে করিতেই হয়, আর অবস্থা ও সংস্কার অনুসারে কোন কোন অন্য কর্ম্ম তাহার করনীয়(২)। যাঁহারা স্বভাবতঃ সমাজে বিবিধ কর্ম্ম সম্পাদন অপেক্ষা নির্জ্জনে ধ্যানযোগের উপযুক্ত, তাঁহাদিগের কথা স্বতন্ত্র। অন্য সকলকে কর্ম্মের পথেই সিদ্ধি বা ব্রহ্মভাব লাভ করিতে হয়(৩)। মুক্ত পুরুষও সতত কর্ম্মে নিযুক্ত থাকেন, যদিও তাঁহার অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তিযোগ্য কিছুই নাই(৪)। বস্তুতঃ এই মহান আদর্শ জীবকে কল্যাণের পথে প্রবর্ত্তিত করিতে সমর্থ। কিন্তু কামনা শ্রেয়োলাভে অন্তরায় হয়; সুতরাং তাহাই বর্জ্জনীয়। গীতা এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন; শ্রুতির আদেশও অনুরূপ। অজাতশত্রু, জনক, চিত্র, সত্যকাম ও কামলায়ন কর্ম্মত্যাগ করেন নাই, অথচ তাঁহাদিগকে পথভ্রষ্ট পথিক বলা শ্রুতির অভিপ্রায় নহে। অতএব শাস্ত্রদ্বয়ে এ বিষয়েও সঙ্গতি বিদ্যমান।

---

(১) গীতা ৬।৭-৯; (২) গীতা ৩।৫,৮;

(৩) গীতা ৩।১৭-২০; (৪) গীতা ৩।২২-২৪

ৃতি ও গীতা
েইঈশ্বরবাদ
মান।

কিন্তু কোন কোন সমালোচকের মতে উপনিষদের ব্রহ্ম ঈশ্বর নহেন, তিনি প্রপঞ্চের চরম ও অদ্বয় আশ্রয়। বিশ্বে সর্ব্বত্রই ভেদ ও বৈষম্য বর্ত্তমান, অথচ ভেদ ও বৈষম্য মানব-চিত্তকে অভিভূত করে। সুতরাং মূলে একের সন্ধান স্বাভাবিক, আর ব্রহ্মের পরিকল্পনায় এই অন্বেষণের সার্থক পরিসমাপ্তি। কিন্তু তাঁহার অনুচিন্তনে বিক্ষিপ্ত চিত্ত শান্তি-লাভ করিলেও সৃষ্টিরহস্য উদ্‌ঘাটিত হয় না, মানব প্রকৃতিও সর্ব্বাঙ্গীণ চরিতার্থতালাভ করে না। গীতা ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী উপদেশ দিয়া এই অভাব পূরণ করিয়াছেন। অতএব ধর্ম্মভাবের ক্রমবিকাশে উপনিষদের বাণী একটি বিশিষ্ট স্তর হইলেও গীতায় তাহার পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি। অব্যক্ত ও অক্ষর তত্ত্বের সহিত জীবের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ নহে, কিন্তু বিশ্বেশ্বরের সহিত তাহার সম্বন্ধ নিবিড় ও নিরন্তর; সুতরাং ভক্তি ও অর্চ্চনা তাঁহারই প্রাপ্য, ব্রহ্মের নহে।

পূর্ব্বেই আমরা এই অভিমতের বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। প্রসঙ্গক্রমে উপনিষৎ ব্রহ্মের বিবিধ ভাবের পৃথক্ পৃথক্ বিবৃতি দিয়াছেন। সুতরাং কোথাও দেখি তিনি সর্ব্বাধার, কোথাও সর্ব্বান্তর, কোথাও জ্যোতির্ম্ময় আর কোথাও বা বাক্য ও মনের অতীত। তাঁহাকে বিশ্বের নিয়ামক আর বিশ্ববাসীর শাস্তাও বলা হইয়াছে; কিন্তু তত্ত্বে ভেদ কোথাও করা হয় নাই। বস্তুতঃ তাহা করিলে ব্রহ্মকে উপাদানে বা আশ্রয়ে আর ঈশ্বরকে কেবল নিমিত্তে পরিণত করা হয়। যাহা হউক, প্রাচীন উপনিষদের তুইটি বাণীর পুনরুল্লেখ করিয়া এই বাদানুবাদের উপসংহার করিব।

যাজ্ঞবল্ক্যের মতে ব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ; কিন্তু সেই নিত্যজ্যোতিঃ যেন বিচ্ছুরিত হইয়া দিন, মাসও বর্ষের আকার

ধারণ করিয়াছে; সুতরাং অমরত্ব ও কালাবচ্ছিন্ন আয়ু উভয়ই তাঁহাতে বর্ত্তমান। আকাশেরও তিনি আশ্রয়; সুতরাং জীব ও জীবলোক তাঁহাতেই প্রতিষ্ঠিত। আর প্রাণন, মননাদি বিবিধ চেষ্টার তিনিই আদি কারণ। অধিকন্তু, অধিপতিরূপে তাঁহার সীমাহীন রাজ্যের বিভিন্ন অংশ তিনি সম্বদ্ধ রাখেন ও অগণিত প্রজাকে শাসন করেন। অথচ তাঁহাতে নানাত্ব নাই অর্থাৎ তিনি স্বরূপে আত্মা বা শুদ্ধ চৈতন্য বলিয়া বৈচিত্র্যবর্জ্জিত যদিও তাঁহার বিকাশ বিশ্বব্যাপী ও সর্ব্বতোমুখী(১)। যম বলিয়াছেন, তিনি এক হইলেও আপনাকে বহুরূপে প্রকাশ করেন, কিন্তু এ সকল প্রকাশ অনিত্য আর তিনি নিত্য। জীবনিচয় তাঁহার মহিমায় চেতনাযুক্ত হয় ও কর্ম্মানুযায়ী ভোগ্য বিষয় লাভ করে। অতএব তিনি তাবৎ প্রাণীর অন্তরাত্মা ও বিশ্বের নিয়ন্তা, অথচ তিনি যে কি ও কেনই বা তাঁহার এই বিরাট প্রকাশ তাহা জানি না, কারণ যাহা কিছু আছে, সকলেই তাঁহার জ্যোতিতে ব্যক্ত, তাঁহাকে বিষয়রূপে প্রকাশ করে এমন জ্যোতিষ্ক নাই। তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে যোগিগণ তাঁহাকে অন্তরের অন্তরে উপলব্ধি করিয়া পরম আনন্দলাভ করেন(২)।

গীতার ঈশ্বরবাদ, বোধ হয়, ইহা অপেক্ষা সুস্পষ্ট নহে। তথাপি স্বীকার করি, উপনিষদের বহুস্থলে ঐশ্বর্য্য যেন উপেক্ষিত হইয়াছে। যিনি আবৃত্তচক্ষু প্রত্যগাত্মার ধ্যানে নিবিষ্ট, তাঁহাকেই উপনিষৎ ধীমান বলিয়াছেন(৩)। সুতরাং ঈশ্বরের মহিমা ও নিয়ন্ত্রণ লক্ষ্য করিয়া চিত্ত যে বিস্ময় ও কৃতজ্ঞতায় যুগপৎ আপ্লুত হয়, তাহার পরিচয় উপনিষদে

(১) বৃহদারণ্যক ৪।৪।১৫-২২; (২) কঠোপনিষৎ ২।২।১২-১৫

(৩) কঠোপনিষৎ ২।১।১

অধিক নাই। পরন্তু গীতায় ঈশ্বরবর্ণনা হৃদয়োচ্ছ্বাসে অনুরঞ্জিত আর ঈশ্বর আরাধনা জ্ঞান, কর্ম্ম, ধ্যান ও শরণাপত্তিতে সম্পূর্ণ। এই প্রভেদে কিন্তু আরাধ্য সম্বন্ধে পার্থক্য সূচিত হয় না। জীবন সন্ধ্যায় যাঁহারা কর্ম্মবিরল অরণ্যে আশ্রয় লইতেন কিংবা প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিতেন, ঈশ্বরের শান্ত বা প্রপঞ্চাতীত ভাবের অনুচিন্তনই তাঁহাদিগের পক্ষে উপযোগী ছিল। সুতরাং উপনিষৎ সেই ভাবেই গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন; মহিমার উল্লেখ বার বার আছে বটে; কিন্তু তাহা যেন প্রাসঙ্গিক। গীতার শ্রোতা কিন্তু কর্ম্মে ব্যাপৃত অথচ কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বিমূঢ়, আর সাংসারিক সুখদুঃখের প্রতি তিনি উদাসীন নহেন। অতএব উপনিষদের বাণী অরণ্যবাসী বা ভিক্ষুর পক্ষে উপাদেয় হইলেও তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট নহে; বিশ্বাধিপের অমোঘ ও অবিরাম শাসন সম্বন্ধে উপদেশই সমধিক বাঞ্ছনীয়(১)। গীতা তাহাই দিয়াছেন, অথচ তাঁহার পরম ভাব বা 'চরম ধামের' নির্দ্দেশও গীতায় আছে(২)। সুতরাং শাস্ত্রদ্বয়ে প্রকৃত বিরোধ নাই।

তথাপি কল্পিত বিরোধের হেতুবাদে বলা হয়, জিজ্ঞাসুর অধিকার অনুসারে উপদেশে প্রভেদ হইয়া থাকে। কোন কোন ব্যাখ্যাকারের মতে,—অর্জ্জুন নিম্ন শ্রেণীর সাধক, মুক্তিপ্রদ জ্ঞানে নিষ্ঠা তাঁহার সাধ্যাতীত; অতএব অনাসক্ত চিত্তে কর্ত্তব্যপালন গীতায় আদিষ্ট হইয়াছে, কারণ তাহার ফলে চিত্ত শুদ্ধ ও শান্ত হইলে অক্রিয় চৈতন্যমাত্র পরম তত্ত্বে অভিনিবেশ সম্ভব হয়, আর ইহাই প্রকৃত সাধনা, কর্ত্তব্যপালন ইহার উপক্রম মাত্র যেহেতু কর্ম্ম থাকিতে মুক্তি নাই। কিন্তু গীতার উপদেশ এরূপ নহে; অর্জ্জুনের প্রতি অবিচারও ইহাতে

(১) গীতা ১১।৫৫, ১২।২, ৬-৮; (২) গীতা ১৫।৫

করা হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ে জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগ, এই দ্বিবিধ নিষ্ঠার উল্লেখ আমরা পাই, আর পঞ্চমে বলা হইয়াছে ইহাদিগের একটি সর্ব্বান্তঃকরণে অবলম্বন করিলে সাধক কৃতকৃত্য হন, কারণ পথ দুইটি নিতান্ত পৃথক্ নহে। শ্রুতিও সত্যকাম ও কামলায়নের বৃত্তান্তে অনাসক্ত ও শ্রদ্ধাযুক্ত চিত্তে কর্ত্তব্যপালনের মহিমা মুক্তকণ্ঠে কীর্ত্তন করিয়াছেন।

প্রকৃতপক্ষে, অর্জ্জুনের আত্মগ্লানিই তাঁহার তথাকথিত হীনতার একমাত্র প্রমাণ; অন্য প্রমাণ অন্ততঃ গীতায় নাই। কিন্তু যে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখে তিনি সংশয়াকুল হইয়াছিলেন তাহা লক্ষ্য করিতে হইবে। তিনি ক্ষত্রিয়, সুতরাং ধর্ম্মযুদ্ধ তাঁহার কর্ত্তব্য অথচ আত্মীয়, অন্তরঙ্গ বধ ও কুলক্ষয় গর্হিত। এবংবিধ সমস্যায় তিনি যে কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বিমূঢ় হইয়াছিলেন তাহা সহৃদয়তার পরিচায়ক, স্বার্থপরতার নহে। সাংসারিক সুখদুঃখ তিনি উপেক্ষা করেন নাই সত্য; কিন্তু অন্যের অমঙ্গল নিবারণের জন্য তিনি জীবনবিসর্জ্জন দিতেও প্রস্তুত হইয়াছিলেন। ভয় কিংবা যুদ্ধের ফলাফল সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা তাঁহাকে শরাসন ত্যাগে প্ররোচিত করে নাই, যেহেতু তিনি যে বিক্রমে ও রণনৈপুণ্যে অগ্রগণ্য, এ ধারণা তাঁহার ও অন্য সকলেরই ছিল। তাঁহার বিনয়, শ্রদ্ধা আর পরমার্থে অনুরাগও অসাধারণ। তাঁহার চিত্ত চঞ্চল ও জ্ঞান অসম্পূর্ণ, এ আপত্তির মূল্য নাই, কারণ তিনি যে সিদ্ধ নহেন ইহা স্বীকৃত। কিন্তু সাধকগণের মধ্যে তাঁহার স্থান কোথায়? গীতা এই প্রশ্নের সদুত্তর দিয়াছেন। অর্জ্জুনকে প্রিয়শিষ্য বলা হইয়াছে, আর সৃষ্টির প্রারম্ভে যে উপদেশ বিবস্বানকে প্রদত্ত হইয়াছিল, সেই গুহ্যতম উপদেশের যোগ্য

বলিয়া তিনি বিবেচিত হইয়াছেন(১)। বিবস্বান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধক মানবসমাজে কল্পনা করা যায় কি ?

তথাপি আপত্তি হয়, বিবস্বান কর্ম্মী, অর্জ্জুনও তাহাই, কিন্তু কর্ম্ম বন্ধনের হেতু, সুতরাং কর্ম্মফলে অভ্যুত্থান সম্ভব হইলেও মুক্তি বা অমরত্ব সম্ভব নহে। এ আপত্তি দর্শনের, উপনিষদের নহে। যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ী ও জনককে মোক্ষপ্রদ সাধনায় দীক্ষিত করিয়াছিলেন, অথচ তাঁহারা সন্ন্যাসগ্রহণের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। বস্তুতঃ সিদ্ধির জন্য কর্ম্মে নির্লেপই যে প্রয়োজন, কর্ম্মত্যাগ নহে, এ বিষয়ে গীতা ও উপনিষদে মতদ্বৈধ নাই, কারণ উভয়ের মতেই পরম পুরুষ অক্ষর ও অব্যক্ত হইলেও বিশ্ব ও বিশ্ববাসীর স্রষ্টা ও নিয়ন্তা। তবে উপনিষদের দৃষ্টি মুখ্যতঃ অক্ষরভাবের প্রতি, আর গীতায় নিয়ন্তৃত্বই প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু নিয়ন্ত্রিত জীবের সামর্থ্য ও ব্যবহার পরীক্ষা না করিলে এই নিয়মনের প্রসার পরিস্ফুট হয় না। উপনিষদে এতাদৃশ পরীক্ষা নাই, কারণ উপনিষদের শ্রোতা অবস্থা বা প্রবৃত্তি অনুসারে ব্যবহার যথাসম্ভব সঙ্কুচিত করিয়া পরম ভাবে সমাধির জন্য আগ্রহান্বিত। গীতার শ্রোতা অন্যরূপ ; তাঁহার ব্যবহার বিবিধ ও সমাজের পক্ষে প্রভূত কল্যাণকর ; তাঁহার অবসাদও সাময়িক। অতএব গীতা ব্যবহারের ভিত্তি ও সীমা প্রদর্শন করিয়া ঐশ প্রভাবের সুখবোধ্য পরিচয় দিয়াছেন।

এ আলোচনায় শ্রুতি সাধারণভাবে পথপ্রদর্শক হইলেও, সাংখ্যতন্ত্রের তন্নতন্ন বিচারই গীতায় অনুসৃত হইয়াছে। কিন্তু যে নৈতিক উপদেশ ও অর্চ্চনার বিধান ইহার উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা গীতার নিজস্ব। সে বিধান পরে ব্যাখ্যাত

(১) গীতা ৪।১-৩, ১৮।৬৫

হইবে। আপাততঃ ব্যবহার অর্থাৎ কর্ম্ম ও ভোগ পরীক্ষা করিয়া গীতা কিরূপে ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাই আমরা দেখিব। দ্বিতীয়, সপ্তম, অষ্টম, নবম, ত্রয়োদশ চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ অধ্যায়ে এই আলোচনা আছে। মর্ম্ম নিম্নে সবিস্তারে দেওয়া হইল।

সংসারের বর্ণনা ও ব্যবহারের বিশ্লেষণ

কল্পারম্ভে জীবের উদ্ভব ও কল্পান্তে তাহার লয় হয়। এই সুদীর্ঘ কালে বহুবার সে দেহপরিগ্রহ ও দেহত্যাগ করে, আর ইহার অবসানেও তাহার অত্যন্তনাশ হয় না, কারণ সৃষ্টি ও প্রলয় পর্য্যায়ক্রমে অনাদি ও অনন্ত(১)। দেহ কালবশে ধ্বংস হয় সত্য ; কিন্তু দেহী বা জীব যে এতাদৃশ বিপর্য্যয়েও অক্ষুণ্ণ থাকে, ইহাই সঙ্গত অনুমান, যেহেতু বয়োবৃদ্ধির ফলে দেহের রূপান্তর ঘটিলেও দেহীর অনন্যতাবোধ ব্যাহত হয় না(২)। এমন কি, অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি নৈসর্গিক শক্তি বা প্রতিপক্ষের অস্ত্রাঘাত দেহের প্রভূত ও আকস্মিক ক্ষতি করিলেও উক্ত বোধ অটুট ও অনাচ্ছন্ন রহিয়া যায়(৩)। জন্ম অর্থে নশ্বর দেহ ধারণ ; সুতরাং জন্মের অল্পাধিক কাল পরে মৃত্যু বা ধৃতদেহের ক্ষয় অনিবার্য্য। কিন্তু দেহ ও দেহী বিসদৃশ। অতএব সমীচীন সিদ্ধান্ত এই, জীর্ণ বসনের পরিবর্ত্তে যেরূপ নব বস্ত্র পরিধান করা হয়, জীবও সেইরূপ শীর্ণ বা বিকল শরীর ত্যাগ করিয়া নবীন দেহ ধারণ করে(৪)।

কিন্তু জীবের এই জন্মমরণরূপ আবর্ত্তে ভ্রমণ তাহার ইচ্ছাধীন নহে। অবশভাবেই সে দেহযুক্ত হয় ও তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হয়। আর জীবদ্দশায় সকল কর্ম্মে ও ভোগে তাহার পারতন্ত্র্য ও পরিণাম পরিস্ফুট। তথাপি স্বীয় কর্ত্তৃত্ব,

(১) গীতা ৮।১৭-১৯, ৯।৭,৮ ; (২) গীতা ২।১৩ ;
(৩) গীতা ২।২৩, ২৪ ; (৪) গীতা ২।২২

ভোক্তৃত্ব ও অখণ্ড্য একত্ব সম্বন্ধে তাহার অনপনেয় প্রতীতি। এই অন্তর্নিহিত অসঙ্গতির কারণ নির্ণয়ের জন্য তাহার উপাদান ও শক্তির বিশ্লেষণ আবশ্যক। ক্ষিতি, জল, অনল, মরুৎ ও আকাশ, এই পঞ্চ মহাভূত তাহার কর্ম্মভূমির ও ভোগায়তনের উপাদান, আর সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক মন, নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি ও দেহাদিতে আত্মবোধ তাহার কর্ম্ম ও ভোগ সাধনের উপায়(১)। জীবলোকে ও জীবদেহে বৈচিত্র্যের অন্ত নাই, সত্য; কিন্তু উক্ত ভূতগণের বিবিধ সঙ্ঘাত ঐ বৈচিত্র্যের কারণ, অর্থাৎ উহাদিগের অনুপাত অনুসারে আকারপ্রকারে অগণিত প্রভেদ হয়। স্বভাবের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধেও অনুরূপ ব্যাখ্যাই সঙ্গত। অহঙ্কার, বুদ্ধি ও মনের কুশলতা সর্ব্বক্ষেত্রে সমান নহে; আর এই কুশলতার তারতম্যে বৈশিষ্ট্যের উৎপত্তি। অতএব সিদ্ধান্ত এই, ব্যবহার যেরূপই হউক না কেন, উল্লিখিত অষ্ট প্রকার উপকরণে তাহা সিদ্ধ হয়। উহারা প্রকৃতি মধ্যে গণ্য, যেহেতু প্রথম পাঁচটি ব্যবহার্য্য দ্রব্যজাতের উপাদান ও অবশিষ্ট তিনটি ইচ্ছাদ্বেষাদি বিশেষিত ভাব অপেক্ষা মৌলিক যদিও প্রত্যেকটি বিষয়রূপে জ্ঞেয়।

ব্যবহার এইরূপে ব্যাখ্যাত হইল বটে; কিন্তু কাহার জন্য এই ব্যবহার, অর্থাৎ কাহার উদ্দেশে কর্ম্মে প্রবৃত্তি ও ভোগের ব্যবস্থা? আপাতদৃষ্টিতে আমি পদবাচ্য অহঙ্কারই অধিকারিরূপে প্রতিভাত হয়, কারণ প্রত্যেক ব্যাপার 'আমি করি', 'আমি সুখদুঃখভাগী হই' বা 'আমি জানি', এবংবিধ আকার ধারণ করে। কিন্তু অনুভব অনুসারে এই আমির ক্ষণে ক্ষণে রূপান্তর হইয়া থাকে। অথচ জীব মাত্রেরই স্বীয় অবিকারিত্বে স্থির বিশ্বাস। সুতরাং স্বীকার করিতে হয় যে

(১) গীতা ৭।৪

উক্ত দ্রুতপরিণামী আমিত্বের পশ্চাতে অচঞ্চল ও সর্ব্বদা একরূপ অস্মিতা আছে ও তাহাই যাবতীয় অনুভূতির প্রকৃত কেন্দ্র। বিসদৃশ ব্যাপারের অবলম্বন হওয়ায় কোন ব্যাপারের সহিত তাহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা নাই। কর্ম্মে যে আমি, ভোগেও সেই আমি, চিন্তাতেও সেই আমি ; অর্থাৎ আত্মরূপে আমি অস্মীতিমাত্র। কেবল তাহাই নহে ; এই বিশুদ্ধ আত্মবোধ ব্যক্তিত্বের সীমাও অতিক্রম করে। অহঙ্কার প্রতি ব্যক্তিতে ভিন্ন, সুতরাং বহু। কিন্তু অস্মীতিমাত্র সর্ব্ব জীবে ও সর্ব্ববিধ অনুভূতির মূলে সমভাবে বর্ত্তমান। সাধারণতঃ এই অসঙ্কীর্ণ ভাবের সম্যক্ উপলব্ধি হয় না, কারণ দৃষ্টি নানারূপ 'অনাত্ম' পদার্থে নিবদ্ধ থাকে। কিন্তু যোগ অভ্যাসের ফলে স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে ইহা এক ও অবিভাজ্য, বহু বা বিচিত্র নহে। দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনে আত্মবোধ প্রবল থাকে বলিয়াই ব্যক্তিভেদে ইহার ভেদ কল্পনা করা হয়।

সাংখ্য শাস্ত্রে ইহাকে মহত্তত্ত্ব বলা হইয়াছে। যোগদর্শনে ইহা গ্রহীতা নামে প্রসিদ্ধ। গীতা ইহাকে পরা প্রকৃতি ও অক্ষর পুরুষ বলিয়াছেন। বস্তুতঃ ইহা শ্রেষ্ঠ প্রকাশ যেহেতু শীতোষ্ণসুখদুঃখাদি দ্বন্দ্ব ইহার আশ্রয়ে সমভাবে প্রকট হয়। তাহারা বিবিধ ; কিন্তু আত্মবোধে বৈচিত্র্য নাই। নবদ্বারযুক্ত দেহরূপ পুরে ইহার অধিষ্ঠান ও ইহা ষড়্‌বিধ বিকার বর্জ্জিত ; সুতরাং অক্ষর পুরুষ ইহার সার্থক নাম। ইহাকে কূটস্থও বলা হইয়াছে যেহেতু প্রপঞ্চের মধ্যে ইহা স্থির ও একরূপ। বিষয় যায় ও নূতন বিষয় আসে, কিন্তু আত্মবোধের পরিবর্ত্তন হয় না। ফলে, এই আত্মবোধে প্রত্যয় ও স্মৃতিরূপে গ্রথিত হইয়া যাবতীয় বিষয় জীবের সম্পত্তি হয়। ইহার স্থিতির প্রতিপক্ষরূপে গতির উপলব্ধি হয় ও ইহার একত্বের বিরোধী

হইয়া নানাত্ব তাহার রূপ প্রকাশ করে। সুতরাং ইহাই পরিণামী ও বিচিত্র জগৎকে ধারণ করিয়া আছে। জীবভাবেরও উদ্ভব ইহাতে কারণ বিজ্ঞানপরম্পরা জীব নহে; এই আত্মবোধেই জীবের প্রকৃত পরিচয়(১)।

শুদ্ধ আত্মভাব তাবৎ ব্যবহারের অবলম্বন হইলেও ব্যবহারের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা তাহাতে নাই।

কিন্তু এই মৌলিক জীবভাব প্রাণিনিচয়ে সাধারণ হইলেও ইহার উল্লেখে ব্যবহারের ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ হয় না, কারণ প্রাণিগণের ব্যক্তিগত পার্থক্য সংখ্যাতীত, ব্যবহার্য্য জগতেও বৈচিত্র্যের সীমা নাই। কোথা হইতে এই বিশ্বব্যাপী ও অশেষবিধ বৈলক্ষণ্য আসিল? অস্মীতিমাত্রের সমতায় এই বৈষম্যের বীজ নিগূঢ় থাকিতে পারে না, আর কর্ম্মফলে ইহার উৎপত্তি নহে, যেহেতু স্বভাবে প্রভেদ কর্ম্মে পার্থক্যের পূর্ব্বগামী। বিশ্বে নানাত্বের সমাবেশ দেখি আর বিশ্ববাসীর অন্তরে ক্রমবিকাশ সুস্পষ্ট, অথচ অস্মীতিমাত্র স্বস্থ, অনন্য, অক্রিয়। সমস্যাটির সমাধানকল্পে গীতা উহার অন্য বর্ণনাও দিয়াছেন। সংসারে আমরা দ্বিবিধ পুরুষের সাক্ষাৎ পাই। একটি আমাদের সুপরিচিত বহুরূপ অভিমান; ইহাতে দেহের তাবৎ বিকার প্রতিবিম্বিত হয়, আর দেহাতিরিক্ত গ্রাহ্য বস্তুর প্রভাবও ইহার উপরে সামান্য নহে। সুতরাং সংসারের মূল কারণ হওয়া দূরে থাকুক, ইহা প্রত্যক্ষতঃ পরিণামী ও পরবশ। অন্যটি শুদ্ধ অস্মিতা; ইহা প্রচ্ছন্ন হইলেও অনুভবযোগ্য; সূত্রে মণিগুলির মত ইহাতে অভিমানের পরিণামসমূহ বিন্যস্ত থাকে। গীতা ইহাদিগকে ক্ষর ও অক্ষর পুরুষ বলিয়াছেন(২)। কিন্তু কার্যকারণরূপে ইহারা সম্বদ্ধ নহে; কেবল আধেয় আধার সম্বন্ধ ইহাদিগের মধ্যে বিদ্যমান, আর তাহাও প্রহেলিকার মত, কারণ অক্রিয় ও অবিকারী অস্মীতিমাত্র ও

(১) গীতা ৭।৫; (২) গীতা ১৫।১৬

সতত পরিবর্ত্তনশীল অহঙ্কার নিত্যসংযুক্ত কেন অর্থাৎ তাহাদিগের মধ্যে যোগসূত্র কোথায়? এই প্রশ্নের সদুত্তর ব্যবহারের বিশ্লেষণে নাই।

পুরুষোত্তম তত্ত্ব

গীতা পুরুষোত্তম বা পরমাত্মার বর্ণনায় এই কঠিন প্রশ্নের একটি চূড়ান্ত উত্তর দিয়াছেন। গীতা আপ্তবাক্য, আর আপ্তবাক্যে বাদানুবাদের স্থান নাই। তথাপি অর্থ সুগম হইবে এই আশায় উপদেশের সহিত কিছু যুক্তিতর্ক নিম্নে যোগ করিলাম। ব্যাপক সামঞ্জস্য ও শৃঙ্খলা আকস্মিক ব্যাপার নহে; জড়শক্তি অভিকল্পনামাত্র, আর অন্তর্জ্জগতে ও বহির্জ্জগতে পূর্ব্বাপর ঘটনা সকলই বোধাত্মক। সুতরাং যিনি চিন্ময় তাঁহাতেই ইহাদিগের উৎপত্তি ও বিকাশ; তথাকথিত কারণ ও কার্য্যের সম্বন্ধে যে শক্তির পরিচয় বর্ত্তমান, তাহা প্রকৃতপক্ষে তাঁহারই; তিনিই শক্তিমান; শক্তির অন্য কোন আধার নাই। উপনিষৎ তাঁহাকে আত্মা বলিয়াছেন, আর গীতা এই শব্দটি দেহে উপহিত চৈতন্যের বাচকরূপে ব্যবহার করিয়া দেহনির্ম্মুক্ত চৈতন্যকে পরমাত্মা নামে অভিহিত করিয়াছেন, কিন্তু তত্ত্বে ভেদ করেন নাই। বস্তুতঃ যে স্থলে উপাধির স্পষ্ট উল্লেখ আছে তথায় জীবচৈতন্যকেও পরমাত্মা, পরম পুরুষ বা ঈশ্বর বলা হইয়াছে(১)।

গীতার এই মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে নিম্নোক্ত প্রতিজ্ঞাগুলি স্বীকৃত। বিশ্ব ও বিশ্ববাসী তাঁহার বিবিধ অভিব্যক্তিমাত্র, সুতরাং স্বরূপে তিনি অব্যক্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ও মনের অগোচর। তাবৎ পরিণাম তাঁহার আশ্রয়ে প্রকট হয়, সুতরাং তিনি অক্ষর অর্থাৎ নিত্য একভাব(২)। ক্ষরণ তাঁহার প্রকাশেই নিবদ্ধ থাকে, তাঁহার অমেয় সত্তায় সংক্রমিত হয় না। অথচ তিনি

(১) গীতা ১৩।২২,৩১;

(২) গীতা ৮।২০,২১

কূটস্থের মত অক্রিয় ও ঐশ্বর্যরহিত নহেন। ব্যাপকতা হেতু তিনি পূর্ণ ও স্বতন্ত্র অর্থাৎ সত্তান্তর নিরপেক্ষ, সুতরাং তিনিই প্রকৃত পুরুষ। তাঁহার এবংবিধ নিরতিশয়ত্ব খ্যাপনার্থ শাস্ত্রে ও জনসমাজে তাঁহাকে পুরুষোত্তম বলা হইয়াছে(১)। জীবহৃদয়ে তাঁহার অধিষ্ঠান বটে ; তথাপি প্রলয়ে অর্থাৎ জীব ও জীবলোকের অন্তর্ধানে তাঁহার স্বরূপ অব্যাহত থাকে, যেহেতু তিরোভাবও আবির্ভাবের মতই চৈতন্যের বিষয় অর্থাৎ চিন্ময় পুরুষকে অতিক্রম করিয়া বাস্তব হয় না। বস্তুতঃ তাঁহাতেই সকলের উদ্ভব, অবস্থিতি ও অবসান। তাহাদিগের প্রত্যেক পরিণতিও তাঁহার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। পরিণাম বা রূপান্তর প্রকৃতপক্ষে কি তাহা বিচার না করিয়া অনেকে কল্পনা করেন, অগ্রে জড় জগতে পরিণাম ঘটে ও পরে তাহা চৈতন্যে উদ্ভাসিত হয়। জড়ে শক্তির উৎপত্তি নহে, যদিও শক্তির বাহকরূপে তাহার প্রকাশ। যিনি জ্ঞানময়, ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ যাঁহাতে সমভাবে অবস্থিত, শক্তি ও নিয়মন তাঁহারই, যদিও জীবের সঙ্কীর্ণ অভিজ্ঞতায় কারণ-কার্য্যের বা কালত্রয়ের ক্রমবিকাশ হয়। বস্তুতঃ এ নিয়মনের তুলনা নাই। লৌকিকেশ্বরের শাসন বাহ্য, আংশিক ও সবিরাম, সুতরাং তাহার প্রতিরোধ সম্ভব। এই ঐশ শাসন কিন্তু আন্তর, প্রকৃতিগত, অবিরাম, সুতরাং সম্পূর্ণ ও অপ্রতি-হত, অর্থাৎ পুরুষোত্তম বিশ্বরূপ হওয়ায় তিনি সর্ব্বতোভাবে বিশ্বনাথ(২)।

শ্রুতিতে পুরুষোত্তম তত্ত্ব।

পুরুষোত্তমের এই বর্ণনায় কিন্তু আমরা দ্বিবিধ আপত্তির সম্মুখীন হই। প্রথম আপত্তি, গীতা ও শ্রুতিতে এ বিষয়ে বিরোধ। শ্রুতি বলিয়াছেন, অক্ষরই পরম তত্ত্ব অথচ গীতা

(১) গীতা ১৫।১৭,১৮ ; (২) গীতা ১১।৩৮, ১৩।২৭, ১৫।১৫

পুরুষোত্তমের উৎকর্ষ খ্যাপন করিয়াছেন। কিন্তু উপদেশ সাবধানে পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, অক্ষর শব্দটি একই অর্থে শাস্ত্রদ্বয়ে সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হয় নাই। যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীকে বলিয়াছিলেন অক্ষর কেবল চরম আশ্রয় নহেন, কারণ বিশ্বে স্থিতি ও গতির যোগ্য সন্নিবেশ ও ধর্ম্মাচরণের ন্যায্য ব্যবস্থা তাঁহার শাসনের প্রকৃষ্ট প্রমাণ(১)। আর এই নির্দ্দেশই পুরুষোত্তমের বিবরণে আমরা পাই, যেহেতু বলা হইয়াছে তিনি সর্ব্বত্র আছেন ও সকলকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন বলিয়া লোকত্রয় অব্যাহত রহিয়াছে, অথচ এই বিশ্বব্যাপী কর্ম্মসত্ত্বেও তাঁহার ব্যয় নাই, অর্থাৎ তিনিই প্রকৃত অক্ষর। কিন্তু অন্য প্রকার অক্ষরের সন্ধান ব্যবহারে পাওয়া যায়। অবস্থা ও প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহার বিবিধ ও বিযুক্ত হয়, তথাপি অবাধিত ও একরূপ আত্মবোধ অর্থাৎ অস্মীতিমাত্র বন্ধনীরূপে ইহাদিগকে সম্বদ্ধ করে। সুতরাং গীতা বলিয়াছেন, সংসারে ক্ষর ও অক্ষরের যুগপৎ পরিচয় আছে। কিন্তু প্রলয়ে অর্থাৎ যাবতীয় ক্ষরভাবের অবসানে এই অনুবন্ধী অক্ষরভাবও অন্তর্হিত হয়, কারণ ক্ষরের সহিত ইহা অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ যদিও ইহার অনন্যতায় প্রপঞ্চের উৎপত্তি নহে। সুতরাং এই গৌণ অক্ষরের তুলনায় পুরুষোত্তমের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করিয়া গীতা শ্রৌত উপদেশের প্রতিবাদ করেন নাই(২)।

পুরুষোত্তমতত্ত্ব ও শ্রৌত অদ্বৈতবাদ

দ্বিতীয় আপত্তি দার্শনিকের। কেহ কেহ দ্রষ্টা ও দৃশ্যের মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর রচনা করিয়া দৃশ্যাত্মক জগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব খ্যাপন করেন ও তাহাকে অনাত্মা আখ্যা দেন। অথচ অন্তর্জগতে একই তত্ত্ব কখন দ্রষ্টা ও কখন দৃশ্যরূপে প্রতীত হয়। এই আপাত বৈষম্যের ব্যাখ্যায় শ্রুতি বলেন সকলই আত্মার

(১) বৃহদারণ্যক ৩।৮।৯; (২) গীতা ১৫।১৮

অন্তর্গত, অর্থাৎ তিনি সর্ব্বাতিগ হইলেও সর্ব্বগত, সুতরাং দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে বুদ্ধি, মন ও প্রাণে আত্মবুদ্ধি হইয়া থাকে। বস্তুতঃ তিনি বিজ্ঞানময়, মনোময়, প্রাণময়, চক্ষুময়, শ্রোত্রময়, পৃথিবীময়, জলময়, বায়ুময়, আকাশময় ও তেজোময়(১)। প্রতিবাদীর মতে কিন্তু আত্মা ও অনাত্মায় ভেদ মৌলিক আর অবিবেক বশতঃই তাহারা একীভূত হয়। এ বিসংবাদ পূর্ব্বেই কিছু আলোচিত হইয়াছে, আর এস্থলে ইহার পুনর্বিচার অপ্রাসঙ্গিক হইবে, কারণ শ্রুতি ও গীতার সঙ্গতি প্রদর্শনই আমাদের বর্ত্তমান উদ্দেশ্য। শ্রুতি বলিয়াছেন, জীবহৃদয়ে আত্মার অধিষ্ঠান হইলেও, আত্মাই প্রত্যেক জীবের লোক অর্থাৎ আশ্রয় ও ভোগ্যবস্তু। আর গীতা বিশ্বেশ্বরকে বেত্তা ও বেদ্য উভয়ই বলিয়া এই তত্ত্বই প্রচার করিয়াছেন।

গীতায় পুরুষোত্তমের বিস্তৃত বর্ণনা

গীতার কেবল চারিটি শ্লোকে পুরুষোত্তম শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু সপ্তম, অষ্টম, নবম, দশম, একাদশ, ত্রয়োদশ ও পঞ্চদশ অধ্যায়ের নানা স্থলে পুরুষোত্তমের বর্ণনা আমরা পাই, আর এই বর্ণনায় গীতা প্রকাশ অবলম্বন করিয়া স্বরূপের উদ্দেশ দিয়াছেন। সপ্তম অধ্যায়ে তাঁহার সর্ব্বময়ত্বই মুখ্য উপদেশ। শশিসূর্য্যে তিনি প্রভা, আকাশে শব্দ, অনলে দাহিকা শক্তি, তরল পদার্থে রস, ভূমিতে গন্ধ, ইত্যাদি। কিন্তু রূপরস প্রভৃতি বোধাত্মক অর্থাৎ বিশেষিত চৈতন্য। জীবের বল, বুদ্ধি, পৌরুষ, অধ্যবসায় আর কামনাও তাহাই। সুতরাং পুরুষোত্তম চৈতন্য বলিয়া তাবৎ বস্তু ও ব্যক্তির তিনি উপাদান(২)। অষ্টমে লক্ষ্য তাঁহার সর্ব্বাধিষ্ঠাতৃত্বে ও অনুপম নিত্যত্বে। তিনি জ্যেষ্ঠ, শাশ্বত, সূক্ষ্মতম অথচ দিগন্তব্যাপী বিশ্বের ধাতা। কিন্তু একমাত্র চৈতন্যই অনাদিসিদ্ধ আর

(১) ছান্দোগ্য ৭।২৬।১, বৃহদারণ্যক ৪।৪।৫; (২) গীতা ৭।৮-১১

বিস্তারহীন হইলেও সর্ব্বাধার, সুতরাং তিনি চৈতন্যস্বরূপ অর্থাৎ অজ্ঞান বা অন্ধকারের লেশমাত্র তাঁহাতে নাই(১)। নবমে তাঁহার নির্লেপ ও পূর্ণতার উল্লেখ দেখি। কল্পারম্ভে জীব ও জগতের আবির্ভাব কল্পান্তে তাহাদিগের তিরোভাব ও অন্তর্বর্ত্তীকালে তাহাদিগের পরিণাম চৈতন্যেই ঘটে, অথচ তাহাতে এবংবিধ নিরন্তর লয়োদয় সত্ত্বেও তাহার স্বরূপে কোন পরিবর্ত্তন হয় না ; সুতরাং এ ক্ষেত্রেও পুরুষোত্তম ও চৈতন্যে একতা উপলক্ষিত(২)। দশমে ও একাদশে তাঁহার সর্ব্বাতিশয়ত্ব খ্যাপিত হইয়াছে। এই বিরাট বিশ্ব ও অসংখ্য বিশ্ববাসী পুরুষোত্তমে অবস্থিত, তথাপি ইহারা তাঁহার সীমা নহে ; চৈতন্যেরও এই লক্ষণ(৩)। ত্রয়োদশে তাঁহার সমতার কীর্ত্তন শুনি। জীবগণের মধ্যে প্রভেদ অগণিত হইলেও তাহাদিগের প্রাণস্বরূপ চৈতন্যে কোন ভেদ নাই ; পুরুষোত্তমের সকল হৃদয়ে সমভাবে অবস্থান বলায় এই তত্ত্বই উপদিষ্ট হইয়াছে(৪)।

পরিশেষে পঞ্চদশে তাঁহার শক্তির সবিশেষ পরিচয় আমরা পাই। পুরুষোত্তমই সংসারের মূল আর তিনি সকলকে ধারণ ও পোষণ করেন, অথচ এই বিশ্বব্যাপী কর্ম্মে তাঁহার কোনরূপ ক্ষয় হয় না(৫)। চৈতন্যের পরিচয়ও অনুরূপ। তাহাতে কোন অভাব নাই ; তাহার ক্ষতিবৃদ্ধিও নাই ; তাহার বিকাশে অন্যের সহযোগও অসম্ভব কারণ চৈতন্যের অতীত আধার, উপাদান বা নিমিত্ত কল্পনীয় নহে ; সুতরাং স্বভাববশেই তাহার বিকাশ হয়। বস্তুতঃ চৈতন্যেই বিকাশোন্মুখ শক্তি নিহিত আছে, অর্থাৎ যিনি চিন্ময় তিনিই প্রকৃতপক্ষে শক্তিমান।

(১) গীতা ৮।৯ (২) গীতা ৯।৪-৯ (৩) গীতা ১০।৪২, ১১।১৫, ১৬
(৪) গীতা ১৩।২৭, ২৮ (৫) গীতা ১৫।১, ১২-১৫

সৃষ্টির জন্য গীতা স্বতন্ত্র উপাদান বা আধার স্বীকার করেন নাই। পুরুষোত্তমই বিশ্বের আধার, উপাদান ও নিয়ম অথচ তিনি যৌগিক পদার্থ নহেন। তাঁহার সম্পূর্ণতায় চরমের সন্ধান লইতে হইবে, কারণ সৃষ্টিতে দেশ, কাল ও নিমিত্তের অপেক্ষা না থাকায় তাঁহার অভিব্যক্তি ও স্বরূপে সম্বন্ধ এত নিকট যে একটিকে অন্যের অনুপূরক বলিলে দোষ হয় না।

পুরুষোত্তমের রাজ্যে পাপ ও দুঃখের বাহুল্য কেন?

অতএব পরম তত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রুতি ও গীতায় মতদ্বৈধ নাই। শ্রুতি পর ও অপর ব্রহ্মের উল্লেখ করিয়াছেন বটে, কিন্তু গীতাতেও পুরুষোত্তমের অব্যয় পদ বা পরম ধাম ও সংসারে তাঁহার সর্ব্বতোমুখী মহিমা স্বীকৃত। আর এ ভেদ উভয় শাস্ত্রেই ভাবে, তত্ত্বে নহে। বিশ্বরূপ দর্শনের পরে অর্জ্জুন বলিয়াছিলেন, ঈশ্বর কেবল প্রপঞ্চাতীত অক্ষর সত্তা নহেন, পরন্তু কারণকার্য্যও তিনি, যেহেতু সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা তিনি ওতপ্রোতভাবে বর্ত্তমান(১)। তথাপি সংশয় হয়,—উত্তম, অধম, সুন্দর, কুৎসিত, দুর্ব্বল, বলবান, সকলই কি তুল্যরূপে ঈশ্বরের পরিচায়ক? বিশেষতঃ পুণ্য ও পাপ, সুখ ও দুঃখ কি অভেদে তাঁহারই প্রকাশ? ধৰ্ম্মনিষ্ঠ এ মত পোষণ করিতে অনিচ্ছুক বরং ঈশ্বরকে বিশেষিত করিয়া নিখিলদোষবৰ্জ্জিত ও অশেষ-কল্যাণগুণসম্পন্ন বলিয়া থাকেন। অদ্বৈতবাদী কিন্তু এ বর্ণনা গ্রহণ করিতে পারেন না। সকলই যখন এক ও অদ্বয় তত্ত্ব হইতে উদ্ভূত, তখন এই তত্ত্বকে কোন দিকে সীমাবদ্ধ করা অযুক্ত। শ্রুতি বলিয়াছেন,—ব্রহ্ম বিজ্ঞানঘন, আর তাঁহাতেই যাবতীয় নামরূপের উৎপত্তি। সুতরাং পাপ ও অকল্যাণ যতই হেয় হউক, তাঁহাকে অতিক্রম করে না। বস্তুতঃ যিনি অমেয় চৈতন্যস্বরূপ, তাঁহার প্রকাশের ধারা নির্দ্দেশ করিবে কে?

(১) গীতা ১১।৪০

বৃহদারণ্যকে দেখি,—আত্মাই ব্রহ্ম আর তিনি তেজোময়, অতেজোময়, কামময়, অকামময়, ক্রোধময়, অক্রোধময়, ধর্ম্মময়, অধর্ম্মময়, অর্থাৎ সর্ব্বময়(১)। স্বীকার করি, গীতার গণনায় রাগদ্বেষ কলুষিত বল ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ কাম ভগবৎ-প্রকাশের বর্ণনায় স্থান পায় নাই। কিন্তু গীতার মতে ব্রহ্মেই ত্রিগুণের উৎপত্তি(২) আর ইহাদের সংস্পর্শে তাবৎ ভাবের উদ্ভব হয়।

পুরুষোত্তম জ্ঞানময়, সুতরাং বিশ্বে তাঁহার বিচিত্র প্রকাশ, আর বৈচিত্র্যে তারতম্য অনিবার্য্য। প্রাণিনিচয়ের মধ্যে দেব নর হইতে কৃমি কীটে, জড়জগতে রবিশশী হইতে ধূলায় ও পঙ্কে তারতম্যের অবধি নাই। মানবচরিত্রেও এতাদৃশ তারতম্য বিদ্যমান ও সুখদুঃখভোগে অনুরূপ ইতরবিশেষ। ইহার ফলে জগতে দোষ ও দুঃখের অভাব নাই সত্য, কিন্তু সমষ্টিভাবে জগৎ পূর্ণ, অমেয় সত্তার উপযুক্ত রূপ বা পরিচয়। আপাতদৃষ্টিতে এবংবিধ বিকাশ ব্যক্তিগত উন্নতির প্রতিকূল বোধ হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা প্রতিকূল নহে। কর্ম্ম হইতে কর্ম্মফলকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে দুঃখের ব্যবস্থা অসঙ্গত মনে হয়। কিন্তু অতৃপ্তি, অশান্তি ও অধোগতি পাপের অবশ্যম্ভাবী ফল। পক্ষান্তরে পুণ্যই অভ্যুদয়ের ও অনাবিল সুখ অর্জ্জনের উপায়। সুতরাং এই দ্বিবিধ বিধান ধর্ম্মরাজ্যের ভিত্তিস্বরূপ, কারণ পাপের শোচনীয় পরিণতি ও পুণ্যের হিতকর প্রভাব মানবকে সৎপথে প্রেরিত করে। বস্তুতঃ বিশ্বেশ্বর এইরূপেই বিশ্ববাসীকে নিয়ন্ত্রিত করেন ও তজ্জন্য তাঁহাকে কর্ম্মফলদাতা বলা হয়। এ নিয়মন কিন্তু লৌকিক বিধানের মত নহে অর্থাৎ কোন উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য

(১) বৃহদারণ্যক ৪।৪।৫ (২) গীতা ৭।১২

ইহা প্রবর্ত্তিত হয় নাই। আত্মার শান্ত ও অপরিচ্ছিন্ন ভাব প্রকাশের পক্ষে যাহা অন্তরায় তাহাই পাপ ও যাহা অনুকূল তাহাই পুণ্য। আত্মা আনন্দময়; সুতরাং পুণ্য ও পাপ যে যথাক্রমে সুখ ও দুঃখের কারণ হয়, তাহা প্রকাশের স্বাভাবিক রীতি, অর্থাৎ কোন ভবিষ্যৎ লাভ বা ক্ষতি লক্ষ্য করিয়া তাহা বিহিত হয় নাই।

কিন্তু জীব কেন এ সুখদুঃখের ভাগী হয়, কেন বা পুণ্য ও পাপের ফলভোগ করে? তাহার ত কর্ম্ম সম্বন্ধে স্বাতন্ত্র্য নাই, কারণ প্রকৃতি অনুসারে তাহাকে কর্ম্ম করিতেই হয়(১)। অথচ জগতে অনুতাপ, কষ্ট, শোক, জরা ও মৃত্যু সর্ব্বত্র বিদ্যমান, পরন্তু সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য বিরল। সুতরাং এই মর্ম্মস্পর্শী দৃশ্যে ব্যথিত হইয়া ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি দুঃখবর্জ্জিত, সুখবহুল ও অবিনাশী স্বর্গলোক কল্পনা করেন কিংবা ইহলোকই ক্রম-বিকাশের ফলে নিরবচ্ছিন্ন সুখের আলয় হইবে এইরূপ আশা করেন। অর্জ্জুনও ভয়ঙ্কর বিশ্বরূপ দর্শনে মর্ম্মাহত ও হতবুদ্ধি হইয়া ঈশ্বরের সৌম্যমূর্ত্তি দেখিতে চাহিয়াছিলেন, যেহেতু তাহার ধ্যানে তিনি স্বস্তি লাভ করিতেন। কিন্তু শাস্ত্র বলিয়াছেন, এই পাপদিগ্ধ, দুঃখপূর্ণ সংসার প্রবাহরূপে নিত্য, আর সত্যের অপলাপ করিয়া পরমার্থ লাভ হয় না। অর্জ্জুনকেও উত্তরে বলা হইয়াছিল, ঈশ্বরের বিশ্বব্যাপী রূপই সর্ব্বাপেক্ষা দর্শনযোগ্য, সুতরাং দেবগণও তাহা প্রত্যক্ষ করিবার জন্য সতত অভিলাষী(২)। মর্ম্ম এই,—প্রলয়ের বিভীষিকাও উন্নত জীব অবিচলিত চিত্তে, এমন কি, আগ্রহ সহকারে সহ্য করেন, দৈনন্দিন ব্যবহারে সুখদুঃখের অভিঘাত ত তুচ্ছ কথা।

তথাপি পাপের জন্য দণ্ডভোগ মানবের পক্ষে কি সঙ্গত?

---

(১) গীতা ৩।৩৩

(২) গীতা ১১।৫২

গীতাই বলিয়াছেন, প্রকৃতিকে অতিক্রম করা যায় না, জ্ঞানবান ও স্বীয় প্রকৃতি অনুযায়ী ব্যবহার করেন। এই প্রশ্নের উত্তর গীতায় নানাস্থলে প্রসঙ্গক্রমে প্রদত্ত হইয়াছে ; তাহার তাৎপর্য্য সংগ্রহ করিয়া নিম্নে দিলাম। প্রাণিনিচয় পুরুষোত্তমের অংশ অর্থাৎ তাঁহার উপাধি-পরিচ্ছিন্ন বিবিধ রূপ। চক্ষুশ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গ্রাম ও মন এই উপাধি, আর ইহারা সমীপস্থ বিষয়ের সহযোগে কর্ম্মে ও ভোগে রত হয়(১)। কিন্তু কোন কোন বিষয় ইন্দ্রিয়বৃত্তির অনুকূল হইলেও অন্যান্য বিষয় তাহা নহে। সুতরাং বিষয় অনুসারে ইন্দ্রিয়ে আকর্ষণ বিকর্ষণ স্বাভাবিক, আর মনে এই দ্বন্দ্ব বা বিপরীত ভাবদ্বয় অনুরাগ ও বিদ্বেষের আকার ধারণ করে। ফলে ব্যবহারে নিরপেক্ষতা থাকে না, কারণ জীব মোহবশতঃ বৃত্তিসমূহের সহিত আপনাকে একীভূত করে, অর্থাৎ ক্রিয়া ও তাহার পরিণতির প্রকাশকমাত্র না থাকিয়া আপনাকে কর্ত্তা ও কর্ম্মফলের উপভোক্তা বোধ করে। এই কর্ত্তৃত্বাভিমান ও অবিশুদ্ধ ভোক্তৃভাব তাহার পাপ ও দুঃখের কারণ(২)।

কিন্তু জীব কি প্রকৃতপক্ষে কর্ত্তা ও ভোক্তা নহে? তাহাকে পুরুষোত্তমের অংশ বলা হইয়াছে। পুরুষোত্তম চৈতন্যস্বরূপ আর কর্ম্মে ও ভোগে চৈতন্যেরই দ্বিবিধ পরিচয়। মন ও ইন্দ্রিয়বর্গের অবস্থান ও গুণদোষ অনুসারে জীবের ব্যবহার বিশেষিত হয়, সন্দেহ নাই ; সুতরাং তাহার কর্ত্তৃত্ব যে আপেক্ষিক ও সীমাবদ্ধ তাহা স্বীকার করি। কিন্তু তাহাকে অকর্ত্তা ও অসঙ্গ বলা যায় কি? স্বয়ং পুরুষোত্তম অনুভূতি ও শক্তির আধার ; তাঁহার অঙ্গীভূত জীব তাঁহার তেজে তেজস্বী হইবে না কেন?

---

(২) গীতা ১৫।৭-৯ (৩) গীতা ৩।৩৪

পঞ্চদশ অধ্যায়ে পুরুষোত্তমের পাতৃত্ব বর্ণিত হইয়াছে, আর তাহাতে আমরা এবংবিধ প্রশ্নের উত্তর পাই। যে প্রভা রবি, শশী ও অগ্নিতে কেন্দ্রীভূত হইয়া বিশ্বপ্রকাশ করিতেছে, তাহা পুরুষোত্তমের। যে শক্তির প্রয়োগে ধরা প্রতিনিয়ত জীবের বাসযোগ্য, তাহাও তাঁহারই। চন্দ্রের স্নিগ্ধকিরণরূপে তিনি ব্রীহিযবাদি পরিপুষ্ট করেন ও সেই পুষ্ট অন্ন পরিপাকার্থ জঠরানলরূপে জীবের সহায় হন। তাহার বিষয়বোধ ও শ্রেষ্ঠ বিদ্যা উভয়ই পুরুষোত্তমের দান। জীব এইরূপে সংরক্ষিত ও সম্পন্ন হইয়া সংসারের পথে বিচরণ করে, আর এই বিচরণেও তাহার স্বাতন্ত্র্য নাই, কারণ জীব স্বভাবের বশ, স্বভাবই স্মৃতি, জ্ঞান ও বিস্মৃতির আকারে কর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত করে। ইচ্ছামূলক ও অযত্নসম্ভূত ক্রিয়ায় প্রভেদ করা হয় সত্য, কিন্তু তাহাদিগের কোনটি নিষ্কারণ নহে। সুতরাং যে চিণ্ময় পুরুষে বিচিত্র স্বভাবের বিকাশ ও তাবৎ ক্রিয়া বা পরিণামের উদ্ভব, কর্ম্ম ও কর্ম্মফল প্রকৃতপক্ষে তাঁহারই। যাহাকে অক্ষর পুরুষ ও পরা প্রকৃতি বলা হইয়াছে, তাহাই জীবের আপন(১)। আর তাহার শান্ত ভাবে স্থিতি পূর্ব্বক অনাসক্ত চিত্তে স্বভাব অনুযায়ী কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে, তাদৃশ কর্ম্মে পাপপুণ্যের রেখাপাত হয় না।

নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ও অন্ন পরিপাকের মত বহু শারীরিক ক্রিয়া আছে যাহাদিগের ব্যতিক্রমে ক্ষতি হয় অথচ তাহার জন্য কেহ দায়ী বা অনুতপ্ত হয় না। আর চক্ষুশ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া, এমন কি চিত্তবৃত্তিও পাপপুণ্যের অতীত হইতে পারে, কারণ জীব স্বরূপে ক্ষেত্রজ্ঞ; অর্থাৎ ক্ষেত্র বা উপাধির পরিণামে তাহার হ্রাসবৃদ্ধি নাই। তথাপি এই

(১) গীতা ১৫।১২—১৯

পরিণাম লক্ষ্য করিয়া জীব কামনার বশবর্ত্তী হয়। গীতা যাজ্ঞবল্ক্যের বাণী বিশদ করিয়া বলিয়াছেন,—কামনাই যাবতীয় অনর্থের মূল, সুতরাং তাহা সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়(২)। বস্তুতঃ ঈশ্বর সর্ব্বনিয়ন্তা হইলেও জীবই পাপ ও দুঃখের জন্য দায়ী, যেহেতু স্বরূপে অক্রিয় হইলেও সে কর্তৃত্ব কল্পনা করে আর অভাব না থাকিলেও কল্পিত অভাব পূরণের জন্য লালায়িত হয়। সকল মানব একরূপ নহে, সত্য ; কেহ কেহ সদ্‌গুণের অধিকারী আর কাহারও প্রবৃত্তি নিকৃষ্ট। কিন্তু তাহাদিগের অন্তরতম সত্তা নির্লিপ্ত ও নির্ব্বিকার হওয়ায় স্বাধীনতার প্রতিমা। জীব কেবল রাগদ্বেষের ইঙ্গিতে দীনতা ও পরনির্ভরতা বরণ করিয়া লয়, পরন্তু বিষয়ধ্যান হইতে প্রতি-নিবৃত্ত হইলে সে ব্যবহারের মধ্যেও স্বস্থ ও প্রসন্ন থাকিতে পারে(২)। অতএব ব্যক্তিগত দোষ ও দুঃখ কিংবা বিশ্বে ইহাদিগের প্রাদুর্ভাব বিশ্বেশ্বরের নিরপেক্ষ নিয়ন্তৃত্বের বিরুদ্ধে প্রমাণ নহে।

গীতায় ত্রিগুণের ব্যাখ্যা

কিন্তু এতাদৃশ যুক্তিতেও আমরা অন্য এক আপত্তির সম্মুখীন হই। তাহা এই,—মানবের উদ্ভব ও অবস্থিতি পুরুষো-ত্তমে হইলে সে মোহান্ধ হয় কেন বা কিরূপে ? গীতা উত্তরে বলিয়াছেন,—গুণসঙ্গ এই মোহের কারণ ; যাবৎ সঙ্গদোষ থাকে তাবৎ বন্ধন অনিবার্য্য, পরন্তু তাহা বর্জ্জন করিলে সংসারের জন্ম, মৃত্যু, জরা ও দুঃখে জীব আর বিপন্ন হয় না(৩)। তথাপি এই প্রশ্ন রহিয়া যায়,—উক্ত গুণগুলি কি আর উহা-দিগের সঙ্গই বা কিরূপ ? সুতরাং বিষয়টি বিশদ করিবার জন্য গীতা মানব প্রকৃতির আরও কিছু আলোচনা করিয়াছেন। মর্ম্ম এইরূপ :—জ্ঞানার্জ্জনে তৎপরতা ও জ্ঞানলাভে বিমল সুখ

(১) গীতা ৩৷৩৭—৪৩ (২) গীতা ২৷৬২-৬৪ (৩) গীতা ১৩৷২১, ১৪৷৫

উৎকৃষ্ট মানবের লক্ষণ ; কর্ম্মে আগ্রহ আর সম্পদ্ ও প্রতিপত্তির লালসা মাধ্যমিকে দেখা যায়, কিন্তু যাহারা নিকৃষ্ট, তাহারা নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থানের জন্য জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়কেই প্রত্যাখ্যান করে। এই ত্রিবিধ প্রবৃত্তি শাস্ত্রে ত্রিগুণ নামে প্রখ্যাত। বস্তুতঃ প্রত্যেক মনুষ্যেই ইহারা সম্বদ্ধভাবে বর্ত্তমান, কিন্তু ইহাদিগের অনুপাতে ভেদও প্রসিদ্ধ। আর এই তারতম্য মানবজাতিকে যেন ত্রিধা বিভক্ত করিয়াছে। উত্তম শ্রেণীতে জ্ঞানের অনুকূল সত্ত্বগুণ প্রধান ; মধ্যমে কামনাতুষ্ট রজোগুণ প্রবল, আর অধমে জ্ঞান ও কর্ম্মের বিরোধী তমোগুণের আতিশয্য। তবে উপাধিতেই এই লক্ষণত্রয়ের আবির্ভাব, কারণ মন ও ইন্দ্রিয়বর্গ বিষয়ের সন্ধান লয়, বিষয় আয়ত্তও করে আর আনুষঙ্গিক আয়াসের ফলে অবসাদগ্রস্ত বা আচ্ছন্ন হয়। বিশুদ্ধ আত্মভাব সাক্ষিমাত্র অর্থাৎ সুখ ও দুঃখের সমভাবে প্রকাশক ; সুতরাং আসক্তি বা বিরক্তি তাহাতে নাই। পরন্তু উক্ত ত্রিবিধ গুণ অনুসারে উপাধি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে আকৃষ্ট হয়। ইহাই গুণসঙ্গ, আর ইহার প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকিতে জীব জন্মমৃত্যুর আবর্ত্তন অতিক্রম করে না, যেহেতু প্রত্যেক দেহান্তে প্রবল প্রবৃত্তির ইঙ্গিতে উপাধি উপযোগী দেহ পরিগ্রহ করে।

অস্থিমাংসে গঠিত দেহ কর্ম্মে ও ভোগে উপাধিনিচয়ের আশ্রয় বটে ; কিন্তু দেহ অপেক্ষা ইহারা সূক্ষ্ম ও স্থায়ী, আর সত্ত্ব, রজ ও তম সামর্থ্য ও প্রবণতারূপে ইহাদিগকে ব্যবহারে নিয়োজিত করে। সুতরাং স্থূল দেহপাতে ব্যবহারিক জীবনের পরিসমাপ্তি হয় না, কেবল অনুকূল দেহলাভের ব্যবস্থা হয়(১)। বস্তুতঃ প্রত্যেক জীবের ইতিহাস কোন বিশেষিত ভাবের জন্ম-জন্মান্তরে অভিব্যক্তি। অতীতে এই ক্রমবিকাশের জন্য সে

(১) গীতা ১৪।১৪, ১৫, ১৮

বিবিধ আকারে বিভিন্ন লোকে বিচরণ করিয়াছে ও ভবিষ্যতে তাহাই করিবে। প্রকৃতিনির্দ্দিষ্ট পথ উল্লঙ্ঘন করিবার মত স্বাধীনতা তাহার নাই। তথাপি এই নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার সত্ত্বেও তাহার পক্ষে স্বস্থ ও পরিচ্ছেদমুক্ত হওয়া সম্ভব, আর এই অবস্থা গীতায় নিস্ত্রৈগুণ্য ও ব্রহ্মভাব নামে কীর্ত্তিত হইয়াছে। ইহা লাভ করা সুকঠিন বটে, কারণ গুণত্রয় বিষয়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে। কিন্তু আত্মচৈতন্যের সাম্য ও পবিত্রতা উপলব্ধি করিলে অনিত্য ও পরিচ্ছিন্ন বিষয়ে আর আস্থা থাকে না, পরন্তু আত্মার সাক্ষিমাত্র মুক্ত ভাবই কাম্য হয়(১)।

গীতা, শ্রুতির মত, জ্ঞানের উপাদেয়ত্ব প্রচার করিয়াছেন

সুতরাং গীতা শ্রুতির মতই জ্ঞানের উপাদেয়ত্ব মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। কেবল দ্রব্যত্যাগরূপ যজ্ঞ সম্পন্ন করিলে পরমার্থ লাভ হয় না, আত্মজ্ঞানের অপেক্ষা থাকে, অতএব যাবতীয় শুভকর্ম্মে তাহাই লক্ষ্য হওয়া উচিত। প্রদীপ্ত অনল যেরূপ কাষ্ঠরাশিকে ভস্মীভূত করে, তাহার মহিমায় তাবৎ পাপ ও মোহ সেইরূপ নিঃশেষে অপসৃত হয়(২)। এতাদৃশ উক্তি যে শ্রুতিসম্মত তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আত্মজ্ঞান লাভ করিবার উপায় কি? যাঁহারা জ্ঞানযোগের পক্ষপাতী, তাঁহারা বলেন,-তত্ত্বদর্শীর নিকট চরম তত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ গ্রহণ করিবে। যাবৎ সংশয় দূরীভূত না হয়, তাবৎ বিচারে প্রবৃত্ত থাকিবে। পরে শান্ত, দান্ত, উপরত ও তিতিক্ষু হইয়া সেই তত্ত্ব সাক্ষাৎকারের জন্য প্রযত্ন করিবে। অন্তঃকরণেই তাহা সম্ভব হয়; বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়ের সহযোগ আবশ্যক হয় না। সুতরাং নিপুণতা ও বীর্য্য সহকারে শর নিক্ষিপ্ত হইলে তাহা যেরূপ লক্ষ্যে বিদ্ধ হইয়া থাকে, মনকেও তদ্রূপ ধ্যেয় তত্ত্বে সমাহিত করিবে। সমাধান পূর্ণ হইলে ধ্যেয় ও ধ্যাতায়

(১) গীতা ১৪।১৯,২০,২৩

(২) গীতা ৪।৩৩,৩৭

ভেদবোধ থাকে না। তখন জ্ঞান নিস্তরঙ্গ মহোদধির মত হয়, আর এই জ্ঞানই চরমতত্ত্বের চিত্তে অভিব্যক্তি।

গীতা কিন্তু শ্রুতি অপেক্ষা স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করিয়াছেন যে ভক্তি ব্যতীত জ্ঞান সম্পূর্ণ হয় না

কিন্তু শমদমাদি গুণ কি কেবল সঙ্কল্পের বলে লাভ করা যায়? ব্রহ্মে পরানুরক্তি ব্যতীত কি বিষয়বৈরাগ্য চিত্তে প্রতিষ্ঠিত হয়? আর সমাধিনির্ম্মল চিত্তে আত্মার স্বরূপ প্রতিভাত হইলেও তাঁহার সর্ব্বব্যাপিত্ব ও সর্ব্বাধিষ্ঠাতৃত্বের সন্ধান জ্ঞানমার্গে পাওয়া যায় কি? গীতা বলিয়াছেন, দুর্ব্বৃত্তও যদি একাগ্রচিত্তে ঈশ্বরের ভজনা করে, তাহার কুপ্রবৃত্তিগুলি অচিরে অপনীত হয়, সুতরাং সাধনার পক্ষে কোন অন্তরায় থাকে না(১)। আর ভক্তির প্রভাবে প্রকাশ ও স্বরূপ উভয়ই পরিস্ফুট হয়, ইহাও গীতার অভিমত(২)। কিন্তু এ অভিমত কি শ্রুতিসঙ্গত? উপনিষৎ জ্ঞানানুশীলনে গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু জ্ঞেয় ব্রহ্মের বর্ণনা বহু স্থলেই শ্রদ্ধা ও অনুরাগে অভিষিক্ত। অতএব শাস্ত্রদ্বয়ে প্রকৃত বিরোধ নাই। প্রভেদের মধ্যে এই, গীতা স্পষ্টাক্ষরে প্রচার করিয়াছেন যে সাধনার উপক্রমে না হউক তাহার উদ্যাপনে মোহনির্ম্মুক্ত ভক্তির একান্ত প্রয়োজন, কারণ তদ্ব্যতীত পরম তত্ত্ব সম্যক্ অধিগত হন না।

অষ্টম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে,—সংসারের উচ্ছেদে তাঁহার ক্ষতি হয় না, অর্থাৎ তিনি অক্ষর আর তাঁহার এই অক্ষর ভাবে অবস্থানই জীবের পরম লক্ষ্য, কারণ অনিত্য ও দুঃখময় সংসার অতিক্রম করিবার অন্য উপায় নাই। কিন্তু প্রশ্ন হইতে পারে, অন্যের ভাবে স্থিতি সম্ভবপর কি? আর যিনি ইন্দ্রিয়-গ্রাম ও মনের অগোচর তাঁহার সন্ধান দিবে কে? সুতরাং এই সংশয় নিরসনের জন্য গীতা পরেই বলিয়াছেন,—সংসার

(১) গীতা ৯।৩০,৩১ (২) গীতা ১৮।৫৪,৫৫

ও সংসারী ঈশ্বরেই বিদ্যমান; তিনি ওতপ্রোতভাবে তাহা-দিগকে ধারণ করিয়া আছেন, সুতরাং তাঁহাতে স্থিতি জীবের পক্ষে অসম্ভব নহে(১)। চিত্তের সঙ্কীর্ণতা বা মোহ এই তত্ত্ব আবৃত করায় জীব স্বাতন্ত্র্য কল্পনা করে। কিন্তু অনন্যা ভক্তি সেই আবরণ উন্মোচন করিলে ভগবৎজ্ঞান সম্পূর্ণ হয়, আর তখন শ্রেয়োলাভে কোন অন্তরায় থাকে না।

পক্ষান্তরে এই চরম তত্ত্ব সম্বন্ধে ভক্তিবর্জ্জিত বুদ্ধির নির্দ্দেশ সুস্পষ্ট ও দ্বিধাবর্জ্জিত হওয়া অসম্ভব, কারণ নির্ব্বিশেষ ও সবিশেষের সমন্বয়, কর্ম্ম ও অকর্ম্মের বিরোধভঞ্জন তাহার সাধ্যাতীত। বুদ্ধি জ্ঞাতৃজ্ঞেয় ভেদ অতিক্রম করে না ও নিষেধমুখে বিষয় নির্ণয় করে। আলোক অন্ধকার নহে, শ্বেত পীত নহে, এইরূপই তাহার অবধারণ। সুতরাং আলোক ও অন্ধকার, শ্বেত ও পীত, সকলই যাঁহার অন্তর্গত, তাঁহার সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট জ্ঞান দিতে বুদ্ধি অক্ষম। এমন কি, সর্ব্ববৃত্তিনিরোধ-রূপ তাহার শ্রেষ্ঠ চেষ্টায় এই নিবিড় রহস্যের উদ্‌ঘাটন হয় না, যেহেতু প্রশান্ত, অপরিচ্ছিন্ন আত্মতত্ত্বে চিত্ত সমাহিত হইলে, দৃশ্যবর্গের সংখ্যাতীত বৈচিত্র্য অন্তর্হিত হয়। কিন্তু ঈশ্বর সর্ব্বাতিগ হইয়াও সর্ব্বগত, কারণ তাঁহার সত্তায় অন্য সকলে সত্তাবান। তিনি ক্ষরভাবের অতীত,সত্য, কিন্তু অক্ষরে তাঁহার মহিমার পরিচয় নাই। জিজ্ঞাসুকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে তিনি এই জিজ্ঞাস্যের অন্তর্গত, সুতরাং ইহার নিরূপণে স্বভাবতঃ অসমর্থ। সামগ্র্য কি অংশের পরিমেয়? প্রমাণের এই সঙ্কীর্ণতা বা অক্ষমতা অঙ্গীকার করিয়া গীতা তাহার কারণও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বলা হইয়াছে,—দেবতা ও মহর্ষিগণ এই পরম তত্ত্বকে সম্পূর্ণরূপে জানেন না, যেহেতু তাঁহারা ইঁহার

(১) গীতা ৮।২০-২২

বিকাশমাত্র। ইনি কি তাহা হইলে অজ্ঞেয়? না, ভক্তির প্রভাবে ইঁহার সম্বন্ধে নিশ্চয় ও নির্দ্দোষ ধারণা হয়। আপত্তি হইতে পারে, বুদ্ধিবৃত্তিই জ্ঞানলাভের শ্রেষ্ঠ উপায়; সুতরাং বুদ্ধি যে তত্ত্ব অবধারণে অসমর্থ, অন্ধ আবেগ কি তাহা নির্ণয় করিতে পারে? গীতা কি ভক্তির প্রাধান্য স্বীকার করিয়া অবশেষে রহস্যবাদ প্রচার করিয়াছেন?

ভক্তির রূপ ও নির্দ্দেশ

এবংবিধ সংশয় নিরসনার্থ ভক্তিতত্ত্বের কিঞ্চিৎ আলোচনা বাঞ্ছনীয়। জীবজগতে পিতামাতা ভক্তিভাজন, পুত্রকলত্র স্নেহাস্পদ, মিত্রপরিজন আদরের অধিকারী। সুতরাং ভক্তির বৈশিষ্ট্য স্থির করিবার জন্য পাত্রের গুণ ও ব্যবহার আলোচ্য। পিতামাতার শাসন ও পালনের স্মৃতি, তাঁহাদিগের দূরদর্শিতা ও ন্যায়পরতার পরিচয়, পদে পদে তাঁহাদিগের নিঃস্বার্থ অনুগ্রহের প্রমাণ ও পক্ষান্তরে স্বীয় অজ্ঞতা ও পরনির্ভরতা পুত্রের চিত্তে ভক্তির বীজ বপন করে। বাল্যে ইহা অঙ্কুরিত হয়; পরে পিতামাতার ব্যবহার ও পুত্রের প্রকৃতি ইহাকে শীর্ণ বা দৃঢ় করে। সুতরাং জড় পদার্থ যে ভক্তি আকর্ষণ করিতে পারে না, তাহা স্পষ্ট। গুরু, প্রভু, সুহৃৎ ব্যবহারে পিতৃতুল্য হইলে ভক্তির পাত্র হইয়া থাকেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু সংসারে পিতামাতাই মুখ্যতঃ ভক্তির পাত্র, কারণ তাঁহাদিগের দৈনন্দিন আনুকূল্য ব্যতীত জীবনধারণ অসম্ভব হইত, অথচ তাঁহারা প্রতিদান বা স্তুতির প্রত্যাশা করেন নাই। তথাপি এই ভক্তি নিরতিশয় হয় না, যেহেতু আদর্শ পিতামাতার মধ্যেও জীবের সঙ্কীর্ণতা ও দৌর্ব্বল্য বর্ত্তমান।

ধর্ম্মজীবনেও পারতন্ত্র্যবোধ ও কৃতজ্ঞতা ভক্তির উপাদান। কিন্তু প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অভাবে ভজনীয় সম্বন্ধে অযুক্ত ধারণা ও স্বার্থপরতা উপধাতুরূপে উহাকে মলিন করে। ফলে, নানা-

প্রকার কামনার প্ররোচনায় বিভিন্ন দেবতার অর্চ্চনা প্রবর্ত্তিত হয়(১)। অর্চ্চিত দেবগণ যে ঈশ্বরের বিবিধ প্রকাশমাত্র এ বোধ তখন থাকে না, আর উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য আগ্রহ- কৃতজ্ঞতাকে ক্ষুণ্ণ করে। যাঁহারা ঈশ্বর সম্বন্ধে যোগ্যতর ধারণা পোষণ করেন, তাঁহারাও সাধারণতঃ আর্ত্তিদূর হইবে এই আশায় কিংবা সম্পদ্ বা জ্ঞান লাভের জন্য আরাধনায় রত হন(২)। কিন্তু সুকৃতির ফলে যাঁহাদিগের সকল কুপ্রবৃত্তি অপগত হইয়াছে, যাঁহারা যোগ অভ্যাস পূর্ব্বক অনুরাগ, বিদ্বেষ ও ভয়ের অতীত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের ভক্তি অমল ও অচল হয়, আর তাদৃশ ভক্তির মহিমায় তাঁহারা ভজনীয়ের প্রকাশ ও স্বরূপ, কর্ম্ম ও অক্রিয়ভাব সকলই জানিতে পারেন(৩)।



প্রতিবাদী হয় ত বলিবেন, হৃদয়ের আবেগে ভক্ত যে গুণাবলী আরোপ করেন, সে সকলই যে ভজনীয়ে থাকিবে, এমন কোন নিয়ম নাই। কিন্তু গীতায় যে ভক্তি কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা ভাবপ্রবণ চিত্তের অনিয়ন্ত্রিত উচ্ছ্বাস নহে। চিত্ত অহঙ্কার ও মমতা বর্জ্জিত হইলে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ দুঃখ বা কামনা তাহাতে আর বিক্ষোভ সৃষ্টি করে না। তাদৃশ শান্ত ও নির্ম্মল চিত্তেই পবিত্র ভগবদ্ভক্তির উদয় হয় আর সেই ভক্তির প্রভায় ভগবান পরিজ্ঞাত হন(৪)। তখন প্রতীতি হয়,—শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্তভাব ঈশ্বরে চিরপ্রতিষ্ঠিত; কিন্তু এই নীরব, নিষ্ক্রিয় ভাবে ভগবৎতত্ত্বের পূর্ণ পরিচয় নাই, কারণ তিনি যে সর্ব্বত্র ওতপ্রোতরূপে বিদ্যমান, ইহাই ভক্তির শ্রেষ্ঠ নির্দ্দেশ। তাবৎ পরিণামী পদার্থের তিনি নিত্য ও অবিকারী

(১) গীতা ৭।২০ (২) গীতা ৭।১৬

(৩) গীতা ৭।১৮-৩০ (৪) গীতা ১৮।৫৪,৫৫

আশ্রয়, তাঁহার ন্যায়ানুগত শাসনে সংসার চিরতরে প্রবর্ত্তিত, আর তাঁহাতে অবস্থিতি করিতে পারিলেই শাশ্বত ও অবিমিশ্র সুখ বা শান্তি লাভ হয়।

প্রমাণপ্রিয় ব্যক্তি বলিয়া থাকেন,—এতাদৃশ বিশ্বাসের ভিত্তি কোথায়? সংসারসাগরে নিপতিত দুঃস্থ ও দুর্ব্বল মানবের ইহা কি অকারণ কল্পনা নহে? বাস্তবের নির্ম্মম নিপীড়নে আর এই কল্পিত কল্যাণ ও পূর্ণতায় অসঙ্গতি সুস্পষ্ট। ভক্তি কি ইহাদিগের সামঞ্জস্য প্রদর্শনে সমর্থ? কিন্তু ভক্তি সমন্বয়ের জন্য ব্যগ্র নহে। ভজনীয়ের প্রতি ভক্তের মনোভাবই ভক্তি। বহু ক্ষেত্রে তাহা অপবিত্র ও সঙ্কীর্ণ হয়। কিন্তু মলিনতা ও সঙ্কীর্ণতা বর্জ্জিত হইলে তাহার সাক্ষ্য অগ্রাহ্য হইবে কেন? ইন্দ্রিয়গুলি বহির্জগতের বার্ত্তা বহন করে, আর তাহারা নিতান্ত ক্ষীণ বা বিকল না হইলে, সেই আনীত সমাচার নিঃসঙ্কোচে গৃহীত হয়। কিন্তু অতীন্দ্রিয় সত্তার সংবাদ ভক্তিই দিয়া থাকে; সুতরাং ভক্তি নির্দ্দোষ হইলে তাহার সাক্ষ্য উপেক্ষা করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। বস্তুতঃ ভক্তিই মানবচিত্তের শ্রেষ্ঠ বৃত্তি; তাহার প্রেরণায় যাবতীয় উৎকৃষ্ট কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়; অতএব তাহার বার্ত্তা সর্ব্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য। বিচার সে বার্ত্তার অর্থ প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে; পরন্তু সংশয় সমর্থনের জন্য তাহার ব্যবহার অন্যায্য, কারণ সামগ্রের পরিচয় দিতে বিচার অক্ষম। ব্যবচ্ছেদই তাহার পদ্ধতি; সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত ভেদ লক্ষ্য করিয়া তাহা তত্ত্ব অবধারণ করে; সুতরাং যাঁহাতে সকল ভেদের সমন্বয় তাঁহার সম্বন্ধে বিচারের সিদ্ধান্ত চরম নহে। আপত্তি হইতে পারে, ভক্তির নির্দ্দেশ সর্ব্বত্র একরূপ হয় না; অতএব জ্ঞানী পরীক্ষা না করিলে সে নির্দ্দেশ পরীক্ষা করিবে কে? কিন্তু যুক্তিতর্ক

ও বিশ্লেষণে পটুতা জ্ঞানীর অপরিহার্য্য লক্ষণ নহে। গীতা অন্য লক্ষণের উল্লেখ করিয়াছেন। যাঁহারা দম্ভ, দর্প, অভিমান, কাম, ক্রোধ ও লোভ পরিহার পূর্ব্বক সাম্য ও শান্তি লাভ করিয়াছেন, সুতরাং যাঁহাদিগের ভক্তি অব্যভিচারী হইয়াছে, কেবল তাঁহারাই পরম জ্ঞানের অধিকারী হন।

এই জ্ঞানের প্রশংসায় গীতা বলিয়াছেন,—ইহার মত পাবন কিছুই নাই, যেহেতু ইহার প্রভাবে জীব শাশ্বতী শান্তি লাভ করে(১)। শ্রুতির উপদেশও যে এইরূপ তাহা আমরা দেখিয়াছি। তথাপি কেহ কেহ বলেন, সাধনা সম্বন্ধে গীতা ও শ্রুতির আদেশে সঙ্গতি নাই, কারণ শ্রুতিতে জ্ঞানযোগ অর্থাৎ শ্রবণ, মনন ও ধ্যান আদিষ্ট হইয়াছে অথচ গীতার বিধানে ভক্তিই পর্য্যাপ্ত। কিন্তু কেবল জ্ঞানানুশীলনে যে অজ্ঞান নিবারিত হয় না তাহা বৃহদারণ্যক ও ঈশোপনিষৎ স্পষ্ট বাক্যে প্রচার করিয়াছেন, আর কঠ ও মুণ্ডক বলিয়াছেন যে বরণীয় বোধে আত্মার উপাসনা করিলে তত্ত্বজ্ঞান সম্পূর্ণ হয়। বস্তুতঃ কোন প্রামাণিক উপনিষদে ভক্তির প্রয়োজন উপেক্ষিত হয় নাই। পক্ষান্তরে গীতা চতুর্থ, ষষ্ঠ, ত্রয়োদশ ও অষ্টাদশ অধ্যায়ে জ্ঞানযোগ সম্বন্ধে যত্নসহকারে উপদেশ দিয়াছেন। সুতরাং এ বিষয়েও শাস্ত্রদ্বয়ে বিরোধ কল্পনা মাত্র।

জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগ, এই দ্বিবিধ সাধনার উল্লেখ গীতায় আছে আর শ্রুতিতেও এই এই বিভাগের আভাস পাওয়া যায়।

গীতা দ্বিবিধ সাধনার উল্লেখ করিয়াছেন বটে, আর একটিকে সাংখ্য, জ্ঞানযোগ ও সন্ন্যাস ও অপরটিকে যোগ ও কর্ম্মযোগ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্যও সাধনার এতাদৃশ বিভাগ লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাঁহার নির্দ্দেশের মর্ম্ম এইরূপ—জীবহৃদয়ে আত্মার বিশেষ অধিষ্ঠান হইলেও তিনি বিশ্বের অধিপতি সুতরাং সংসারী বেদাধ্যয়ন, তপশ্চর্য্যা, দান ও

(১) গীতা ৪।৩৮, ৩৯

ব্রতপালন দ্বারা তাঁহারই অর্চ্চনা করেন ও এবংবিধ প্রচেষ্টার ফলে ধনরত্ন সম্পন্ন হন; পরন্তু সন্ন্যাসী ভিক্ষাচর্য্যা ব্যতীত যাবতীয় কর্ম্ম পরিহার পূর্ব্বক আত্মার শান্তভাবে সমাহিত থাকেন ও ফলে নির্ভয় হন অর্থাৎ সংসারে কিছুই তাঁহাকে সন্তপ্ত করিতে পারে না(১)। যাজ্ঞবল্ক্যের এই নির্দ্দেশ গীতায় কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ঈশ্বরার্থ অনুষ্ঠিত হইলে যজ্ঞাদি শুভকর্ম্মও পরমার্থ লাভের উপায় হয়। উদ্যম উদ্দেশ্যকে অতিক্রম করে না বলিয়াই বিত্তাদি প্রাপ্তির জন্য তাহাদিগের অনুষ্ঠান নিঃশ্রেয়স লাভে বঞ্চিত হয়। কিন্তু বিহিত কর্ম্ম কখনই ত্যাজ্য নহে যেহেতু স্বয়ং ঈশ্বর স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াও সতত কর্ম্মে নিযুক্ত আছেন। সুতরাং অভিজ্ঞ কর্ম্মী কোন কামনা পোষণ করে না, আর প্রকৃত সন্ন্যাসী ফলের অপেক্ষা না রাখিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করেন। মূঢ় ব্যক্তিই সাংখ্য ও যোগ বিসদৃশ বোধ করে; তাহাদিগের মধ্যে মৌলিক ভেদ নাই। প্রকৃতি অনুসারে কেহ কেহ জ্ঞানানুশীলনে গুরুত্ব আরোপ করেন, আর কেহ বা চিত্তশুদ্ধিকর কর্ম্মে বিশেষ আস্থাবান হন। ইহাই প্রভেদ, নতুবা উভয়ের উদ্দেশ্য অভিন্ন, উদ্যমেও সামঞ্জস্য বর্ত্তমান, কারণ জ্ঞানানুশীলনও প্রকৃতপক্ষে কর্ম্ম আর অন্যপ্রকার কর্ম্ম কামনাবর্জ্জিত হইলে তাহাও পরম জ্ঞানলাভের হেতু হয়।

কিন্তু গীতা কর্ম্মযোগের পক্ষপাতী।

তথাপি মানবের অবস্থান ও প্রকৃতি লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে, কর্ম্মযোগই তাহার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। দেহ থাকিতে অল্পাধিক বিষয়চিন্তা ও ব্যবহার অনিবার্য, আর ইহারা অক্ষর ও অনির্দ্দেশ্য তত্ত্বের অনুচিন্তনে অন্তরায় (২)। পক্ষান্তরে শ্রদ্ধাবনতচিত্তে সকল কর্ম্ম ও ভোগ ঈশ্বরে অর্পণ অপেক্ষাকৃত

(১) বৃহদারণ্যক ৪।৪।২২, ২৪ (২) গীতা ১২।৫

সুকর। আর এক কথা, ঈশ্বরই পূর্ণ তত্ত্ব, যেহেতু তাঁহাতে স্বরূপ ও প্রকাশ উভয়ই বিদ্যমান। সুতরাং তত্ত্বদর্শীও প্রাণি-জাতের হিতে রত থাকিয়া নির্ব্বাণ লাভ করেন। বস্তুতঃ ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তিতেও তাঁহার সাধনা সম্পূর্ণ হয় না; অবশেষে পরা ভক্তির প্রেরণায় ঈশ্বরের উদ্দেশে স্বীয় স্বাতন্ত্র্য নিঃশেষে বিসর্জ্জন দিয়া তিনি কৃতকৃত্য হন।

গীতায় ভক্তি-যোগ তৃতীয় সাধনারূপে আদিষ্ট হয় নাই, যদিও বলা হইয়াছে ভক্তি ব্যতীত কোন সাধনাই সম্পূর্ণ হয় না।

ভক্তির এই মহিমা স্মরণ করিয়া কেহ কেহ বলেন, উক্ত দ্বিবিধ নিষ্ঠা ব্যতীত ভক্তিযোগ তৃতীয় সাধনারূপে গীতায় উপদিষ্ট হইয়াছে। আর সাধনার এবংবিধ বিভাগের সপক্ষে অন্য যুক্তি এই:—ভক্তিযোগ শব্দটি চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে আছে ও নবম অধ্যায়ে ভক্তগণের চিরাভ্যস্ত কীর্ত্তন ও নমস্কারের প্রশস্তি আমরা পাই। কিন্তু গীতা বুদ্ধিযোগ ও ধ্যানযোগের উল্লেখ করিয়াছেন, অথচ ইহারা পৃথক্ সাধনারূপে পরিগণিত হয় নাই। আর প্রণতি ও মহিমাকীর্ত্তন ভক্তিপ্রকাশের সরল ও স্বাভাবিক উপায় বলিয়া প্রায় সকল সম্প্রদায়েই আদৃত; সুতরাং তাহাদিগের প্রশংসায় যে স্বতন্ত্র সাধনার নির্দ্দেশ আছে, তাহা বলা যায় না। বস্তুতঃ পরমাত্মায় চিত্ত সমাধানই গীতার মুখ্য উপদেশ আর তাহা ভক্তি ব্যতীত সম্পূর্ণ হয় না; অতএব ভক্তি জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগ উভয়েরই অন্তরঙ্গরূপে গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু জ্ঞান ও কর্ম্ম বিযুক্ত ভক্তি যে নিঃশ্রেয়সের উপায় হইতে পারে তাহা স্বীকৃত হয় নাই, বরং বলা হইয়াছে, অনন্যচিত্তে ভজনার জন্য দৈবী প্রকৃতি সাধারণতঃ আবশ্যক, আর এই প্রকৃতি উন্নত জ্ঞানে ও কর্ম্মে আত্মপ্রকাশ করে।

এই তুলনামূলক আলোচনায় আমাদের শেষ প্রশ্ন—গীতার মতে নিঃশ্রেয়স কিরূপ? দ্বিতীয় ও পঞ্চম অধ্যায়ে

গীতায় সাযুজ্য ও সারূপ্য এই দ্বিবিধ মুক্তির উল্লেখ আছে।

তাহাকে ব্রহ্মনির্ব্বাণ বলা হইয়াছে। ব্রহ্মভাব বা ব্রাহ্মীস্থিতি তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা। কামনা, মমতা ও অহঙ্কার বিলুপ্ত হইলে চিত্তবিক্ষেপের আর সম্ভাবনা থাকে না। এই শান্ত, প্রসন্ন ভাবই ব্রাহ্মীস্থিতি। সুখ দুঃখের অতীত এই অবস্থা; সুতরাং জিজ্ঞাস্য সম্যক্ সিদ্ধির জন্য আর কি প্রয়োজন? ব্রহ্মে জীবের স্বাতন্ত্র্য লোপই ব্রহ্মনির্ব্বাণের সঙ্গত অর্থ, আর একাদশ, দ্বাদশ ও অষ্টাদশ অধ্যায়ে এই সাযুজ্য অনন্যা ভক্তির শ্রেষ্ঠদানরূপে বর্ণিত হইয়াছে (১)। কিন্তু চতুর্থ ও চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে সারূপ্যের উল্লেখও আমরা পাই (২)। অতএব সংশয় হয়—নিঃশ্রেয়স কি দ্বিবিধ হইতে পারে?

সাযুজ্যের বিরুদ্ধে যুক্তি পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী যুগে তাহা নানাপ্রকার তর্কে পল্লবিত হইলেও মৈত্রেয়ীর আপত্তিই তাহার সারভূত। মৃত্যুর পরে কৃতকৃত্য ব্যক্তির আর সংজ্ঞা থাকিবে না, ইহা সিদ্ধি নহে, শোচনীয় পরিণাম, তাঁহার এবংবিধ ধারণা হইয়াছিল। কিন্তু দ্বৈতভাব যদি আবেষ্টনের মত পীড়ন করে, তাহা হইলে উহার বিলোপ নিমজ্জন নহে, নিষ্ক্রমণ। সারূপ্যের সমালোচক বলেন,—সংসারনিবৃত্তিই মোক্ষ যেহেতু সংসার দুঃখের আলয়, কিন্তু কর্ম্ম থাকিতে সংসারের নিবৃত্তি নাই, কারণ কর্ম্মমাত্রেই ফলপ্রসূ; সুতরাং ঈশ্বরের ভাব অর্থাৎ স্রষ্টৃত্ব এবং পাতৃত্ব ও শাস্তির উদ্দেশ্যে বর্জ্জনীয়। কিন্তু কর্ম্মে আগ্রহ ও ফলে আসক্তিই বন্ধনের হেতু; পরহিতার্থে নির্লিপ্তভাবে কর্ম্ম করিলে বন্ধনের আশঙ্কা অপনীত হয়। গীতা বলিয়াছেন, মুক্ত পুরুষের জন্ম ও কর্ম্ম দিব্য, অর্থাৎ তাঁহার আবির্ভাবে ও আচরণে কর্ম্মজনিত মোহ ও দুঃখভোগ নাই। সুতরাং

(১) গীতা ১১।৫৫, ১২।৮, ১৮।৫৫ (২) গীতা ৪।১০, ১৪।২

গীতার মতে সাযুজ্য ও সারূপ্য উভয়ই নিঃশ্রেয়স, যদিও প্রকৃতি অনুসারে কেহ নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধির পক্ষপাতী আর কেহ বা অনাসক্ত চিত্তে চিরকাল জনহিতকর কর্ম্মসম্পাদনের। কিন্তু শ্রুতির উপদেশও কি এইরূপ? উপনিষদের নানাস্থলে সাযুজ্যের সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে, কিন্তু সারূপ্যের নাই। তথাপি রাজর্ষি প্রবাহণ ও চিত্রের উপদেশে সারূপ্যের আভাস আমরা পাই।

গীতা সাংখ্যের মত দেহাত্ম-বোধের অসারতা প্রচার করিয়াছেন।

শ্রুতির সহিত গীতার সঙ্গতি প্রদর্শিত হইল। অন্য একটি শাস্ত্রের প্রভাব গীতায় পরিস্ফুট। দশম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে,—সিদ্ধগণের মধ্যে কপিলই শ্রেষ্ঠ, অতএব তিনি ঈশ্বরের বিভূতি মধ্যে গণ্য। দ্বিতীয় অধ্যায়ে অর্থাৎ উপদেশের আরম্ভেই আমরা এবংবিধ স্তুতির হেতু পাই। অর্জ্জুনের দুশ্চিন্তা অপনয়নার্থ বলা হয়,—প্রিয়জনের দেহনাশ হইবে এই আশঙ্কায় ক্ষুব্ধ হইও না; কেবল দেহ কেন, যাবতীয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুই অনিত্য, ক্ষণভঙ্গুর; সুতরাং উহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া অন্তরস্থ অবিকারী আত্মতত্ত্বে অবহিত হও, কারণ তাহাই শ্রেয়োলাভের প্রকৃষ্ট পন্থা। শ্রুতিতে এই প্রকার নিত্যানিত্যবিবেকের বার বার উল্লেখ থাকিলেও কপিল প্রবর্ত্তিত সাংখ্যবিদ্যায় ইহা সবিশেষ আলোচিত হইয়াছে; বস্তুতঃ দেহাত্মবোধের অযৌক্তিকতা অন্যত্র এরূপ বিশদ হয় নাই। সুতরাং ব্যাকুল ও অনবস্থিতচিত্ত অর্জ্জুনকে সাংখ্যের নির্দ্দেশ অনুসারে নিম্নোক্ত প্রবোধ দেওয়া হইয়াছিল।

প্রতিপক্ষরূপে উপস্থিত যোদ্ধৃবর্গের মধ্যে কেহই বিনষ্ট হইবে না, তাহাদিগের রূপান্তর ঘটিবে মাত্র। আর দেহীর রূপান্তর অনিবার্য্য, সুতরাং প্রতিকার বা পরিতাপের অবকাশ নাই। প্রশ্ন হইতে পারে, এতাদৃশ রূপান্তরের নিমিত্ত হওয়া

কি দোষাবহ নহে ? স্বার্থসিদ্ধির জন্য শত্রুবধেও দোষ হয় বটে ; কিন্তু কর্ত্তব্য যাহাই হউক না কেন, লাভালাভের প্রতি উদাসীন হইয়া তাহা পালন করিলে পাপ স্পর্শ করে না। বস্তুতঃ অস্থায়ী ও অকিঞ্চিৎকর সুখের জন্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া মানব জন্ম জন্ম বিষয়জালে আবদ্ধ থাকে ; পরন্তু যাঁহারা ধীর অর্থাৎ সুখদুঃখে সমভাবাপন্ন, তাঁহারা প্রকৃত অমৃতত্ব লাভ করেন।

সাংখ্যের দুঃখবাদ গীতা গ্রহণ করিয়াছেন।

গীতা সাংখ্যের দুঃখবাদ গ্রহণ করিয়াছেন। এ বিষয়ে সাংখ্যের আলোচনা বিস্তৃত ; নিম্নে তাহার মর্ম্ম দিলাম। মানব ত্রিবিধ দুঃখের অধীন(১)। তাহার দেহ ও মন কালবশে দুর্ব্বল হয় ; সুতরাং জরা ও মরণরূপ অশুভ পরিণতি তাহার পক্ষে অনিবার্য্য। অন্যান্য জীব তাহার হিংসা করে, আর এই হিংসার ফলে সে বিপন্ন হয়। অতিবৃষ্টি ও বন্যার মত বহুবিধ নৈসর্গিক উপদ্রবও তাহাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, পরন্তু ইহাদিগকে প্রতিরোধ করিবার মত সামর্থ্য তাহার নাই। আর লৌকিক উপায়ে দীর্ঘায়ুলাভ, শত্রুদমন ও ক্ষতিপূরণ সম্ভব হইলেও উক্ত দুঃখত্রয়ের ঐকান্তিক উচ্ছেদ অসম্ভব। বেদে অলৌকিক উপায়ের সন্ধান আছে সত্য, ও বেদবিহিত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে দুঃখের উপশম হয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাও সাময়িক ও আংশিক, যেহেতু সকাম কর্ম্মমাত্রেই সদোষ, তাহার ফল ও সঙ্কীর্ণ (২)। প্রতিবাদী হয়ত বলিবেন,—জীবন দুঃখহীন না হইলেও সুখবহুল হইতে পারে আর তাদৃশ জীবনও বাঞ্ছনীয়। কিন্তু এই ধারণা আত্মপ্রবঞ্চনা মাত্র ; দুঃখের অভিঘাতে ইহা যথাকালে নৈরাশ্যে পরিণত হয়। বস্তুতঃ অনাবিল সুখ

(১) সাংখ্যকারিকা ১ ; সাংখ্যসূত্র ১।১

(২) সাংখ্যকারিকা ২ ; সাংখ্যসূত্র ১।২-৬

কোথায়? ভোগকালে ভোগরত ইন্দ্রিয়ের ও ভোগ্যবস্তুর পরিণাম বশতঃ যে অতৃপ্তি বা অনুপশান্তি অনুভূত হয়, তাহা দুঃখেরই রূপান্তর। আর ভোগ যে নিরবচ্ছিন্ন হইবে এ সম্ভাবনা না থাকায়, ভোগে বঞ্চিত হইবার আশঙ্কা ভোগসুখকে তিক্ত করে। অধিকন্তু ভোগের স্মৃতি পরে লালসা বা ভোগতৃষ্ণার হেতুভূত হয়, আর তৃষ্ণা কখন সুখকর নহে। সুতরাং তথা-কথিত সুখ বর্ত্তমানে দুঃখদিগ্ধ ও ভবিষ্যতে দুঃখপ্রসূ, অর্থাৎ ইহ জীবন সর্ব্বাবস্থায় দুঃখময়(১)।

কিন্তু পুণ্যফলে স্বর্গলোক লাভ করিলে দুঃখের অবসান হইবে না কি? না, যাবৎ জীব ভোগে রত থাকিবে, তাবৎ দুঃখ অবশ্যম্ভাবী। তাহার করণবর্গ সত্ত্ব, রজ ও তমের অনুগত, আর এই গুণত্রয়ের অচ্ছেদ্যযোগে ও পরস্পরবিরোধে সুখের পরে দুঃখ ও দুঃখের পরে অবসাদ অনিবার্য্য হয়। তথাপি স্বর্গে সুখের আতিশয্য স্বীকৃত; কিন্তু পুণ্যকর্ম্মের তাদৃশ ফলও নশ্বর। সুতরাং তাহার ক্ষয় হইলে পূর্ব্বকৃত অপুণ্যের আকর্ষণে দুঃখবহুল লোকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়(২)। সাংখ্যের দুঃখবাদ এইরূপ; গীতার অনুযোগ নিম্নে ব্যাখ্যাত হইল। ইহলোক অনিত্য ও দুঃখপূর্ণ(৩)। সুখসম্পদের আশায় বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রকৃত সন্তোষ বা শান্তি নাই; পরন্তু নানাবিধ কামনার দৌরাত্ম্যে চিত্ত নিয়ত বিক্ষিপ্ত থাকে(৪)। পুণ্যবলে স্বর্গলাভ হইলেও দিব্যভোগে পুণ্যক্ষয় হয়(৫)। এমন কি, অসাধারণ সুকৃতির প্রভাবে ব্রহ্মলোকে গমন করিলেও কল্পক্ষয়ে প্রত্যাবর্ত্তন সুনিশ্চিত(৬)। সুতরাং এই গতাগতির ফলে সংসার সাগরের মতই দুস্তর অথচ ইহাতে

(১) যোগসূত্র ২।১৫ (২) সাংখ্যকারিকা ৫৪,৫৫ (৩) গীতা৯ ৩৩
(৪) গীতা ২।৪২ ৪৪ (৫) গীতা ৯।২০,২১ (৬) গীতা ৮।১৬

জরা, ব্যাধি ও অন্যান্য দুঃখ পুনঃ পুনঃ ভোগ করিতে হয়। গীতা এইরূপ বলিয়াছেন, অর্থাৎ সাংখ্যের উপপত্তিগুলি সমুদায় গ্রহণ করিয়াছেন ; কেবল কর্ম্মতত্ত্বের বিস্তৃত বিচারে প্রবৃত্ত হন নাই। তাহার আবশ্যকও ছিল না, কারণ আসন্ন যুদ্ধে জয়ী হইলেও সুখভোগে বঞ্চিত হইবেন. এই আশঙ্কা অর্জ্জুনকে দুঃখবাদ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত করিয়াছিল।

কিন্তু সাংখ্য দুঃখবাদ প্রচার করিয়া নিরস্ত হন নাই ; আর্ত্ত জীবের ব্যবহার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা পূর্ব্বক দুঃখ-নিবৃত্তির উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই পরীক্ষা সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি, কারণ ইহার ফল শাস্ত্রে ও দর্শনে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব নামে সুপ্রসিদ্ধ আর গীতাও তাহা সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগে যিনি সাংখ্যসম্মত সাধনার বলে এ বিষয়ে অভিজ্ঞ তাঁহারই উপদেশ অবলম্বনে বিবৃতিটি দেওয়া হইতেছে।

সাংখ্যীয় পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের বিবরণ।

বাহ্য ও আন্তর জগতের আদান প্রদানে ব্যবহারিক জীবনের উৎপত্তি ও বিকাশ। ইন্দ্রিয়প্রণালী ইহাদিগকে সংযুক্ত করে, ও এই সংযোগের ফলে বহির্জগৎ হইতে অন্তরে বিচিত্র ও অস্থির শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধের সন্ধান আসে। সুতরাং অনুমান এই,—উক্ত জগৎ শব্দময়, স্পর্শময়, রূপময়, রসময় ও গন্ধময় পদার্থের সমাবেশ ও ইহাদিগের প্রত্যেকটি পরিণামী। ইহাদিগকে যথাক্রমে আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও ক্ষিতি বলা হইয়াছে, ও একত্র ইহারা মহাভূত নামে প্রসিদ্ধ। কিন্তু এই আখ্যাগুলি পারিভাষিক ; ইহাদিগের প্রচলিত অর্থ গ্রহণ করিলে তত্ত্ব সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা হয়। বস্তুতঃ বিক্ষিপ্ত চিত্তে এই তত্ত্বগুলির সম্যক্ পরিচয় লাভ অসম্ভব। ধ্যানেই ইহারা প্রত্যক্ষ হয়, অর্থাৎ ইহাদিগের

প্রকৃত রূপ পৃথক্ পৃথক্ প্রকাশ পায়। পরে বিচার দ্বারা ইহারা প্রত্যেকে যে সূক্ষ্মতর বস্তুর প্রচয় তাহা অনুমিত হইলে, গভীরতর ধ্যানে এই সূক্ষ্মতর উপাদানগুলির স্বরূপ প্রতিভাত হইয়া থাকে। ইহারা দেশে বিস্তৃত নহে, কেবল ক্ষণমাত্র-ব্যাপী ও অনুভবে তারতম্য বর্জ্জিত। সুতরাং শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র প্রভৃতি নামে ইহারা প্রখ্যাত। বহিঃস্থ ভাব-বর্জ্জিত অথচ কালাবচ্ছিন্ন হওয়ায় ইহারা অনুমান, সঙ্কল্পাদি মনোবৃত্তির মত; কিন্তু পরপ্রদত্ত অর্থাৎ স্বতন্ত্রশক্তি প্রসূত বোধ হওয়ায় ইহাদিগের অন্তর্ভাব সম্পূর্ণ নহে।

আপত্তি হইতে পারে,—তন্মাত্রের প্রচয়ে ভূতগণের উৎপত্তি, সুতরাং পৃথক্ তত্ত্বরূপে উহাদিগের পরিগণন অনাবশ্যক। ভূতগুলি কিন্তু দেশে বিস্তৃত ও সুখদুঃখের অব্য-বহিত হেতু আর তন্মাত্র তাহা নহে; অতএব তত্ত্ব নির্দ্দেশে ইহারা বিভিন্ন স্তর বলিয়াই গণ্য। পরন্তু ভৌতিক বা সচরাচর অনুভূত দ্রব্যসমূহ পৃথক তত্ত্ব নহে, যেহেতু তাহারা দেশে বিস্তৃত ও কালে বিকৃত পঞ্চ মহাভূতের বিভিন্ন সঙ্ঘাত বা সন্নিবেশ মাত্র। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ইন্দ্রিয়প্রণালী বাহ্য ও আন্তর জগতে যোগ স্থাপন করে; কিন্তু এই প্রণালীনিচয়ও রূপরসাদির সঙ্ঘাত, অর্থাৎ বহির্জ্জগতের অন্তর্ভুক্ত। প্রকৃত অন্তর্জ্জগতের আরম্ভ বহির্জ্জগতের অনুভূতিতে। তন্মাত্রও সাক্ষাৎকার অভ্যস্ত হইলে, পরীক্ষক বিষয়গ্রহণে যে শক্তি নিয়োজিত হয় তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। ফলে তন্মাত্রও তখন দৃষ্টিপথ হইতে অপসৃত হইতে থাকে ও, সেই সঙ্গে অস্মিতার বহির্ম্মুখ চেষ্টার ক্রমশঃ অবসান হয়। পরে ধ্যান শ্লথ হইলে, তিনি উপলব্ধি করেন, ঐ কেন্দ্রীভূত বা সংযত অস্মিতা বিষয়ের অভিমুখে ও উপযুক্ত প্রণালী অবলম্বনে

অগ্রসর হইতেছে। সুতরাং জ্ঞান হয়, পরিণামী অস্মিতাই পঞ্চবিধ বিষয় গ্রহণার্থ পঞ্চরূপে বহির্ম্মুখ হয়। শ্রবণের অর্থ আমি শব্দ গ্রহণ করিতেছি, দর্শনের অর্থ আমি রূপ গ্রহণ করিতেছি; ইত্যাকার অনুভব বস্তুতঃ সকলেরই হয়। আর একই অস্মিতা যে বিভিন্ন বিষয়ের অনুরোধে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে, এই জ্ঞানও প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির হইয়া থাকে। কিন্তু ধ্যানেই এই বোধ স্ফুট ও স্থায়ী হয়। এইরূপে পরীক্ষক একাদশ ইন্দ্রিয়ের পরিচয় লাভ করেন। শ্রোত্র, ত্বক্ অক্ষি, রসনা ও নাসা এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, আর বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও নামগুলির পারিভাষিক অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে; চক্ষু কর্ণ বা হস্ত পদ দেহের অঙ্গ, সুতরাং বাহ্য ভৌতিক দ্রব্য-মাত্র অর্থাৎ অন্তর্জগতের উপাদান নহে। চঞ্চল অস্মিতা বহির্জগতের সহিত বিবিধ সম্বন্ধ স্থাপনে প্রবৃত্ত হইয়া বিবিধ আকার ধারণ করে। অস্মিতার সেই বিশেষিত ভাবগুলিই প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রিয়; হস্তপদাদি তাহাদিগের আধারমাত্র। মনও ইন্দ্রিয় মধ্যে গণ্য; যেহেতু মনই চক্ষুঃশ্রোত্রাদিলব্ধ অসম্পূর্ণ বোধকে সংস্কার ও স্মৃতির সাহায্যে জ্ঞানে উন্নীত করে ও সঙ্কল্প দ্বারা কর্ম্মেন্দ্রিয়ের পরিচালক হয়।

উক্ত বিশেষিত অস্মিতাগুলির মূলে যে অবিশেষ ও অপেক্ষাকৃত অচঞ্চল অস্মিতা আছে, ইহা অনায়াসে অনুমেয়। চিত্তকে স্থিরতর করিলে সাধক এই অবিশেষ ভাব লাভ করেন। তখন কর্ম্ম থাকে না সত্য; কিন্তু চিত্তের কর্ম্ম-প্রবণতা অনুভূত হইতে থাকে। পরে বিষয়সংসর্গ বর্জ্জন করিয়া কেবল অহংতত্ত্ব বা শুদ্ধ আত্মভাবে তিনি সমাহিত হন। 'আমি' জ্ঞাতা ও 'বিষয়' জ্ঞেয়, সুতরাং ইহাদিগের

মধ্যে প্রভেদ স্পষ্ট ; তথাপি জ্ঞেয় জ্ঞাতাকে চিত্রিত ও সঙ্কীর্ণ করে, এমন কি, বিষয়ের কেবল অস্তিত্ব বোধেও জ্ঞাতা সীমাবদ্ধ হয়। কিন্তু শুদ্ধ আমিত্ব বা গ্রাহ্যবর্জ্জিত গ্রহীতা নিষ্কলঙ্ক ও নিরাবরণ। যোগসূত্রের ভাষ্যকার বলিয়াছেন, এই তত্ত্ব ভাস্বর ও আকাশকল্প অর্থাৎ অপ্রতিবদ্ধ, আর ইহাতে সমাহিত হইলে চিত্ত নিস্তরঙ্গ মহোদধির মত স্থির ও পরিচ্ছেদরহিত হয়(১)। সুতরাং শুদ্ধ অস্মিতার ধ্যানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধ্যান। তথাপি এই ধ্যেয়ও চরম তত্ত্ব নহে, যেহেতু জ্ঞাতা হইয়াও ইহা আপনি পরিজ্ঞাত হয়। বস্তুতঃ ইহাতেই পুরুষ ও প্রকৃতির মূল সংযোগ। পুরুষ বিশুদ্ধ জ্ঞাতা বা দ্রষ্টামাত্র, সুতরাং কখনই বিষয়রূপে বোধ্য নহেন। পক্ষান্তরে প্রকৃতি যাবতীয় দৃশ্যের উপাদান ; সুতরাং স্বয়ং অদৃশ্য, অথচ জ্ঞানালোকে সুখদুঃখকর দৃশ্যজাতের জননী।

তত্ত্বজ্ঞান ও চিত্তবৃত্তিনিরোধ দুঃখনিবৃত্তির উপায়।

বিশ্লেষণ ও বিচার শেষোক্ত তত্ত্বদ্বয়ের অস্তিত্ব নির্ণয়ে পরিসমাপ্ত হয়। পঞ্চ মহাভূত, পঞ্চ তন্মাত্র, একাদশ ইন্দ্রিয়, অহঙ্কার ও বুদ্ধি প্রত্যক্ষযোগ্য ; কিন্তু পুরুষ ও প্রকৃতি অনুমানের বিষয়, প্রত্যক্ষের নহে। তথাপি সাধক সংসারের জটিলতা ও অনিশ্চয়তা পরিহার পূর্ব্বক পুরুষের শুদ্ধ, শান্ত ভাবে স্থিতির জন্য যত্নবান হন। কিন্তু প্রকারান্তরেই অব্যক্ত ও অসঙ্গ তত্ত্বের সন্নিহিত হওয়া সম্ভব। সুতরাং তিনি যাবতীয় চিত্তবৃত্তি সাবধানে নিরুদ্ধ করেন, কারণ দৃশ্যাত্মক বিশ্ব চিত্তেই প্রতিফলিত হয়, আর বৃত্তিগুলিও অনুভবযোগ্য অর্থাৎ দৃশ্যের অন্তর্গত। এই সুকঠিন সাধনা সিদ্ধ হইলে অর্থাৎ নিরোধ যখন সম্পূর্ণ ও নিরন্তর হয়, তখন সাধক গুণত্রয়ের অশুভ অধিকার হইতে মুক্তিলাভ করেন। সুখ, দুঃখ ও মোহ আর

(১) যোগসূত্র ১।৩৬ (ব্যাসভাষ্য)

থাকে না, কারণ তাহারা প্রমাণাদি পঞ্চবিধ চিত্তবৃত্তির অনুষঙ্গ; থাকে কেবল পুরুষের শুদ্ধবুদ্ধভাব। শাস্ত্রে এবংবিধ মুক্তি কৈবল্য নামে প্রখ্যাত।

কিন্তু অনুমানই কি জ্ঞানের সীমা, আর কৈবল্য ব্যতীত মুক্তির অন্য রূপ নাই কি? ত্রয়োদশ অধ্যায়ে গীতা সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের উল্লেখ করিয়াছেন আর বলিয়াছেন পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়ই অনাদি(১)। চিত্তবৃত্তি নিরোধরূপ যোগের প্রশস্তিও আমরা ষষ্ঠ অধ্যায়ে পাই; এমন কি, দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তির উপায় বলিয়া ইহা আদিষ্ট হইয়াছে(২)। কিন্তু গীতার মতে ঈশ্বরই পরম তত্ত্ব, আর তাঁহার প্রতি একান্ত অনুরাগের বশে যোগ অভ্যাস করিলে ও তাদৃশ অভ্যাসে তাঁহাকেই কর্ণধাররূপে বরণ করিলে, তাঁহার সম্বন্ধে সম্যক্ ও সুনিশ্চিত জ্ঞান লাভ হয়, অর্থাৎ সে জ্ঞানে অনুমানের অপূর্ণতা থাকে না(৩)। তখন সাধক উপলব্ধি করেন, প্রকৃতি ঈশ্বরেরই শক্তি আর পুরুষ তাঁহার অংশমাত্র, সুতরাং তাঁহাকে জানিলে জানিতে কিছু অবশিষ্ট থাকে না(৪)। আর সর্ব্বতোভাবে তাঁহার শরণাপন্ন হইলে অনর্থকর অহঙ্কারের বিলোপে পরমার্থ লাভ হয়।

ঈশ্বর প্রণিধান অভ্যাসের উপায় বলিয়া গীতা ও সাংখ্যস্বীকৃত যোগদর্শনে ঈশ্বরের বর্ণনা।

এই চূড়ান্ত অদ্বৈতবাদে ও সাংখ্যের তত্ত্বনির্দ্দেশে বিরোধ মর্ম্মান্তিক নহে কি? অনেকের ধারণা সাংখ্যতন্ত্রে ঈশ্বরের স্থানই নাই। কিন্তু পাতঞ্জল যোগদর্শনে আর ব্যাসদেবকৃত তাহার ভাষ্যে ঈশ্বরের হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা আছে অথচ যোগদর্শন প্রচলিত সাংখ্যগ্রন্থগুলির মধ্যে প্রাচীনতম আর ব্যাসভাষ্য যৌক্তিকতা ও প্রসাদগুণের জন্য সুপ্রসিদ্ধ। এই মনীষিদ্বয়ের

(১) গীতা ১৩।১৯; (২) গীতা ৬।১৮-২৩

(৩) গীতা ৭।১; (৪) গীতা ৭।৪,৫

মতে ঈশ্বর পুরুষবিশেষ অর্থাৎ চৈতন্যমাত্র বা নির্গুণ ব্রহ্ম নহেন। পরন্তু চিত্তযুক্ত হইলেও তিনি নিত্যমুক্ত, যেহেতু সে চিত্তব্যাপারে জ্ঞান, ধর্ম্ম, ঐশ্বর্য্য ও বৈরাগ্যের অবধি নাই। অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান কিছুই তাঁহার অবিদিত নহে, আর চিরদিনই মানব তাঁহার জ্ঞানে জ্ঞানী ও তাঁহার ধর্ম্মে ধার্ম্মিক হইয়াছে। সন্ন্যাসী অবশ্য তাঁহার অনাবিল শান্তি ও প্রসন্নতায় দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন আর তদনুরূপ সঙ্কল্পশূন্য ও নিশ্চিন্ত ভাব আয়ত্ত করিতে যত্নবান হন। কিন্তু ভক্ত কর্ম্মী যে তাঁহার অবাধ ঈশিত্ব লক্ষ্য করিয়া সকল কর্ম্ম তাঁহাকে অর্পণ করিবেন, ইহাও স্বাভাবিক ও সঙ্গত। বস্তুতঃ অমেয় তত্ত্ব উপাস্য হইলে, উপাসকের সংস্কার ও প্রবৃত্তি অনুসারে উপাস্য সম্বন্ধে ধারণায় প্রভেদ হওয়া বিচিত্র নহে।

কিন্তু পতঞ্জলির বর্ণনায় ও ব্যাসের ব্যাখ্যায় এতাদৃশ সঙ্কীর্ণতা বা একদেশদর্শিতা নাই, যদিও নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি তাঁহাদিগের মুখ্য লক্ষ্য হওয়ায় ঈশ্বরবিষয়ক উপদেশেও কেবল সন্ন্যাসের অনুকূল তাৎপর্য্যই সচরাচর গৃহীত হয়। যাহা হউক, সূত্রকয়টির আমরা আরও কিছু আলোচনা করিব। সমাধিপাদের ত্রয়োবিংশতিতম সূত্রের ভাষ্যে বলা হইয়াছে, ঈশ্বর প্রণিধান সমাধি ও কৈবল্য লাভের অন্যতর উপায়। প্রণিধানের অর্থ প্রকৃষ্টরূপে আত্মনিবেদন। সুতরাং জ্ঞানে, কর্ম্মে ও ভোগে স্বীয় অধিকার প্রত্যাখ্যান পূর্ব্বক সকলই ঈশ্বরে অর্পণ করিলে ইহা সম্পন্ন হয়। গীতা নবম অধ্যায়ের সপ্তবিংশতিতম ও পরবর্ত্তী শ্লোকে ইহার স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন। ভাবার্থ এই,—প্রণিধানে সাধক অলীক স্বাতন্ত্র্য ঈশ্বরের উদ্দেশে বিসর্জ্জন দিয়া মুক্তির অধিকারী হন; তাঁহার কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন হয় ও পরমাত্মায় যোগ সম্পূর্ণ হয়।

ঈশ্বরের শান্ত ও প্রসন্ন ভাবই ধ্যানের উপযোগী, সন্দেহ নাই। কিন্তু এই ভাবের উপলব্ধিতে যে সমগ্র তত্ত্ব অধিগত হয় না তাহা পতঞ্জলি স্বীকার করিয়াছেন, কারণ তাঁহার মতে প্রণিধান ক্রিয়াযোগেরও অন্তর্গত, অর্থাৎ যাবতীয় কর্ম্ম ও কর্ম্মফল ঈশ্বরে অর্পণই বিধি(১)। সমাধিপাদের চতুর্ব্বিংশতিতম সূত্রে জীবের ও ঈশ্বরের কর্ম্মে ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে। জীব অনিত্য পদার্থকে নিত্য বলিয়া গ্রহণ করে; সুতরাং গুণানুসারে বিষয় তাহার অনুরাগ, বিদ্বেষ বা ভয়ের হেতু হয়, আর যত্নলভ্য বিষয়ের জন্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে চেষ্টায় কর্ত্তৃত্বাভিমান ও ফলে আসক্তি সে পোষণ করে; এই কর্ত্তৃত্ববোধ ও আকাঙ্ক্ষা কিন্তু জন্মজন্মান্তরে তাহার সুখদুঃখভোগের হেতু হয়, কারণ কর্ম্ম ও ভোগের সংস্কার আত্মবোধের আশ্রয়ে সঞ্চিত থাকিয়া অনুকূল অবস্থায় পুনরুদ্দীপিত হয়। কর্ম্মজনিত বন্ধন এইরূপ। ঈশ্বরে কিন্তু অনিত্যে নিত্যবোধরূপ মূল ভ্রান্তি না থাকায়, তাঁহার প্রকাশ বিশ্বব্যাপী হইলেও কোন প্রকাশে তাঁহার আসক্তি বা বিরক্তি নাই। বস্তুতঃ তাঁহার সমগ্র প্রকাশ একই। পূর্ণতার উহা স্বাভাবিক অভিব্যক্তি, যদিও দেশে ও কালে উহা বিভক্তের মত বোধ হয়। সুতরাং অভাবের তাড়নায় মানব যে সকল পুণ্য বা পাপ কর্ম্ম করে, তাহাদিগের মত উহা নহে, অর্থাৎ ভাবী ফলের অপেক্ষা উহাতে নাই আর ফলানুযায়ী সঙ্কীর্ণ সংস্কার উহাতে উদ্ভূত হয় না।

কিন্তু কেহ কেহ মনে করেন, উক্ত চতুর্বিংশতি সূত্রে ঈশ্বরের নিষ্ক্রিয়তা খ্যাপিত হইয়াছে। পতঞ্জলির সমগ্র উপদেশ সূত্রাকারে নিবদ্ধ, অর্থাৎ অর্থপ্রকাশের জন্য যে কয়টি

(১) যোগসূত্র ২।১ (ব্যাসভাষ্য)

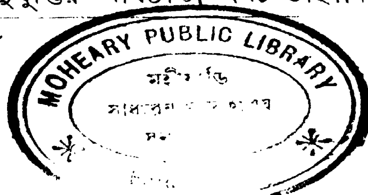
শব্দের নিতান্ত প্রয়োজন তাহার অতিরিক্ত শব্দ কোথাও ব্যবহৃত হয় নাই। অথচ ঈশ্বরকে কেবল নিষ্ক্রিয় না বলিয়া ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক ও আশয় রহিত বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ এই শব্দগুলি পারিভাষিক, ও ইহাদিগের বিশেষিত অর্থ গ্রহণ না করিলে সূত্রের তাৎপর্য্য পরিস্ফুট হয় না। অবিদ্যাপ্রমুখ পঞ্চবিধ শাস্ত্রোক্ত ভ্রান্তিকে ক্লেশ বলা হইয়াছে, যেহেতু তাহারা জীবনব্যাপী ক্লেশের মূল কারণ। ফলাভিসন্ধি পূর্ব্বক ক্রিয়া এই প্রসঙ্গে কর্ম্ম; তাদৃশ ক্রিয়ায় কর্ত্তৃত্বাভিমান সতত বর্ত্তমান, আর সম্পাদনের পরেও তাহা সংস্কাররূপে চিত্তে নিহিত থাকে, সুতরাং সুযোগমত সুকৃতি বা দুষ্কৃতিরূপে পুনঃ পুনঃ প্রকট হয়। কৃতকর্ম্মের ফলই বিপাক; চিত্তে তাহা অস্থায়ী সুখ বা দুঃখ রূপে প্রতিফলিত হয়, কিন্তু এবংবিধ অনুভবের অবসান হইলেও অনুগামী বাসনা ইহার স্থান অধিকার করে। এই বাসনা আশয় নামে অভিহিত হইয়াছে, কারণ ইহা চরিতার্থতার জন্য ইহ বা পরলোকে উপযুক্ত ভোগাধিষ্ঠান রচনায় ও তাহার স্থিতিকাল নিরূপণে সহায়ক হয়। অতএব সূত্রের মর্ম্ম এইরূপ:—ঈশ্বরে ভ্রান্তি নাই, আর কর্ম্মের সংস্কার ও ভোগের বাসনা বা আশয় তাঁহার অনুপম ঔদার্য্যকে ক্ষুণ্ণ করে না, অর্থাৎ স্বাভাবিক বিকাশের মতই তাঁহার ক্রিয়া অথচ অবিদ্যাদি না থাকায় সেই ক্রিয়া পরম জ্ঞানে উদ্ভাসিত।

সমাধিপাদের পঞ্চবিংশতিতম সূত্রে ঈশ্বরের জ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ আমরা পাই। তাৎপর্য্য এইরূপ:—প্রতি জীবে সর্ব্ববিধ জ্ঞান অর্জ্জনের সামর্থ্য বর্ত্তমান, অথচ তাহার বিকাশ সর্ব্বত্র সমান নহে। ফলে, কেহ অতি অল্পই জানে আর কাহারও বা অতীত, অনাগত ও উপস্থিত সকলই অধিগত।

ঈশ্বরে কিন্তু এই জ্ঞানশক্তির চরম উৎকর্ষ। এখন প্রশ্ন হয়,—সর্ব্বজ্ঞতা কি জ্ঞানের চরম উৎকর্ষ নহে? বিভূতিপাদের উনপঞ্চাশত্তম সূত্রে বলা হইয়াছে---যাঁহারা যোগবলে দ্রষ্টা ও বুদ্ধিতে পার্থক্য প্রত্যক্ষ করেন, তাঁহাদিগের সর্ব্বজ্ঞাতৃত্ব সিদ্ধ হয়। তথাপি কেবল ঐশ জ্ঞানের নিরতিশয়ত্ব খ্যাপিত হইয়াছে কেন? অনুমান করি, সিদ্ধ পুরুষগণ বিষয় ও বিষয়ীর ভেদ অতিক্রম করেন না, আর এই ভেদ বিদ্যমানে জ্ঞান অল্লাধিক অপূর্ণই থাকে। পরবর্ত্তী সূত্রেও এই অনুমানের যেন সমর্থন পাই, যেহেতু বলা হইয়াছে, চরিতার্থতার জন্য যোগী অবশেষে সর্ব্বজ্ঞতাকেও প্রত্যাখ্যান করেন। ঈশ্বরের কিন্তু অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্য কিছুই নাই, অথচ সর্ব্বজ্ঞতা তাঁহার লক্ষণ। এতএব এই সর্ব্বজ্ঞতা কোন কারণে হেয় হইতে পারে না। ইহার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়া গীতা বলিয়াছেন,—ঈশ্বর জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা উভয়ই; সুতরাং জগৎ তাঁহাতেই বিদ্যমান, জ্ঞাতব্যরূপে তাঁহার বাহিরে অবস্থিত নহে(১)। আর আত্মা বা ব্রহ্মের বর্ণনায় এই প্রকার নির্দ্দেশই শ্রুতি দিয়াছেন। যোগসূত্রের 'নিরতিশয়' শব্দেও ইহা সূচিত হয় নাই কি?

সমাধিপাদের ষড়্‌বিংশতি সূত্রে বলা হইয়াছে,—ঈশ্বর কেবল বর্ত্তমান সর্গে উপাস্য নহেন; পূর্ব্ব পূর্ব্ব সর্গেও তিনি উপাস্য ছিলেন, কারণ কাল তাঁহার ঈশিত্ব ক্ষুণ্ণ করে না। আর পরবর্ত্তী সূত্র দুইটিতে এই উপাসনার সঙ্কেত আছে। প্রণব ঈশ্বরের প্রসিদ্ধ নাম; অতএব এই নাম জপ ও নামের অর্থ স্মরণই বিধি। কিন্তু নামের অর্থ কি অর্থাৎ বাচ্য কিরূপ? শ্রুতি বাচকের মাত্রাগুলি পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন, বাচ্য জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির অধিষ্ঠাতা অথচ তাহাদিগের অতীত

(১) গীতা ১১।৩৮



শান্ত, প্রসন্ন ও অদ্বৈতভাবে তাঁহার দৃঢ় অবস্থান(১)। পতঞ্জলির মতে উক্ত বৈদিক নামই জপের জন্য প্রশস্ত; সুতরাং তাহার বেদানুমত অর্থ তিনি গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা সঙ্গত অনুমান। সমাধিপাদের চতুর্বিংশতি সূত্রে তাঁহাকে কর্ম্মহীন বলা হইয়াছে সত্য, কিন্তু তথায় কর্ম্মের অর্থ সঙ্কল্পজাত ও ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ ফলপ্রসূ ক্রিয়া। ঈশ্বর আত্মকাম, অতএব তাঁহার পক্ষে এতাদৃশ ক্রিয়া অসম্ভব। তথাপি কারণকার্য্যের সমষ্টি এই জগৎ যাঁহার মহিমা, তাঁহাকে অক্রিয় বলা যায় কি? বস্তুতঃ তাবৎ নৈসর্গিক ঘটনাই তাঁহার ক্রিয়া, তাঁহার পরম জ্ঞানের বিচিত্র অথচ শৃঙ্খলিত বিকাশ, যদিও সঙ্কীর্ণ দৃষ্টির ফলে তাহা সচরাচর সংজ্ঞাহীন দ্রব্যনিচয়ের সংযোগ-বিয়োগ বলিয়া প্রতীত হয়।

কোন কোন সম্প্রদায়ের মতে সংসারের সংস্রব মুক্তির পরিপন্থী; ঈশ্বর নিত্যমুক্ত সুতরাং বিশ্বব্যাপারের অতীত; অতএব তাঁহাকে কর্ম্মার্পণ ব্যপদেশমাত্র, চিত্তস্থির করিবার জন্য সত্যের সাময়িক অপলাপ। কিন্তু এতাদৃশ অভিমতে মহামুনির প্রতি অবিচার করা হয়, যেহেতু কোন উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য সত্যের মত মহাব্রত লঙ্ঘন তাঁহার অভিপ্রেত নহে। কেহ কেহ বলেন, নারায়ণ বা সগুণ ব্রহ্মে কর্ম্মার্পণ ও ঈশ্বরের ধ্যান পূর্ণাঙ্গ সাধনায় প্রয়োজন হয়। কিন্তু যোগসূত্রে নারায়ণের উল্লেখ নাই। সাধনপাদের তিনটি সূত্রের ভাষ্যে ক্রিয়াযোগের ফল বর্ণিত হইয়াছে(২)। তাহা এইরূপ:— তপস্যা করিলে দেহ ও ইন্দ্রিয়ের মলনাশ বশতঃ দর্শনশ্রবণাদির অসাধারণ উৎকর্ষ হয়; দেব ঋষি বা সিদ্ধকে ইষ্টদেবতারূপে অর্চ্চনা করিলে তিনি সাধকের দৃষ্টিগোচর হন ও তাহার

(১) মাণ্ডুক্য; (২) যোগসূত্র ২।৪৩-৪৫ (ব্যাসভাষ্য)

মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন ; কিন্তু ঈশ্বরে সর্ব্বতোভাবে আত্মনিবেদন করিলে সমাধিসিদ্ধি হয়, অর্থাৎ সাধক কৃতকৃত্য হন। অতএব মুমুক্ষুর পক্ষে দ্বিবিধ উপাস্যের নির্দ্দেশ যোগসূত্রে নাই। পরন্তু ভাষ্যকার বলিয়াছেন, ঈশ্বর সতত মুক্ত হইলেও কদাপি ঐশ্বর্য্যরহিত নহেন, অর্থাৎ তাঁহার অবাধ আধিপত্য প্রকৃতি-লীনের কিংবা সাস্মিত সমাধিতে প্রতিষ্ঠিত মহাপুরুষের কল্পব্যাপী অধ্যক্ষতার মত নহে। গীতা নবম অধ্যায়ের অষ্টাদশ শ্লোকে এই আধিপত্যের বিশদ বিবৃতি দিয়াছেন। তাহা এই প্রকার :—চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বরে জীবের আবির্ভাব, অবস্থান ও বিলয়, সুতরাং সর্ব্বাবস্থায় জীব তাঁহার আশ্রিত ; বস্তুতঃ প্রলয়েও তাঁহাতেই সে পুনরুত্থানের জন্য নিহিত থাকে আর ব্যক্তাবস্থায় তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া সে কর্ম্মে ও ভোগে প্রবৃত্ত হয়, অর্থাৎ তাহার অব্যয় উপাদান, প্রভু ও সাক্ষী সকলই তিনি ; বিষয়ের মোহে জীব এই তত্ত্ব সচরাচর বিস্মৃত হয় ; কিন্তু জীবনের সর্ব্ববিধ ব্যাপারে ইহা প্রতিফলিত হইলে সে ঈশ্বরে পরা গতি লাভ করে, অর্থাৎ প্রণিধানের মহিমায় তাহার নিঃশ্রেয়স প্রাপ্তি হয়।

কিন্তু সাধকগণের মধ্যে কেহ কেহ স্বভাবতঃ সংযতচিত্ত ও বিষয়ে অনাসক্ত। এই শ্রেণীর সাধক কর্ম্ম যথাসম্ভব পরিহার পূর্ব্বক প্রণব জপ করেন ও তাহার অর্থ স্মরণ রাখেন। ভাষ্যকারের মতে নিয়ত নাম জপ ও নামীর চিন্তা চিত্তকে একাগ্র করে। আর একটি প্রাচীন গাথা উদ্ধৃত করিয়া তিনি বলিয়াছেন, এবংবিধ সাধনার ফলে পরমাত্মা অর্থাৎ ঈশ্বরের স্বরূপ পরিস্ফুট হয়(১)। কিন্তু সমাধিপাদের উনবিংশতিতম সূত্রে দেখি, সাধক স্বীয় অন্তরাত্মা সম্বন্ধেও প্রকৃষ্ট জ্ঞান লাভ

(১) যোগসূত্র ১।২৮ (ব্যাসভাষ্য)

করেন, সুতরাং যোগের কোন অন্তরায় থাকে না। এখন জিজ্ঞাসা করি, এক তত্ত্বের অনুচিন্তনে অন্য তত্ত্বের সম্যক্ অনুভূতি হয় কি? তাহারা সজাতীয় হইলেও সাদৃশ্যবোধের জন্য পৃথক্ পৃথক্ উপলব্ধি আবশ্যক। অতএব অনুমান হয়,—জীবাত্মা ও পরমাত্মায় প্রকৃত ভেদ নাই, ভেদ কেবল ঐশ্বর্য্যে বা উপাধিতে। সাংখ্যযোগী হিরণ্যগর্ভের উপাসনায় এই সত্য অঙ্গীকার করেন, যেহেতু প্রণব জপের সহিত জ্যোতির্ম্ময় ও সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বরে আপনার অস্তিত্ব অনুভব করাই ইহার প্রসিদ্ধ পদ্ধতি। পরে ধ্যান গাঢ়তর হইলে চরাচরের বিচিত্র বিভাগ স্মৃতিপটের অতীত হয়; আধার-আধেয় ভাব আর থাকে না, অর্থাৎ পরমাত্মা ও জীবাত্মা একীভূত হন, কারণ উপাধির পার্থক্যই ব্যবধান বা ভেদ সৃষ্টি করে। সুতরাং এই উপাসনাও প্রণিধান, আর ইহা সম্পূর্ণ হইলে উপাসকের প্রকৃতি ও সাধনা অনুসারে ঈশ্বরের শান্ত ও সমাহিত ভাবে স্থিতি হয়, অর্থাৎ দৃশ্যজাত অন্তর্হিত হওয়ায় তিনি কৈবল্য লাভ করেন।

সগুণের অনুচিন্তনে এই উপাসনার আরম্ভ ও নির্গুণের ধারণায় ইহার সমাপ্তি। উপাসকের অধিকার অনুসারে উপাসনার এই প্রকারান্তর হয়, কিন্তু ইহাতে উপাস্যে ভেদ সূচিত হয় কি? যোগদর্শনে দ্বিবিধ ঈশ্বরের উল্লেখ নাই। শ্রুতির রূপকবহুল বর্ণনার শব্দগত অর্থ করায় এতাদৃশ ভেদ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। কিন্তু উপদেশের প্রকৃত তাৎপর্য্য শ্রুতি নানাস্থলে সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। সংশয়টি পূর্ব্বে সবিস্তারে পরীক্ষিত হইয়াছে, আর বর্ত্তমান প্রসঙ্গে সাংখ্যের নির্দ্দেশই প্রথমে আলোচ্য। যোগসূত্রে উৎকৃষ্ট যোগীর সর্ব্বজ্ঞতা ও সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্বের উল্লেখ আছে বটে; কিন্তু তাহা সিদ্ধ পুরুষের প্রশংসা, সগুণ ব্রহ্মের বর্ণনা নহে।

তথাপি সূত্রগুলিতে ঐশ্বর্য্যের বিস্তৃত বিবরণ না থাকায় কেহ কেহ অনুমান করেন, সাংখ্যমতে বিশ্বব্যাপারের সহিত নিত্য ঈশ্বরের নিকট সম্বন্ধ নাই। পক্ষান্তরে গীতায় তাঁহার নিশ্চিন্ত, নির্লিপ্ত ভাব উপেক্ষিত না হইলেও ঐশ্বর্য্যের সবিশেষ বর্ণনা আছে। সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে সংশয় হয়, পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে শাস্ত্রদ্বয়ে পূর্ণ সঙ্গতি নাই। কিন্তু ঐশ্বর্য্যের সঙ্কেত অন্ততঃ আমরা ক্রিয়াযোগের আদেশে পাই, কারণ সর্ব্ববিধ কর্ম্মার্পণ বিশ্বাধিপেই সঙ্গত হয়। বস্তুতঃ পতঞ্জলির মুখ্য উপদেশ কৈবল্য বা অসঙ্গতা বলিয়া ঐশ্বর্য্যের বিস্তৃত বৃত্তান্ত তাঁহার প্রস্তাবে নাই,—এবংবিধ অনুমান ন্যায্য।

যাহা হউক, এ বিষয়ে বাদানুবাদের সীমা আছে। ভাষ্যকার ব্যাসদেব স্পষ্টই বলিয়াছেন,—অনুমান ঈশ্বর সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞানই দিতে পারে; বিশেষ প্রতিপত্তির জন্য আগমের আশ্রয় লইতে হয়। পূর্ব্বে মাণ্ডুক্যের উপদেশ সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে; এস্থলে মুণ্ডকের বাণীর ব্যাখ্যা দিব, কারণ এই শ্রুতিতেও প্রণব জপ আদিষ্ট হইয়াছে, অথচ বাচ্যের বর্ণনা অপেক্ষাকৃত সরল। ঋষি বলিয়াছেন:—স্বর্গ, অন্তরীক্ষ ও পৃথিবী ঈশ্বরে অবস্থিত; প্রাণাদি করণবর্গের তাঁহাতে বিকাশ; বস্তুতঃ তিনিই প্রতি হৃদয়ে প্রকৃত জ্ঞাতা ও ভোক্তা, অথচ এই বিশ্ব জ্ঞেয় ও ভোগ্যরূপে তাঁহাতে বিস্তৃত; কিন্তু তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করে এবংবিধ জ্যোতি কোথাও নাই কারণ তাঁহাতেই সকলের অভিব্যক্তি; অতএব তিনি দুর্বিজ্ঞেয়; চরম কারণরূপে তিনি শ্রেষ্ঠ ও তাবৎ কার্য্যরূপে তিনি অশ্রেষ্ঠ; তথাপি এই পরাবরকে একাগ্রচিত্তে উপাসনা দ্বারা জানিতে হইবে, যেহেতু তাঁহাকে জানিলে অবিদ্যাপ্রসূত কামনানিচয় তিরোহিত হয়, তত্ত্ব সম্বন্ধে কোন সংশয় থাকে

না, কর্ম্মবন্ধন হইতেও মুক্ত হওয়া যায়। ঋষির এই প্রকার উপদেশে সগুণ ও নির্গুণ ঈশ্বরে তাত্ত্বিক ভেদ করা হয় নাই।

তথাপি কোন কোন সাংখ্যাচার্য্যের মতে ঈশ্বর মূল তত্ত্ব নহেন; পুরুষ ও প্রকৃতিই মূল তত্ত্ব আর ইহাদিগের সংযোগে ঈশ্বরের আবির্ভাব। কিন্তু পুরুষ ও প্রকৃতি অনুমানের বিষয়; সংসারে দ্রষ্টা ও দৃশ্যরূপেই তাঁহাদিগের পরিচয়। পতঞ্জলি বলিয়াছেন, দ্রষ্টা অক্রিয়, অসঙ্গ, চৈতন্যমাত্র হইলেও ব্যবহারে অচেতন বুদ্ধিবৃত্তির প্রকাশক(১)। আর বুদ্ধি দৃশ্যসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও মৌলিক; সুতরাং তাহার প্রকাশ অন্যান্য প্রকাশের হেতু। ভূত নামে প্রসিদ্ধ বাহ্যদ্রব্যের উপাদানগুলি ও তাহাদিগের ব্যবহারে নিযুক্ত ইন্দ্রিয়গ্রাম এই অন্যান্য। অতএব দ্রষ্টা ও দৃশ্য এই দ্বিবিধভাবের সমাবেশে যে সংসারের রচনা তাহা সুস্পষ্ট। পরন্তু উক্ত ভাবদ্বয় যে অনুবন্ধী বা অন্যোন্যাশ্রয়ী তাহাও স্বীকার করিতে হয়, কারণ দ্রষ্টাবিযুক্ত দৃশ্যের কিংবা দৃশ্যবিযুক্ত দ্রষ্টার কোন অভিজ্ঞতা আমাদিগের নাই। আর পতঞ্জলিও উহাদিগের পরস্পর ও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ অঙ্গীকার করিয়াছেন। সাধনপাদের বিংশতিতম সূত্রে দ্রষ্টার যে বর্ণনা তিনি দিয়াছেন তাহা আমরা এইমাত্র দেখিলাম। আর দৃশ্যের বর্ণনায় বলা হইয়াছে, দ্রষ্টার ভোগ ও অপবর্গরূপ প্রয়োজনসিদ্ধিই তাহার আত্মা বা স্বরূপ(২)। তথাপি তাহারা বিসদৃশ; সুতরাং ব্যবহারের ব্যাখ্যায় দ্বিবিধ কারণ অঙ্গীকৃত হইয়াছে, আর ইহারাই পুরুষ ও প্রকৃতি নামে খ্যাত। কিন্তু কারণ প্রত্যক্ষযোগ্য না হইলে কার্য্য পরীক্ষা করিয়া তাহার স্বরূপ ও লক্ষণ নির্ণেয়। সুতরাং সাংখ্যমতে পুরুষ চৈতন্য ও সতত একরূপ; আর প্রকৃতি তাহার বিপরীত,

(১) যোগ্যসূত্র ২।২০ (২) যোগসূত্র ২।২১

অর্থাৎ অচেতন ও বিকারী। অতঃপর প্রশ্ন হয়,—এতাদৃশ বিরুদ্ধস্বভাব ও স্বতন্ত্র কারণদ্বয়ের সংযোগ হয় কিরূপে?

সাধনপাদের চতুর্বিংশতিতম সূত্রে দেখি—অবিদ্যা এই সংযোগের হেতু। কিন্তু বোধ, সত্য বা মিথ্যা যেরূপই হউক, পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগে তাহার উৎপত্তি। আর অবিদ্যা কেবল বিদ্যার অভাব নহে, উহা কয়েক প্রকার ভ্রান্তি বা বিষয় সম্বন্ধে অযুক্ত ধারণা। অনবধানতা বশতঃ বহু অকিঞ্চিৎকর ভ্রান্তি হয়, যাহা শাস্ত্রের আলোচ্য নহে। যেগুলি শ্রেয়োলাভের পথে প্রবল অন্তরায়, যুগে যুগে যাহারা মানবকে বিপন্ন করিয়াছে, শাস্ত্র কেবল তাহাদিগের উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং অনিত্য বিষয়ে নিত্যতা আরোপ, অপবিত্র দ্রব্যে শুচিতা কল্পনা, দুঃখের কারণে সুখের সন্ধান ও বিজাতীয় পদার্থে আত্মবুদ্ধি, এই চতুর্ব্বিধ অনর্থকর চিত্তবৃত্তি অবিদ্যা নামে প্রখ্যাত হইয়াছে। দোষদর্শনে অন্যান্য ভ্রান্তির সংশোধন হয়, কিন্তু ইহাদিগের উচ্ছেদ সুকঠিন, কারণ প্রাচীন সংস্কারে ইহারা প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং বার বার প্রতারিত হইলেও মানব ইহাদিগের ইঙ্গিতে ভোগাধিষ্ঠান দেহে ও ভোগসাধক ইন্দ্রিয়বর্গে, এমন কি কোন কোন ভোগ্য বিষয়ে অত্যন্ত আসক্ত হয়। এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, এই অকারণ আত্মীয়তা সূত্রে সংযোগ নামে অভিহিত হইয়াছে, আর পতঞ্জলি যেন অঙ্গুলিনির্দ্দেশপূর্ব্বক চতুষ্পাদ অবিদ্যাকে ইহার হেতুরূপে প্রচার করিয়াছেন। বস্তুতঃ প্রসঙ্গক্রমে 'সংযোগ' শব্দটির এই সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহার অসঙ্গত হয় নাই। দুঃখের একান্ত ও অত্যন্ত নিবৃত্তিই সাংখ্যশাস্ত্রে লক্ষ্য; অতএব দুঃখপ্রসূ অর্থাৎ অবিদ্যাজনিত যে সংযোগ তাহার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা স্বাভাবিক। কিন্তু সকল সংযোগ যে এই প্রকার তাহা

পতঞ্জলির অভিমত নহে, কারণ তাঁহার অভিপ্রেত সাধনা বিবেকখ্যতির অভ্যাস(১), আর বিবেকখ্যাতিতে সংযোগ বর্ত্তমান, যেহেতু তাহা চেতনাযুক্ত বুদ্ধিবৃত্তি; অথচ তাহা অবিদ্যারহিত যেহেতু তাহাতে দ্রষ্টা ও দৃশ্যের ভেদ পরিস্ফুট।

যাহা হউক, ঈশ্বরতত্ত্বের আলোচনায় নির্দ্দোষ সংযোগই বিচার্য্য, কারণ তাঁহাতে পুরুষ ও প্রকৃতি সংযুক্ত হইলেও অবিদ্যার লেশ নাই। এই সংযোগ দেশ ও কালের অতীত, যেহেতু জ্ঞাতবিষয়ের গ্রন্থনে দেশ ও কাল রচনাপদ্ধতিমাত্র, অথচ বিষয়জ্ঞান সংযোগের ফলে হয়। সুতরাং সংযোগ দেশে বা কালে সান্নিধ্য নহে; আর ধর্ম্মের সমতায় ইহার ভিত্তি নাই, যেহেতু দ্রষ্টৃত্ব ও দৃশ্যত্বে ভেদ সুস্পষ্ট। তথাপি সাপেক্ষতা তাহাদিগের মধ্যে বর্ত্তমান অর্থাৎ ভেদ সত্ত্বেও তাহারা অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থান পরাগতিরূপে বর্ণিত হইয়াছে, সত্য। কিন্তু এই স্বরূপ কেবল বোধ নহে; ইহা স্ববোধ অর্থাৎ দৃশ্য ও দ্রষ্টা ইহাতে সূক্ষ্মরূপে অনুস্যূত। অতএব বলিতে পারি না কি, যে সাংখ্যমতেও চরম তত্ত্বের সন্ধান পূর্ণায়তনে লইতে হইবে, বিশ্লেষণলব্ধ পরস্পরাপেক্ষী ভাবে নহে, কারণ তাদৃশ ভাবে স্বাতন্ত্র্য বা সম্পূর্ণতা নাই?

শ্রুতিও গীতায় ঈশ্বরের সর্ব্বাশ্রয়ত্ব প্রচারিত হইয়াছে। পতঞ্জলির নির্দ্দেশ কি অন্যরূপ? তিনি বলিয়াছেন, ঈশ্বরপ্রণিধান সমাধিসিদ্ধির উপায়। কামনাবর্জ্জিত মহাপুরুষের পবিত্র, নিশ্চিন্ত ভাবও একাগ্রতা অভ্যাসের জন্য ধ্যান করিতে তিনি পরামর্শ দিয়াছেন, কিন্তু তাদৃশ ধ্যানের ফলে যে সমাধি-

(১) যোগ্যসূত্র ২।২৬

সিদ্ধি হয় তাহা বলেন নাই। বস্তুতঃ তাহা প্রণিধানও নহে, কারণ ধ্যেয় সর্ব্বময় ও সর্ব্বাধ্যক্ষ, সুতরাং জীবের স্বাতন্ত্র্য কল্পনামাত্র, এই প্রকার স্থির বিশ্বাস ব্যতীত প্রকৃত প্রণিধান হয় না। আর এই বিশ্বাসের প্রেরণায় যোগী যখন জীবের শেষ সম্বল আমিত্বকেও বিসর্জ্জন দেন, তখনই প্রণিধান সম্পূর্ণ ও সমাধি সিদ্ধ হয়। অন্য দেবতায় নিবেদন আংশিক হওয়াই স্বাভাবিক, আর তাহাতে ক্ষতিবৃদ্ধির বিচার থাকে। কিন্তু পতঞ্জলির অর্থ প্রকাশ করিবার জন্য ব্যাসদেব সর্ব্বভাবার্পণ প্রণিধানের পর্য্যায়-রূপে ব্যবহার করিয়াছেন (১)। সুতরাং ঈশ্বরপ্রণিধানের আদেশ থাকায় যোগসূত্রে শ্রুতির ও গীতার ঈশ্বরবাদ অনুমোদিত হইয়াছে, মনে করি।

জ্ঞানযোগে ও ঈশ্বরপ্রনিধানে কল্পিত তারতম্য

তথাপি যোগদর্শনের অধিকাংশই চিত্তসংযমের জন্য বিস্তৃত উপদেশ, অথচ অত্যল্পসংখ্যক সূত্রে ঈশ্বরপ্রণিধান আলোচিত হইয়াছে। অতএব সংশয় হয়, চিত্তবৃত্তিনিরোধই এই শাস্ত্রের মুখ্য প্রস্তাব আর ঈশ্বরপ্রণিধান অবান্তর না হইলেও গৌণ প্রসঙ্গ। আলোচনায় এই তারতম্যের কারণ কিন্তু অনায়াসেই অনুমেয়। চিত্তবৃত্তিতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কয়েকটি কারণ সক্রিয় হয়; তাহাদিগকে সাবধানে পরীক্ষা পূর্ব্বক বর্জ্জন করাই সাংখীয় জ্ঞানযোগ। কারণের লয়ে কার্য্যের লয় হয়; সুতরাং জ্ঞানযোগের সমাধানে চিত্তবৃত্তির অবসান অবশ্যম্ভাবী আর দুঃখের নিবৃত্তিও সুনিশ্চিত, যেহেতু দুঃখ প্রমাণাদি পঞ্চবিধ চিত্তবৃত্তি হইতে কখন বিচ্যুত নহে। কিন্তু ব্যবহারের জটিলতা ও বৈচিত্র্য উক্ত উপাদানগুলির পরীক্ষায় প্রতিবন্ধক হয়। অতএব একাগ্রতা লাভের জন্য কয়েক প্রকার ধ্যান আদিষ্ট হইয়াছে। ধ্যান এইরূপে অভ্যস্ত হইলে,

(১) যোগসূত্র ২।৪৫ (ব্যাসভাষ্য)

যোগী স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাদানগুলি যথাক্রমে পরীক্ষান্তর পরিহার করেন। তখন পুরুষ বা সর্ব্ববিধ জ্ঞানের চরমহেতু স্বরূপে অবস্থিত হন। সুখ, দুঃখ ও মোহের অতীত, শান্ত অর্থাৎ চাঞ্চল্যবর্জ্জিত সে অবস্থা। দুঃখের সম্ভাবনা পর্য্যন্ত অপগত হওয়ায় তাহা মোক্ষ, আর জীবভাব বা দ্বৈতবোধ অতিক্রান্ত হওয়ায় তাহা কৈবল্য। সুতরাং চিত্তবৃত্তির তন্ন তন্ন বিশ্লেষণে এই জ্ঞানযোগের প্রতিষ্ঠা; পক্ষান্তরে অনন্যা ভক্তি ঈশ্বর-প্রণিধানের প্রাণস্বরূপ। পথ দুইটি ভিন্ন বটে, তথাপি অহঙ্কার আর বিষয়ে অনুরাগ ও বিদ্বেষ উভয়েই নিরুদ্ধ হয়। কিন্তু জ্ঞানযোগে উন্নতি ক্রমিক বলিয়া বিভিন্ন স্তরের উল্লেখ বাঞ্ছনীয়, অতএব এই মার্গ সম্বন্ধে পতঞ্জলি বিস্তৃত উপদেশ দিয়াছেন। অনন্যা ভক্তিতে স্তরভেদ নাই, আর ভজনীয় সম্বন্ধে বিচারেরও অবকাশ থাকে না। সুতরাং ঈশ্বরে জ্ঞান ও কর্ম্মের উদ্ভব, এই সত্য প্রচার করিয়া পতঞ্জলি ও ব্যাসদেব নিরস্ত হইয়াছেন; প্রণিধানের নির্দ্দেশে অপ্রতর্ক্য তত্ত্বের বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হন নাই। বস্তুতঃ প্রণিধান বিচার নহে, পরন্তু বিচারের সীমা অতিক্রম করিলে তাহা সম্ভব হয়। বিচার বলে অন্যের অনুকরণ সম্ভব, অন্যে অবস্থান বা আত্মনিবেদন সম্ভব নহে, যেহেতু বিচারে দ্বৈতবোধ সতত বর্ত্তমান। ভাষ্যকারের মতে প্রণিধান ভক্তিবিশেষ; ভক্তিই প্রকৃতপক্ষে সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বাতিশয়ী তত্ত্বের পরিচয় দিতে সক্ষম, আর ভক্তির বিকাশে পরিচয় সম্পূর্ণ হইলে পরাৎপরে আত্মনিবেদনের জন্য ব্যাকুলতা জন্মে; তখন ভক্তিমান সাধক স্বাতন্ত্র্য বিলোপে সমর্থ হন, অর্থাৎ যোগের পক্ষে কোন অন্তরায় থাকে না। সুতরাং পরানুরক্তি ও প্রণিধানে বিশেষ প্রভেদ নাই।

সাংখ্যকারিকার সংক্ষিপ্ত পরিচয়

কিন্তু প্রণিধান ত দূরের কথা, ঈশ্বরের উল্লেখও পরবর্ত্তী কালের কোন কোন সাংখ্য গ্রন্থে নাই। তাহাদিগের মধ্যে সাংখ্যকারিকা আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও সঙ্গতি ও প্রসাদগুণে বিখ্যাত। সুতরাং তাহার চিন্তাধারা এই প্রসঙ্গে আলোচ্য। প্রশ্নোত্তরের আকারে তাহার কিছু পরিচয় দিতেছি। প্রশ্ন—পুস্তিকার উদ্দেশ্য কি? উত্তর—দুঃখনিবৃত্তির উপায় সম্বন্ধে দার্শনিক উপদেশ প্রদান। লৌকিক ও বৈদিক উপায় অপর্য্যাপ্ত হওয়ায় দুঃখবহুল জীবনের দার্শনিক বিশ্লেষণ বাঞ্ছনীয়। প্রশ্ন—দুঃখ কাহার? উত্তর—জীবের। প্রশ্ন—জীব কিরূপ? উত্তর—দৃশ্যজাতীয় বুদ্ধি প্রভৃতি ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বে জীব গঠিত। প্রশ্ন—দুঃখের উৎপত্তি কোথায়? উত্তর—উক্ত উপকরণগুলি অনিত্য, পরিণামী ও সঙ্কীর্ণ, আর তাহাদিগের এই ত্রিবিধ দোষে দুঃখের উৎপত্তি। প্রশ্ন—তাহারা কি মৌলিক পদার্থ? উত্তর—না, তাহারা প্রতিক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ও লয়োদয়শীল, সুতরাং বিকার বা কার্য্য। কিন্তু সসীম হইলেও সংখ্যাতীতক্ষেত্রে তাহারা বর্ত্তমান আর প্রবৃত্তিতে প্রভেদ থাকিলেও তাহাদিগের সাদৃশ্য মৌলিক। অতএব এক অমেয় শক্তি হইতে তাহারা উদ্ভূত, যদিও শক্তি বলিয়া উহা কখন প্রত্যক্ষ হয় না। সাংখ্যশাস্ত্রে এই শক্তি মূলা প্রকৃতি ও প্রধান নামে প্রসিদ্ধ। প্রশ্ন—বুদ্ধি প্রভৃতি প্রকৃতির ত্রয়োবিংশতি বিকারের উল্লেখে জীবের বর্ণনা সম্পূর্ণ হয় কি? উত্তর—না। ইহাদিগের সহযোগ পরস্পরের উপকারার্থ নহে, কারণ ইহারা দৃশ্য বা অচেতন। তথাপি ইহারা ইষ্ট ও অনিষ্ট অবধারণ পূর্ব্বক ক্রিয়াশীল। অতএব যুক্ত অনুমান এই,—ইহাদিগের অন্তরে কোন সত্তা প্রভাবান্বিত ভাবে অবস্থিত, ভোক্তাবোধে তাহারই জন্য ইহারা সেবকের মত সক্রিয়। অথচ ইহাদিগের সংসর্গ

বর্জ্জনেই তাহার প্রবৃত্তি। সুতরাং তাহা উক্ত প্রকৃতি ও বিকৃতি হইতে অত্যন্ত বিসদৃশ। প্রশ্ন—তবে তাহা কিরূপ ? উত্তর—তাহা শুদ্ধ চৈতন্য অর্থাৎ দৃশ্যের সাক্ষিমাত্র, সুতরাং উদাসীন ও অক্রিয়, আর তাহাই জীবের অন্তরতম ভাব। শাস্ত্রে তাহা পুরুষ নামে প্রসিদ্ধ। প্রশ্ন—জীব তবে দুঃখভাগী হয় কেন ? উত্তর—তাহার যাবতীয় চিত্তবৃত্তির সহিত চৈতন্য এরূপে সংযুক্ত আছেন যে প্রত্যেকটি অল্পাধিক সচেতন বলিয়া বোধ হয়। এই সংযোগ কিন্তু বিষয়ের গ্রহীতারূপ বুদ্ধিতে অত্যন্ত নিবিড়, ও তাহার ফলে চৈতন্য নির্লিপ্ত ও নির্বিকার হইলেও ভোক্তা ও কর্ত্তারূপে প্রতীত হন, অর্থাৎ জীবের সংসারে আসক্তি জন্মে। এই আসক্তিতে ব্যবহারের উদ্ভব, আর ব্যবহার সপ্তবিধ আকার ধারণ করে, যথা সাধারণ ধর্ম্ম, ঐশ্বর্য্য ও বৈরাগ্য আর অজ্ঞান, অধর্ম্ম, অনৈশ্বর্য্য ও অবৈরাগ্য। ইহাদিগের মধ্যে প্রথম তিনটি আপাতসুখের হেতু হইলেও সসীম বা ক্ষয়শীল, সুতরাং ভাবী দুঃখ বা আক্ষেপের কারণ, আর অবশিষ্ট চারিটি বর্ত্তমানেই দুঃখযুক্ত, ভবিষ্যতে ত' বটেই। প্রশ্ন—দুঃখের এই ব্যাপক আক্রমণ হইতে জীব নিষ্কৃতি পাইবে কোন্ উপায়ে ? উত্তর—বিষয় পুরুষের সম্পত্তি নহে, দেহ ও ইন্দ্রিয়বর্গে তাঁহার প্রকৃত পরিচয় নাই আর দ্বন্দ্বময় কালের প্রবাহ তাঁহাকে স্পর্শ করে না—এই তত্ত্বের নিরন্তর অভ্যাস দ্বারা। অভ্যাসের ফলে পুরুষ কেবল বা দৃশ্যজাত হইতে বিযুক্ত হন। প্রশ্ন—এবংবিধ কৈবল্যে লাভ কি ? উত্তর—দুঃখনিবৃত্তি। বস্তুতঃ প্রকৃতির এই লাভ হয়, যদিও চৈতন্য বা পুরুষ দুঃখের প্রকাশক হওয়ায় দুঃখ ও দুঃখমুক্তি তাঁহাতে ভ্রান্তিবশতঃ আরোপিত হইয়া থাকে।

কারিকার ব্যবস্থা এইরূপ। চিকিৎসাশাস্ত্রের পদ্ধতি

অনুসারে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে নিদান ও ভেষজ উভয়ই আছে। গ্রন্থকার ঈশ্বরকৃষ্ণ রোগের কারণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া স্বাস্থ্যলাভের উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। গীতার ভাষায় দুঃখসংযোগবিয়োগই এই স্বাস্থ্য; আর তাহা লাভ করিবার পক্ষে উক্ত বিবেকই প্রশস্ত উপায়। শারীরিক ব্যাধি সম্বন্ধেও সুচিকিৎসক ঈশ্বরকৃষ্ণের পদ্ধতি অবলম্বন করেন, অর্থাৎ তিনি ভক্তিমান হইলেও তাঁহার ব্যবস্থাপত্রে ঈশ্বরের বর্ণনা থাকে না। সুতরাং কারিকায় তাদৃশ বর্ণনার অভাব হইতে অনুমান করা যায় না যে সাংখ্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করেন নাই।

সাংখ্যসূত্রের নিরীশ্বরবাদ প্রামাণিক নহে

কিন্তু সাংখ্যসূত্র নামক সংকলনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণাভাবে প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে(১)। যাঁহাকে সর্ব্বশাস্ত্র অপ্রমেয় বলেন, তাঁহার তর্কশাস্ত্রানুমত প্রমাণ নাই বলা নূতন কথা নহে। কিন্তু প্রমাণাভাবের উল্লেখ করিয়া সূত্রকার নিরস্ত হন নাই; ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা যে অসঙ্গতিদোষদুষ্ট তাহা যুক্তিবলে প্রদর্শন করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে,—ঈশ্বর বদ্ধ কিংবা মুক্ত(২)? বন্ধন ও মুক্তি দ্বিবিধ অবস্থা। কিন্তু যাঁহার চৈতন্যরূপ সত্তার আশ্রয়ে সকল অবস্থাই প্রকট বা যথার্থ হয়, কোন্ অবস্থা তাঁহার আশ্রয় বা অবলম্বন?—এতাদৃশ প্রশ্ন অন্যায্য। তথাপি এই বিতণ্ডার বিচার করিয়া সূত্রকার বলিয়াছেন, ঈশ্বর বদ্ধ হইলে সৃষ্টি করিবার মত সামর্থ্য তাঁহার নাই, আর মুক্ত হইলে সৃজন-পালনরূপ ক্রিয়ায় তাঁহার প্রবৃত্তি থাকিতে পারে না(৩)। ঈশ্বর সম্বন্ধে নিকৃষ্ট ধারণার বিরুদ্ধে এবংবিধ যুক্তি প্রবল হইলেও শ্রুতির তথা গীতার ঈশ্বরতত্ত্বের আলোচনায় ইহার

(১) সাংখ্যসূত্র ১।৯২ (২) সাংখ্যসূত্র ১।৯৩ (৩) সাংখ্যসূত্র ১।৯৪

কোন মূল্যই নাই। উক্ত ধারণায় ঈশ্বর দেবমানবের অনুরূপ, কেবল মহত্তর ; ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি কর্ম্মে নিযুক্ত হন আর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে কর্ম্মত্যাগ করেন। কিন্তু শ্রুতির উপদেশ অত্যন্ত ভিন্ন, আর গীতা তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন। বস্তুতঃ চিত্তেন্দ্রিয় পরমাত্মার উপাদান নহে ; সঙ্কল্প ও চেষ্টা তাঁহার স্বরূপে নাই ; পরন্তু অন্ন, প্রাণ, মন, বল ও আকাশাদি বাহ্য পদার্থ তাঁহাতে উৎপন্ন ও লীন হয়, অথচ এতাদৃশ আবির্ভাব ও তিরোভাবে তাঁহার চিন্ময়ত্বের কোন ব্যত্যয় হয় না,—ছান্দোগ্য এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন ও প্রত্যেক প্রাচীন উপনিষদে ইহাই নানাভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। গীতাও বিভূতি বর্ণনার পরে বলিয়াছেন, বিস্তৃত গণনার প্রয়োজন নাই, যেহেতু ঈশ্বরের সামান্য অংশে এই বিশ্ব প্রসারিত, অর্থাৎ অভিব্যক্তি বহু ও বিচিত্র হইলেও চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বর তাহাতে নিঃশেষ হন না(১)। সাংখ্যীয় অনাত্মা বা সবিকারা প্রকৃতি তাঁহার প্রকাশ, সেই প্রকাশের ধারা বা পরিণামের বিধি তাঁহার নিয়ম আর স্বরূপে তিনি আত্মা বা চৈতন্য।

এই নিয়ম সম্বন্ধে অযোগ্য ধারণা প্রচলিত হইলে সাংখ্যাচার্য্যগণ তর্কশাস্ত্রের আশ্রয় লইয়াছিলেন। ইঁহাদিগের যুক্তি এইরূপ :—কোন সর্ব্বশক্তিমান ও করুণাময় পুরুষ দুঃখপূর্ণ সংসার রচনা করিয়াছেন, এ বিশ্বাস অন্যায্য ; যিনি কল্যাণগুণের আকর বলিয়া স্তুত হন, তাঁহার পক্ষে পাপবিদ্ধ জীব সৃষ্টি করা অসম্ভব ; সৃজন, পালন ও সংহারের জন্য ইচ্ছা ও সঙ্কল্পের প্রয়োজন ; কিন্তু ইচ্ছা ও সঙ্কল্প অপূর্ণ, অমুক্ত পুরুষেই সম্ভব। ঈশ্বর কোন অভাবপূরণের জন্য বিশ্ব নির্ম্মাণ করিয়াছেন, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনাপূর্ব্বক ইহার সংরক্ষণ করিতেছেন ও উদ্দেশ্য

(১) গীতা ১০।৪২

সিদ্ধ হইলে ইহাকে ধ্বংস করিবেন, এতাদৃশ ধারণার নিরসনে উক্ত বিচার অকাট্য, সন্দেহ নাই। কিন্তু শ্রুতির ও গীতার উপদেশ যে অন্যরূপ তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। সঙ্কল্প, চেষ্টা প্রভৃতি ঈশ্বরের স্বরূপে নাই। তাঁহাকে আনন্দ বলা হইয়াছে। অযত্নসম্ভূত ও অবাধিত অভিব্যক্তিই শুদ্ধ আনন্দের লক্ষণ। চৈতন্যময় ঈশ্বর অশেষবিধভাবে স্বতঃ প্রকট হন; উদ্দেশ্য নাই, উদ্যোগ নাই, সুতরাং উদ্বেগ ও নাই। পূর্ণতা ও স্বাতন্ত্র্যে এই প্রকাশের উদ্ভব ও শান্তি ইহার অনুষঙ্গ।

কিন্তু প্রতিবাদী বলেন, শান্তির রাজ্যে এত অশান্তি কেন? বিষয়টি সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে, আর সাংখ্যীয় কর্ম্ম-বাদেও এই আপত্তির উত্তর আমরা পাই। বস্তুতঃ সাংখ্যসূত্রের মত সংকলনে ও অন্যান্য অপ্রাচীন গ্রন্থে সাংখ্যের প্রকৃতরূপ পরিস্ফুট হয় নাই। গীতা যে শাস্ত্রের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন, তাহা ঈশ্বরবাদের বিরোধী হইতে পারে না। সুতরাং পতঞ্জলির যোগদর্শনই তাহার প্রামাণিক গ্রন্থ। গীতা বলিয়াছেন, সাংখ্যসম্মত যোগ অভ্যাস করিলে শোক ও কামনার অবকাশ থাকে না, আর তখন পরাভক্তির মহিমায় সাধক ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট জ্ঞান লাভ করেন, ফলে তাঁহার অলীক স্বাতন্ত্র্য পর্য্যুদস্ত হয়। আর যোগদর্শনও স্বীকার করিয়াছেন যে ঈশ্বর প্রণিধানে সমাধি সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ দ্বৈত-বোধের সম্পূর্ণ অবসান ঘটে। অতএব শাস্ত্রদ্বয়ে অসঙ্গতিবোধ অনিষ্টকর কল্পনামাত্র।

সাংখ্যের দ্বৈতবাদ

কিন্তু সাংখ্যের দ্বৈতবাদ প্রসিদ্ধ, অর্থাৎ সাংখ্যমতে প্রকৃতি স্বতন্ত্র ও মৌলিক তত্ত্ব এবংবিধ ধারনাই সাধারণ। অথচ সবিকারা প্রকৃতি ঈশ্বরের,—গীতার উপদেশ এইরূপ(১)।

(১) গীতা ৭।৪,৫

আমরা এই আপাতবিরোধের কিছু আলোচনা করিব। যোগসূত্রে ও তাহার ভাষ্যে দেখি, ঈশ্বরের সহিত প্রকৃতির সম্বন্ধ আদি ও অন্তহীন। আর ইহাও স্পষ্ট যে এই সম্বন্ধের নিমিত্ত-রূপে কোন স্বতন্ত্র তৃতীয় তত্ত্ব অঙ্গীকৃত হয় নাই(১)। সুতরাং যুক্ত অনুমান এই,—ঈশ্বরই পরম তত্ত্ব আর প্রকৃতি তাঁহার অন্তর্ভুক্ত। অধিকন্তু ব্যাসদেব বলিয়াছেন। ঈশ্বর সতত মুক্ত অথচ কখনও ঐশ্বর্য্যরহিত নহেন। অতএব প্রকৃতির সংসর্গ সর্ব্বক্ষেত্রে মুক্তির পরিপন্থী নহে। প্রশ্ন হইতে পারে,—তবে মুমুক্ষুর প্রতি ঐশ্বর্য্য পরিহার আদিষ্ট হইয়াছে কেন? তাহার উত্তর এই,—সন্ন্যাসিগণ নিঃসঙ্গ, নিষ্ক্রিয়ভাবের পক্ষপাতী; সুতরাং তাঁহাদিগের জন্য এবংবিধ উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

আর এক কথা, সাংখ্যমতে প্রকৃতি অব্যক্ত ও অচেতন অথচ বুদ্ধি প্রভৃতি তাবৎ ব্যক্ত পদার্থের কারণ। সুতরাং তাহা বিশ্বব্যাপী শক্তিরূপেই চিন্তনীয়। এখন প্রশ্ন হয়,—এ শক্তির আশ্রয় কি? কোন জড় পদার্থ ইহার আধার হইতে পারে না, যেহেতু নিখিল জড় জগৎ ইহার বিকারমাত্র। সুতরাং অপরিহার্য্য অনুমান এই,—কোন পুরুষে ইহার প্রতিষ্ঠা। সত্য বটে, যাহা কার্য্যনিচয়ের কারণরূপে নির্ণীত হইয়াছে, তাহার কারণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসায় অনবস্থা দোষ হয়(২)। কিন্তু বর্ত্তমান প্রশ্ন এরূপ নহে। অনুমানে প্রত্যক্ষের অপলাপ হয় নাই, নির্ণয় করিবার জন্য এই প্রশ্ন। নিরালম্ব শক্তির অভিজ্ঞতা মানবের নাই; সুতরাং আধার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা সঙ্গত। গীতা প্রকৃতিকে ঈশ্বরের শক্তি বলিয়াছেন; কারিকা প্রশ্নের কোন উত্তর দেন নাই, কারণ নৈষ্কর্ম্ম্য সাধনের প্রণালী নির্দ্দেশ করিবার জন্য এ বিচারের প্রয়োজন ছিল না।

(১) যোগসূত্র ১.২৪ (ব্যাসভাষ্য) (২) সাংখ্যসূত্র ১।৬৭,৬৮

সাংখ্যসূত্র মূলা প্রকৃতির বর্ণনায় বলিয়াছেন, ইহা সত্ত্ব, রজ ও তমের সাম্যাবস্থা(১)। কিন্তু এই বিবরণে দার্শনিক পরিভাষার আড়ম্বরে বক্তব্য প্রচ্ছন্ন হইয়াছে। আর কারিকার নির্দ্দেশ অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট হইলেও অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। সবিস্তারে তাহা এইপ্রকার :—মূলা প্রকৃতির সাক্ষাৎ পরিচয় নাই, কিন্তু তাহার যাবতীয় কার্য্যে প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও স্থিতি পর্য্যায়ক্রমে প্রবল হয়, সুতরাং অনুমান করা সঙ্গত যে তাহাদিগের কারণেও এই ধর্ম্মগুলি নিহিত আছে। বস্তুতঃ অন্তর্জগতে ও বহির্জগতে প্রত্যেক পদার্থই ধারাবাহিকরূপে প্রকাশপ্রধান, ক্রিয়াপ্রধান, ও জাড্যপ্রধান, অথচ এই সম্বদ্ধ অথচ পরস্পরবিরুদ্ধ লক্ষণত্রয় আকস্মিক হইতে পারে না, এমন কি, কোন বিশেষ অবস্থায় ইহাদিগের উদ্ভব নহে, কারণ দেশে ও কালে ইহারা ব্যাপ্ত। অতএব অঙ্গীকার করিতে হইবে যে প্রকৃতিতে ইহারা সূক্ষ্মভাবে বর্ত্তমান। তথাপি প্রশ্ন রহিয়া যায়,—কাহার এই প্রকাশ, ক্রিয়া ও জাড্য অর্থাৎ প্রকৃতির স্বরূপ কি? কারিকা এ বিষয়ে নীরব, কারণ নৈষ্কর্ম্ম্য সাধনার উপাদেয়ত্ব প্রমাণ করিবার জন্য ইহার আলোচনা অবশ্যক হয় নাই।

যোগদর্শন কিন্তু দুইটি সূত্রে এ বিষয়ে কিছু আলোকপাত করিয়াছেন। পতঞ্জলি বলিয়াছেন, দৃশ্যমাত্রেই প্রকাশক্রিয়াস্থিতিশীল আর দৃশ্য দ্বিবিধ(২)। পঞ্চভূতে গঠিত বাহ্যবিষয় যে দৃশ্যশ্রেণীভুক্ত তাহা বলা বাহুল্য, কিন্তু তাহার ব্যবহারে নিযুক্ত ইন্দ্রিয়গ্রাম আর অন্তঃকরণও এই শ্রেণীর অন্তর্গত, কারণ তাহারা বৃত্তিসর্ব্বস্ব ও বৃত্তিমাত্রেই অনুভবযোগ্য। এই দ্বিবিধ দৃশ্যের সহযোগে জীব সুখদুঃখ ভোগ করে ও অবশেষে তাহার মুক্তিলাভ হয়। সুতরাং জীবে পুরুষ ও প্রকৃতির মিলন

(১) সাংখ্যসূত্র ১।৬১ (২) যোগসূত্র ২।১৮

অর্থপূর্ণ, তাহা আকস্মিক বা অবান্তর নহে, বস্তুতঃ জীবের দ্বিবিধ উদ্দেশ্যসাধনই প্রকৃতির স্বরূপ(১)। সুতরাং যোগ-দর্শনের ও গীতার উপদেশে বিশেষ পার্থক্য নাই। গীতা বলিয়াছেন,—সবিকারা প্রকৃতি চিন্ময় ঈশ্বরের লয়োদয়শীল মহিমা আর জীব তাঁহার চিরন্তন অংশ অর্থাৎ মহিমাবর্জ্জিত চৈতন্যমাত্র, তথাপি প্রকৃতির রাজ্যে জীব ব্যবহারার্থ প্রকৃতিস্থ ইন্দ্রিয়বর্গকে আকর্ষণ করে, ফলে তাহার সুখদুঃখভোগ ঘটে, কিন্তু পরে জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইলে সে আপনার নিত্য চিন্মাত্ররূপে ও প্রকৃতির অনিত্য বিস্তারে প্রভেদ উপলব্ধি করে। যোগদর্শন এই প্রসঙ্গে ঈশ্বরের উল্লেখ করেন নাই সত্য, কিন্তু জ্ঞানযোগের উপদেশে তাহার প্রয়োজন ছিল না। সুতরাং শাস্ত্রদ্বয়ে বিরোধ কল্পনা করিবার সঙ্গত হেতু নাই।

জ্ঞানযোগ ও পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব

গীতার ঈশ্বরবাদেও সাংখ্যীয় পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব নিরাকৃত হয় নাই(২)। এই তত্ত্বনির্দ্দেশ বিভিন্ন জাতীয় পদার্থের পরিগণনা নহে, সৃষ্টির সম্পূর্ণ ব্যাখ্যাও ইহাতে নাই। জ্ঞানযোগে অর্থাৎ চিত্তের ক্রমিক লয়ে যে সকল ভাব পরীক্ষিত ও পরিত্যক্ত হয় ও অবশেষে যোগী যে দুইটির পরোক্ষ সন্ধান লাভ করেন, তাহাদিগের সুশৃঙ্খল উল্লেখই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য, কারণ তাদৃশ উল্লেখের অভাবে সাধনায় বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা থাকে। মহাভূত ও তন্মাত্রে বস্তুগত ভেদ নাই, যেহেতু প্রত্যেক মহাভূত সংসৃষ্ট তন্মাত্রের প্রচয়মাত্র। বরং ভৌতিক ও ভূতে প্রভেদ অধিক, কারণ বিসদৃশ ভূতের সমাবেশে ভৌতিকের উৎপত্তি। অথচ ভৌতিকের স্থান পঞ্চবিংশতি তত্ত্বে নাই, কিন্তু মহাভূতের আছে, যেহেতু সংখ্যাতীত ভৌতিকের পরিদর্শন অসম্ভব ও ভূততত্ত্ব অন্তর্হিত হইলে ভৌতিক আর

(১) যোগসূত্র ২।২১ (২) গীতা ১৩।৫,৬

চিত্তকে অধিকার করে না বলিয়া তাহার পৃথক্ উল্লেখ অনাবশ্যক। পুনশ্চ, ইন্দ্রিয় ও তাহার বিষয়ে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, অর্থাৎ গ্রহণবিযুক্ত গ্রাহ্য ও গ্রাহ্যবিযুক্ত গ্রহণ অবাস্তব। তথাপি তাহারা পৃথক্ তত্ত্বরূপে পরিগণিত হইয়াছে, যেহেতু বহির্জগতের বার্ত্তা ইন্দ্রিয়পথে গৃহীত না হইলেও বাহ্যবোধ স্মৃতি ও কল্পনার আকারে একাদশ ইন্দ্রিয়ে উদিত হয়, অথচ ইহাদিগের নিরোধও জ্ঞানযোগে প্রয়োজন।

জ্ঞানযোগ প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরবাদের বিরোধী নহে

বস্তুতঃ সাধক স্থূলের পরে সূক্ষ্ম ও তাহার পরে সূক্ষ্মতর তত্ত্ব প্রত্যাহার করিবেন, তত্ত্বনির্দ্দেশে অভিপ্রায় এইরূপ, কারণ এই প্রণালী অবলম্বন করিলে তাঁহার চিত্ত স্বকারণে লীন হইবে। শাস্ত্রমতে সমষ্টির প্রলয়ও এই প্রকারে ঘটে, আর সৃষ্টিক্রম ইহার বিপরীত। সুতরাং সৃষ্টিক্রমের বর্ণনায় বলা হইয়াছে—প্রকৃতি হইতে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয়গ্রাম ও পঞ্চ তন্মাত্র আর তন্মাত্র হইতে পঞ্চ মহাভূত উৎপন্ন হয়। কিন্তু সৃষ্টির পরে প্রলয় ও প্রলয়ের পরে সৃষ্টি প্রবাহরূপে নিত্য। সুতরাং আশঙ্কা হইতে পারে,—জ্ঞানযোগীর কঠোর তপস্যা আত্মপ্রতারণামাত্র কারণ শাশ্বতী মুক্তি আকাশকুসুমের ন্যায় অযুক্ত কল্পনা। কিন্তু সাংখ্যে মুক্তির অর্থ দুঃখের সহিত সংযোগের বিয়োগ, প্রকৃতি হইতে বিয়োগ নহে। পতঞ্জলি বলিয়াছেন, চরিতার্থ যোগিগণের কর্ম্ম শুক্ল বা কৃষ্ণ নহে অর্থাৎ সুখ বা দুঃখের হেতু হয় না(১)। সুতরাং প্রকৃতির সংসর্গ যে দোষাবহ তাহা সাংখ্য প্রচার করেন নাই। যাহা দোষাবহ তাহা যোগসূত্রে ও ভাষ্যে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। পুরুষ বা স্ববোধ ও বুদ্ধি বা করণসহযোগে বিষয়ের গ্রহীতায় যে অভেদবোধ হয় তাহাই বন্ধনের হেতু

(১) যোগসূত্র ২।১৭

অর্থাৎ যাবতীয় অনর্থের মূল(১)। আর তাহারই প্রতিষেধার্থ জ্ঞানযোগী উক্ত তপস্যায় নিযুক্ত হন, কারণ তপস্যা সম্পূর্ণ হইলে সুস্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে শব্দস্পর্শাদি অনিত্য গ্রাহ্য পদার্থ পুরুষের সম্পত্তি নহে, চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়গ্রামও তিনি নহেন, এমন কি, বিষয় ব্যবহারার্থ ব্যক্তিবিশেষরূপে বিশ্বে তাঁহার অবস্থান অনিবার্য্য নহে। গীতার মতেও গ্রাহ্য, গ্রহণ ও গ্রহীতা ঈশ্বরের অন্তর্গত হইলেও শান্ত, অসঙ্গ ভাবই তাঁহার 'পরম ধাম', 'অব্যয় পদ'। এই নিরুপদ্রব অক্ষয় পদে প্রতিষ্ঠার জন্য জ্ঞানযোগী অন্য অনিত্য ভাবগুলি চিরতরে নিরুদ্ধ করেন, আর তাদৃশ নিরোধের ফলে তাঁহার দুঃখনিবৃত্তি বা সাংখ্যসম্মত মুক্তি হয়।

সুতরাং তাঁহার সাধনা ঈশ্বরবাদের প্রতিকূল নহে। গীতার ঈশ্বরবাদ প্রসিদ্ধ, অথচ গীতা শ্রদ্ধাসহকারে একাধিকবার জ্ঞানযোগের উল্লেখ করিয়াছেন। বস্তুতঃ, ষষ্ঠ ও অষ্টাদশ অধ্যায়ে ইহার বর্ণনাও আমরা পাই, আর তাহা সংক্ষিপ্ত হইলেও পূর্ণ ও বিশদ। মিতাচার, ইন্দ্রিয়সংযম, চিত্তশুদ্ধি, আসন, ধ্যান, বৈরাগ্য, একাগ্রতা ও নিরোধ যথাবৎ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পক্ষান্তরে, যে সাংখ্যগ্রন্থে জ্ঞানযোগের সবিশেষ বিবৃতি আছে, তাহার অভিমতেও সমাধিসিদ্ধির জন্য ঈশ্বর-প্রণিধান আবশ্যক। সুতরাং দেশ, কাল ও পাত্র অনুসারে উপদেশের বিভিন্ন অংশে গুরুত্ব আরোপিত হইলেও গীতার ও যোগসূত্রের উপদেশ মূলে একই, অর্থাৎ প্রাচীন সাংখ্যশাস্ত্রে ঈশ্বরবাদ প্রত্যাখ্যাত হয় নাই। প্রতিবাদী হয়ত' বলিবেন,—যোগদর্শনে পতঞ্জলির অভিজ্ঞতাই সূত্রাকারে বিন্যস্ত হইয়াছে, সুতরাং কপিলপ্রবর্ত্তিত সাংখ্যশাস্ত্রের যথাযথ প্রতিরূপ তাহাতে

(১) যোগসূত্র ২।১৭ (ব্যাসভাষ্য)

না থাকিতেও পারে। কিন্তু কপিলের উপদেশে ঈশ্বর উপেক্ষিত হইলে, শ্বেতাশ্বতরের মত শ্রুতি কখন বলিতেন না যে ঈশ্বর তাঁহাকে পূর্ণ জ্ঞান দিয়াছিলেন। তাঁহার প্রশিষ্য ও আদি সাংখ্যগ্রন্থের রচয়িতা পঞ্চশিখাচার্য্য মহাভারতে পঞ্চরাত্রবিশারদ বলিয়া প্রখ্যাত, অথচ পঞ্চরাত্র সর্ব্বব্যাপী নারায়ণের উদ্দেশে বিশিষ্ট যজ্ঞের নাম। সুতরাং মূল সাংখ্যে নিরীশ্বরবাদ প্রচারিত হইয়াছিল—এ আশঙ্কা অমূলক।

সাংখ্যের দ্বৈতবাদ

তথাপি তুলনামূলক পরীক্ষার পরে বলা হয়,—সাংখ্যের দ্বৈতবাদেও শ্রুতির তথা গীতার অদ্বৈতবাদে বিরোধ অসমাধেয়, কারণ সাংখ্য প্রকৃতির স্বাতন্ত্র্য প্রচার করিয়াছেন, অথচ শ্রুতি ও গীতার মতে পুরুষের অতীত কিছুই নাই। প্রকৃতি সম্বন্ধে সাংখ্যের সিদ্ধান্ত পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। জ্ঞানযোগীর দৃষ্টিভঙ্গী ও সাধনার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এস্থলে আরও কিছু বলিব। তাঁহার অভিজ্ঞতায় সংসার বোধাত্মক বিষয়জাতের প্রবাহ আর ইহাদিগের অধিকাংশই দুঃখজনক। সুতরাং অপকৃষ্ট ও অবাস্তর বোধগুলি ক্রমশঃ নিরুদ্ধ করিয়া পরিণামবর্জ্জিত বোদ্ধার অনুচিন্তনে তিনি নিবিষ্ট হন। কিন্তু এই চিন্তাও লয়োদয়শীল অর্থাৎ পূর্ণ ও শাশ্বত শান্তি দিতে অক্ষম। অতএব অবশেষে তিনি সর্ব্ববিধ চিত্তবৃত্তিই নিরুদ্ধ করেন, আর নিরন্তর অভ্যাসের ফলে বিক্ষেপের সংস্কার পর্য্যন্ত অপগত হইলে তাঁহার কৈবল্য লাভ হয় অর্থাৎ পুরুষ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। কিন্তু কৈবল্য কি আর পুরুষের স্বরূপই বা কেমন? ব্যাসদেব বলিয়াছেন, সাধকের চিত্তে গুণত্রয়ের অধিকার সমাপ্ত হইলে যে শান্ত, নির্লিপ্ত ভাবের উদয় হয়, তাহাই কৈবল্য অথবা পুরুষের স্বরূপ(১)। সত্য বটে, কোন

(১) যোগসূত্র ৪।৩৪ (ব্যাসভাষ্য)

কোন মনস্বীর মতে তাহা অবিশেষ জ্ঞানমাত্র; কিন্তু তাদৃশ বোধ সম্ভব হইলেও দৃশ্যই হইবে, অথচ 'আত্মা' ও 'পুরুষ' এই শব্দ দুইটির নিগূঢ় অর্থ গ্রহণ করিলে দেখা যায় শাস্ত্রের লক্ষ্য স্ববোধের প্রতি, আর স্ববোধে দ্রষ্টা ও দৃশ্য উভয়ই ওতপ্রোত-ভাবে বর্ত্তমান। সুতরাং চিত্তলয়েও পুরুষ ও প্রকৃতির একান্ত বিচ্ছেদ হয় না, অনিত্য বিকারজাতেরই উচ্ছেদ হয়।

এখন সাংখ্যীয় উপপত্তিগুলি একত্র লইলে ধারণা কিরূপ হয় তাহা বলিতেছি। ভোগ ও অপবর্গ ব্যতীত জীবের অন্য কোন উদ্দেশ্য সম্ভব নহে, আর এই দ্বিবিধ উদ্দেশ্য প্রকৃতি কর্ত্তৃক সাধিত হয়; প্রকৃতি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই জীবের এই বিরুদ্ধ উদ্দেশ্যদ্বয় সাধন করে, আর অপবর্গ বা মুক্তির অব্যবহিত পূর্ব্বে শুদ্ধবুদ্ধিরূপে পুরুষের মতই হয়(১); অর্থাৎ কেবল বন্ধনে নহে, মুক্তিতেও প্রকৃতি পুরুষের অনুষঙ্গ। সুতরাং যুক্ত অনুমান এই, প্রকৃতি বা শক্তি ও পুরুষ নিত্যসম্বদ্ধ সুতরাং পরস্পরাপেক্ষ। এই অভিমত আমরা শ্রুতি ও গীতায়(২) পাই, আর যোগদর্শন বলিয়াছেন পুরুষের প্রয়োজনমত প্রবৃত্তিই প্রকৃতির আত্মা বা স্বরূপ। অথচ পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের পরি-গণনায় সাংখ্য প্রকৃতিকে পৃথক্ স্থান দিয়াছেন। তাহার কারণ ব্যবহার পরীক্ষাপূর্ব্বক তত্ত্ব স্থির করা হইয়াছে, যেহেতু ব্যবহারের অনিশ্চয়তা ও অপূর্ণতা অতিক্রম করিবার উপায় উদ্ভাবনই সাংখ্যের মুখ্য উদ্দেশ্য, আর ব্যবহারে প্রকৃতিই সর্ব্ববিধ কর্ম্মের হেতু ও পুরুষ নিষ্ক্রিয়। গীতাও এই সত্য অঙ্গীকার করিয়া বলিয়াছেন, প্রকৃতির কর্ত্তৃত্ব অবাধ ও বিশ্বব্যাপী যদিও অহঙ্কারের ছলনায় আত্মা কর্ত্তারূপে প্রতীত হন(২)। কিন্তু এই বিভাগ দেশকালাবচ্ছিন্ন সংসারী পুরুষের

(১) যোগসূত্র ৩।৫৫ (ব্যাসভাষ্য) (২) গীতা ৩।২৭

পক্ষেই প্রযোজ্য, চরম তত্ত্বে নহে। যোগদর্শন ঈশ্বরের ঈশিত্ব ক্ষুণ্ণ করেন নাই আর গীতা বলিয়াছেন প্রকৃতি তাঁহারই। সুতরাং সাংখ্য নিরীশ্বরবাদ নহে।

সাংখ্যের পুরুষ-বহুত্ব গীতার ও শ্রুতির উপদেশের অনুযায়ী

প্রতিবাদী বলিতে পারেন,—সাংখ্যের উপদেশ অনুসারে প্রত্যেক জীবে পুরুষ পৃথক্, সুতরাং সাংখ্য ঈশ্বরবাদের বিরোধী না হইলেও, অদ্বৈতবাদ ও ইহাতে অসঙ্গতি অনপনেয়। কিন্তু সাংখ্যসম্মত পুরুষবহুত্বের অর্থ সম্বন্ধে মতদ্বৈধের অবকাশ আছে। কারিকা বলিয়াছেন, 'একই ক্ষণে কেহ জন্মিতেছে, কেহ মরিতেছে, বিভিন্ন ইন্দ্রিয়সংঘাতের বিবিধভোগ ঘটিতেছে, অন্তঃকরণগুলিরও প্রবৃত্তি বিসদৃশ হইতেছে; অতএব পুরুষ বহু(১)। বস্তুতঃ প্রাণিগনের অনুভব ও আচরণ পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, তাহাদিগের জ্ঞানে, কর্ম্মে ও ভোগে সমতা নাই। সুতরাং প্রতিজীবে স্বতন্ত্র পুরুষের অধিষ্ঠান অনুমান করা সঙ্গতই মনে হয়। কিন্তু কেবল ব্যবহার পরিদর্শন পূর্ব্বক কারিকা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন; অতএব পুরুষ এই প্রসঙ্গে সাধারণ ভোক্তা ও কর্ত্তা, অর্থাৎ অহঙ্কার। প্রকৃত পুরুষ বহুসংখ্যক হইলেও সর্ব্বতোভাবে সদৃশ হইবেন, যেহেতু স্ববোধমাত্রে গুণকর্ম্মের বিভাগ কল্পনীয় নহে। সুতরাং তাঁহাদিগের সান্নিধ্যে প্রকৃতির বহু পরিণাম হইলেও বিচিত্র পরিণাম হইবে না। একই শক্তি বহুস্থলে সমভাবে উদ্রিক্ত হইলে বহু ফলপ্রসূ হয় সত্য; কিন্তু ফলগুলিতে কোন বৈলক্ষণ্য থাকে না। আর পুরুষ প্রকৃতির সংযোগে স্থলভেদের কল্পনাও অন্যায্য।

কারিকার আর একটি যুক্তির তাৎপর্য্য বোধ হয় এইরূপঃ— প্রকৃতি বা জীবনিচয়ের চরম উপাদানে ভেদ নাই, সুতরাং

(১) সাংখ্যকারিকা ১৮

পুরুষ একাধিক, নচেৎ উভয়ের সংযোগে একটিমাত্র জীবের উদ্ভব হইত; অথচ চৈত্র ও মৈত্র আপনাদিগকে সতত পৃথক্ মনে করেন। কিন্তু এই পার্থক্য কিসে? আমরা উক্ত যুক্তির অনুকূল একটি উদাহরণ লইব। কোন ব্যক্তির যমজ সন্তান হইল; রূপে ও আয়তনে একটি অন্যের প্রতিকৃতি, আর একই জননীর স্তন্য উভয়ে পান করিল; তাহাদিগের নামকরণে কোন প্রভেদ করা হইল না। পরে একই পিতার যত্নে ও পৈতৃক আবাসে তাহারা শৈশব অতিক্রম করিল। তথাপি তাহারা আপনাদিগকে অভিন্ন বোধ করিল না, বরং পরস্পরের নির্দ্দেশে 'আমি' ও 'তুমি' ব্যবহার করিতে লাগিল। কেন? দেহ ও ইন্দ্রিয়গ্রাম অনুরূপ হইলেও ভিন্ন; সংস্কারগত প্রবৃত্তিতে ভেদ অনিবার্য্য, আর দৈনন্দিন অনুভব সর্ব্বত্র ও সর্ব্বক্ষণে তুল্য নহে। সুতরাং ভেদবোধের যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান, কিন্তু কারণগুলি প্রকৃতির সীমা লঙ্ঘন করে না, অর্থাৎ চিন্মাত্র পুরুষের সহিত তাহাদিগের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নাই।

এই সত্য কারিকা অস্বীকার করিয়াছেন কি? অষ্টাদশ শ্লোকের তাৎপর্য্য পূর্ব্বে দিয়াছি। এখন উনবিংশ শ্লোকটি পরীক্ষা করিব। তাহাতে বলা হইয়াছে, পুরুষ সাক্ষিমাত্র। সুতরাং জীব এক বা একাধিক হউক, তাঁহার সংখ্যা জীবের সংখ্যা অনুসারে নিরূপিত হয় না। ব্যবহারেও একই সাক্ষী বহু ব্যক্তির বিভিন্ন আচরণ প্রকাশ করিতে সক্ষম হয়। পুনশ্চ কারিকার মতে পুরুষ মধ্যস্থের ন্যায়, অর্থাৎ কোন ব্যক্তির প্রতি তাঁহার পক্ষপাত নাই, সুতরাং সকল বিষয়ই তাঁহার সন্নিধানে নিরপেক্ষভাবে প্রকাশিত হয়। বস্তুতঃ সুখ ও দুঃখের তিনি সমভাবে দ্রষ্টা আর ফলানুসন্ধী কোন প্রবৃত্তি

তাঁহাতে নাই, অতএব জীবজগতে প্রবৃত্তির বৈচিত্র্যের জন্য তিনি দায়ী নহেন। দায়ী স্বয়ং প্রকৃতি; তাহাকে এক বলা হয় বটে, কিন্তু কারিকা ও অন্যান্য সাংখ্যগ্রন্থের মতে পরস্পরবিরুদ্ধ অথচ সততসম্বদ্ধ গুণত্রয়ের প্রলয়কালীন সাম্য এই একত্ব। অতএব প্রকৃতির একত্বে জটিলতা বর্ত্তমান, আর তাহাই অভিব্যক্তিতে বিবিধ ভাবের পর্যাপ্তহেতু। বুদ্ধি হইতে পঞ্চভূত পর্য্যন্ত সমুদায়ই প্রকৃতির বিকার, আর যে সকল বৈষম্যের উল্লেখ কারিকায় আছে, তাহাদিগের উদ্ভব ও সমর্থন উক্ত বিকারগুলিতে দেখা যায়, অন্যত্র নহে। বহুত্ববাদের সপক্ষে বলা হয় বটে—পুরুষ এক হইলে জীবনিচয় যুগপৎ মুক্তিলাভ করিত, অথচ শাস্ত্রে ও জনশ্রুতিতে তাদৃশ সর্ব্বজনীন মোক্ষের উদাহরণ নাই। কিন্তু মুক্তি কাহার হয়? পুরুষের বন্ধন বা মুক্তি বা দেহ হইতে দেহান্তরে গতি নাই; প্রকৃতিই বদ্ধ ও মুক্ত হয় আর বদ্ধাবস্থায় বিবিধ দেহ পরিগ্রহ করে(১)। কৈবল্যও প্রকৃতপ্রস্তাবে পুরুষের হয় না, কারণ তিনি সতত কেবল; পরন্তু জীবন্মুক্ত এই অবস্থা উপভোগ করেন, যেহেতু সংসারে থাকিয়াও তিনি সংসারে লিপ্ত হন না। তথাপি পুরুষবহুত্ব কারিকার একটি স্থির সিদ্ধান্ত, কারণ প্রাকৃতিক বিস্তারের উল্লেখে ব্যবহারের বৈচিত্র্য ব্যাখ্যাত হইলেও বহু আত্মবোধের সম্যক্ ব্যাখ্যা তাহাতে নাই।

কিন্তু কেবল সাংখ্যই কি পুরুষবহুত্ব প্রচার করিয়াছেন? শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন, এমন কোন সময় ছিল না যখন আমি ছিলাম না বা তুমি ছিলে না বা উপস্থিত নৃপতিগণ ছিলেন না, পুনশ্চ এমন কোন সময় আসিবে না যখন আমরা সকলে থাকিব না(২)। গীতার মতে জীব বা এই পুরুষ

(১) সাংখ্যকারিকা ৬২ (২) গীতা ২।১২

ব্রহ্মের চিরন্তন অংশ, অর্থাৎ তাঁহার উপাধিপরিচ্ছিন্ন ভাব জীবে বর্ত্তমান; আর তাহাই সাধারণতঃ পুরুষ নামে খ্যাত (১)। কারিকা কিন্তু পুরুষের দ্বিবিধ বর্ণনা দিয়াছেন। একটিতে পুরুষ অনিত্য ব্যবহারের কর্ত্তা ও ভোক্তা, আর ব্যবহার বিবিধ বলিয়া এই পুরুষও বহু। অন্যটিতে পুরুষ নির্লিপ্ত ও নির্বিকার সুতরাং ব্যবহারে সাক্ষিমাত্র, অথচ তাদৃশ পুরুষ যে এক তাহা কারিকা বলেন নাই। অন্য শাস্ত্রে কি বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করা হইয়াছে? শ্রুতি বলিয়াছেন, যাঁহারা অধ্যাত্মযোগের প্রভাবে পরমতত্ত্ব উপলব্ধি করেন, তাঁহারা হর্ষশোকের অতীত হন, (২) অর্থাৎ এই অসংসারী ভাব উপযুক্ত সাধনার ফলে সকলেই লাভ করিতে পারে, সুতরাং ব্যক্তিবিশেষে ইহা সীমাবদ্ধ নহে। গীতাও বলিয়াছেন, অনেকে আসক্তি, ভয় ও ক্রোধ বর্জ্জন পূর্ব্বক সম্যক্‌রূপে ঈশ্বরের শরণ লইয়া তাঁহার মতই হইয়াছেন, অর্থাৎ তাঁহাদিগকে আর অবশভাবে সংসারে জন্মগ্রহন ও মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না (৩)। অতএব শ্রুতি ও গীতা উভয়েই উক্ত দ্বিবিধ পুরুষের বহুত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন, অথচ এই শাস্ত্রদ্বয় অদ্বৈতবাদের সুদৃঢ় স্তম্ভ।

তথাপি সাংখ্যকে দ্বৈতবাদ বলা হয় কেন? কোন কোন সাংখ্য গ্রন্থে প্রকৃতির স্বাতন্ত্র্য নিঃসঙ্কোচে খ্যাপিত হওয়ায় এই অভিমত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। কারিকার মতে পুরুষের লক্ষণ ও প্রকৃতির গুণ সম্পূর্ণ বিপরীত। অথচ বিরুদ্ধ-স্বভাব পদার্থদ্বয়ের সর্ব্বত্র সমঞ্জসভাবে মিলন হয় কেন, তাহা কারিকা বলেন নাই। বরং সমস্যা আরও জটিল করিয়া বলা হইয়াছে, এই সংযোগে যাহা স্বভাবতঃ অচেতন তাহা সচেতনের মত হয় আর যিনি প্রকৃতপক্ষে উদাসীন তাঁহাকে

(১) গীতা ১৫।৭ (২) কঠ ১।২।১২ (৩) গীতা ৪।১০

কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষী কর্ত্তার ন্যায় দেখায়(১)। স্বভাবের উচ্ছেদে পদার্থের বিনাশ ঘটে ; সুতরাং কেহ কেহ অনুমান করেন, উভয়ক্ষেত্রে অধ্যাসমাত্র হয়। কিন্তু অধ্যাস বা সংক্রমণ যাহাই হউক, তাহার ফল কারিকায় নিম্নোক্ত উপমা কয়টিতে বর্ণিত হইয়াছে। পুরুষ চৈতন্যমাত্র ও নিষ্ক্রিয়, সুতরাং পঙ্গুর মত আর প্রকৃতি অচেতন কিন্তু ক্রিয়াশীল, সুতরাং অন্ধের ন্যায়। তাহাদিগের কেহই স্বচেষ্টায় লক্ষ্যস্থলে উপনীত হইতে পারে না, কিন্তু পরস্পরকে নিয়ত সাহায্য করায় তাহাদিগের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়(২)। মাতৃস্তন্য যেরূপ সন্তানের পুষ্টির জন্য স্বতঃ ক্ষরিত হয়, প্রকৃতিও কোন প্রেরণার অপেক্ষা না রাখিয়া পুরুষের অভাব মোচনের জন্য বিধিমত চেষ্টা করে(৩)। বস্তুতঃ মহত্তত্ত্ব হইতে মহাভূত পর্য্যন্ত সৃষ্টি করিয়া প্রকৃতি যাবতীয় পুরুষের কল্যাণ সাধনে তৎপর হয়। এই বিশ্বব্যাপী ও নিরন্তর তৎপরতা লক্ষ্য করিয়া মনে হয় প্রকৃতি আপনার জন্যই এই বিরাট অনুষ্ঠান করে, কিন্তু তাহার সকল প্রযত্নই প্রকৃতপক্ষে পুরুষের জন্য। সুতরাং পরহিতব্রতে আত্মনিয়োগই প্রকৃতির ধর্ম্ম, যদিও সেই পরের নিকট প্রত্যুপকারের কোন প্রত্যাশা নাই(৪)। অবশেষে ব্রত উদ্‌যাপিত হইলে প্রকৃতি অব্যক্ত হয় ; তাহার এই ব্যবহার নর্ত্তকীর আচরণের মত, কারণ কৌতুকজনক ভাবভঙ্গী দেখাইয়া নর্ত্তকী লোকচক্ষুর অন্তরালে যায়(৫)।

উপমাগুলি সুন্দর বটে, রসগ্রাহী পাঠকের উপভোগ্য ; কিন্তু তাহাদিগের নিগূঢ় তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে

(১) সাংখ্যকারিকা ২০ (২) সাংখ্যকারিকা ২১
(৩) সাংখ্যকারিকা ৫৭ (৪) সাংখ্যকারিকা ৬০
(৫) সাংখ্যকারিকা ৫৯

বিশেষ সতর্কতা আবশ্যক। প্রথম উপমায় বলা হইয়াছে, পুরুষ ও প্রকৃতির উদ্দেশ্য অনুরূপ হইলেও পৃথক্, তথাপি সহযোগের ফলে উভয়েরই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। দ্বিতীয় উপমার অর্থ—প্রকৃতির কোন লাভের সম্ভাবনা নাই, কেবল পুরুষের মঙ্গলের জন্য তাহার প্রবৃত্তি। তৃতীয় উপমায় দেখি,—প্রকৃতির বিশাল ও বিচিত্র আয়োজনে মনে হয় তাহার স্বার্থ আছে, অথচ পুরুষের জন্য সে সকলই করে। আর চতুর্থ উপমায় বলা হইয়াছে, এই পরহিতার্থ আত্মোৎসর্গ সফল হইলে প্রকৃতি নিষ্ক্রিয় হয়, এমন কি, তাহার অস্তিত্বের কোন প্রমাণ থাকে না। এখন এই উপমাগুলিতে যে সঙ্গতি নাই তাহা সুস্পষ্ট। আর কারিকার শ্রেষ্ঠ সিদ্ধান্তে ইহাদিগের নির্দ্দেশ প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে, কারণ কারিকা বলিয়াছেন,— পুরুষের বন্ধন বা মুক্তি বা দেহ হইতে দেহান্তরে গতি হয় না, নানাশ্রয়া প্রকৃতিই যথাক্রমে বদ্ধ ও মুক্ত হয় আর মুক্তির পূর্ব্বে বিবিধ দেহ পরিগ্রহ করে(১)।

সাংখ্যকারিকার তত্ত্বনির্দ্দেশ অসম্পূর্ণ

কিন্তু কারিকার উদ্দেশ্য ও সীমা স্মরণ রাখিলে এই অসঙ্গতি গুরুতর বোধ হয় না, কারিকার দ্বৈতবাদও যে আপেক্ষিক তাহা দেখা যায়। কারিকা দুঃখনিবৃত্তির জন্য জ্ঞানযোগ অনুমোদন করিয়াছেন, আর এই পথে সংসারের অনিত্য বিস্তারে উপেক্ষা পূর্ব্বক নির্বিকার ভাবে স্থিতিই লক্ষ্য। চিরশান্ত ভাব কেবল ঈশ্বরের, সন্দেহ নাই। ব্যাসদেব বলিয়াছেন, অনেকে তপস্যার প্রভাবে হীন অবস্থা হইতে বর্ত্তমানে শান্তি লাভ করিয়াছেন, আর অনেকে বর্ত্তমানে শান্তি উপভোগ করিলেও পরে তাহা হারাইবেন; ঈশ্বর কিন্তু নিত্যমুক্ত(২)। তথাপি যাঁহারা জ্ঞানযোগ সাধন করেন,

(১) সাংখ্যকারিকা ৬২ (২) যোগসূত্র ১।২৪ (ব্যাসভাষ্য)

তাঁহাদিগের পক্ষে ঈশ্বরের চিন্তাও বিক্ষেপের কারণ হইতে পারে, কারণ উৎকৃষ্ট উপদেশ সত্ত্বেও সাধনার প্রারম্ভে ঈশ্বর সম্বন্ধে অযুক্ত ধারণাই সম্ভব। গীতা জ্ঞানযোগের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়া বলিয়াছেন, যাঁহারা নিরন্তর অভ্যাসের ফলে কামনা ও দুঃখের অতীত হইয়াছেন অর্থাৎ যাঁহাদিগের চিত্ত সতত প্রসন্ন ও সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টিযুক্ত, কেবল তাঁহারাই ঈশ্বরে পরা ভক্তি লাভ করেন ও সেই ভক্তির মহিমায় ঈশ্বরের স্বরূপ ও প্রকাশ যথাবৎ অবগত হন(১)।

পরন্তু যাঁহারা জ্ঞানযোগ আরম্ভ করিয়াছেন মাত্র, তাঁহাদিগের পক্ষে স্থিরদৃষ্টি অত্যন্ত কঠিন অথচ নিতান্ত আবশ্যক। সুতরাং কারিকা প্রকৃতির পরিণাম অগ্রাহ্য করিয়া পুরুষের নিত্যত্বে অবহিত হইতে উপদেশ দিয়াছেন। পুরুষ ও প্রকৃতিকে বিরুদ্ধতত্ত্বরূপে গ্রহণ করা এই উপদিষ্ট সাধনার অনুকূল, ও সেইজন্যই বোধ হয় দ্বৈতবাদ সমর্থিত হইয়াছে। তথাপি কারিকা বলিয়াছেন, পুরুষ বা প্রকৃতি স্বতন্ত্রভাবে সৃষ্টি করে না, তাহাদিগের সংযোগই সৃষ্টির হেতু। এই সংযোগ কি সান্নিধ্য? দেশে ও কালে সান্নিধ্য সম্ভব, আর গুণে সমতাকেও সান্নিধ্য বলা যায়। কিন্তু পুরুষ ও প্রকৃতি দেশ ও কালের অতীত, কারণ সৃষ্টিতেই দেশ ও কালের উদ্ভব। গুণে বা ভাবে সমতাও তাহাদিগের মধ্যে নাই, যেহেতু কারিকা তাহাদিগের বৈপরীত্যই প্রচার করিয়াছেন। পরস্পর সংক্রমণ কি তাহা হইলে এই সংযোগ? সাংখ্যমতে পুরুষের সংক্রমণ নাই আর প্রকৃতি ক্রিয়াশীল হইলেও পুরুষ অবিকার্য্য। কারিকা বলিয়াছেন বিরুদ্ধ তত্ত্বদ্বয়ের সংযোগে প্রত্যেক তত্ত্বে বিপরীত গুণের অধ্যাস হয়। ঈদৃশ দ্বিবিধ অধ্যাসই কি তাহা

(১) গীতা ১৮।৫৪,৫৫

হইলে সৃষ্টির হেতু? না, এই অনুমান অগ্রাহ্য, কারণ ইহা গ্রহণ করিলে সাংখ্যকে মায়াবাদের চূড়ান্ত বলিতে হয়, অথচ কোন পক্ষই সাংখ্যকে এইরূপে লক্ষিত করেন নাই। অতএব সরল ও সঙ্গত অনুমান এই,—পুরুষ বা প্রকৃতি কোনটি চরম তত্ত্ব নহে, পরন্তু বিসদৃশ হওয়ায় পরস্পরের অনুপূরকভাবে তাহারা সতত সম্বদ্ধ।

কিন্তু কারিকার দ্বৈতবাদ এই সিদ্ধান্তের বিরোধী নহে কি? সংশয়টি নিরসনের জন্য স্থির করা আবশ্যক, কাহাকে কারিকা পুরুষ বলিয়াছেন ও প্রকৃতিই বা তাঁহার মতে কিরূপ? অবস্থা অনুসারে তাহাদিগের বিবিধ সম্বন্ধ পূর্ব্বোক্ত উপমাগুলিতে বর্ণিত হইয়াছে; সুতরাং এই প্রসঙ্গে তাহাদিগের আরও কিছু আলোচনা বাঞ্ছনীয়। সংসারের কুহকে সন্দিহান হইয়া মানব জ্ঞানযোগে প্রবৃত্ত হয়। তখন তাহার দেহ ও ইন্দ্রিয় পরিশ্রান্ত আর অন্তরস্থ অস্মিতাও কৈবল্যের প্রার্থী, অর্থাৎ ক্রিয়াশীল প্রকৃতি ও নিষ্ক্রিয় পুরুষ উভয়েই ব্যবহারের জটিলতা ও ব্যর্থতা হইতে নিষ্কৃতির জন্য ব্যগ্র; উদ্দেশ্য এক হওয়ায় তাহারা যেন পরামর্শ করিয়া সহযোগে একই মার্গে অগ্রসর হয়। এই অবস্থার বর্ণনায় অন্ধ ও পঙ্গুর উপমা নির্দ্দোষ। বস্তুতঃ জ্ঞানযোগের সূচনা ইহাতে বিবৃত হইয়াছে; সাধকের আত্মভাবই পঙ্গুপুরুষ ও দেহেন্দ্রিয়াদি অন্ধ প্রকৃতি। পরে অভ্যাসের গুণে আসন, প্রত্যাহারাদি ক্রিয়ায় সঙ্কল্প ও চেষ্টার কোন অপেক্ষা থাকে না পরন্তু ইহাদিগের ফলে আত্মজ্ঞানই পরিস্ফুট হয়, অর্থাৎ প্রকৃতির কোন লাভ হয় না। এই অবস্থার বর্ণনায় বৎসের জন্য স্তন্যের যন্ত্রচালিতবৎ ক্ষরণ যুক্ত উপমা, কারণ ইহাতে পুরুষের নির্দ্দেশ আর প্রয়োজন হয় না যেহেতু প্রকৃতির ক্রিয়া অভ্যাসবশতঃ ইচ্ছানিরপেক্ষ

হয়। অন্য একটি উপমায় প্রকৃতিকে নর্ত্তকীর সহিত তুলনা করা হইয়াছে। পুরুষ ভোগে রত থাকিতে প্রকৃতি তাহাকে রূপরসাদি উপহার দেয়, কিন্তু ভোগে তাহার বিরক্তি জন্মিলে প্রকৃতিও নিরস্ত হয়। প্রকৃতির এই ব্যবহার সত্য সত্যই নর্ত্তকীর আচরণের মত।

এখন জিজ্ঞাসা করি, এই পুরুষ কি সংসারী অথচ মোক্ষাভিলাষী জীব নহেন? আর প্রকৃতি কি তাঁহার করণবর্গ ব্যতীত অন্য কিছু? কিন্তু কারিকা অবশেষে বলিয়াছেন, পুরুষের বন্ধন বা মুক্তি বা সংসরণ নাই, এ সকল প্রকৃতিরই ঘটিয়া থাকে। বহু বদ্ধ পুরুষ যে আছেন তাহা প্রত্যক্ষ; বহু মুক্ত পুরুষও যে আছেন তাহা অনুমেয়; কিন্তু যে পুরুষ বন্ধন ও মুক্তির অতীত, যিনি চৈতন্যস্বরূপ সুতরাং জীবনিচয়ের অন্তরাত্মা, অথচ অন্য কোন লক্ষণে যাঁহাকে লক্ষিত করা যায় না, তাঁহার সংখ্যা যে একাধিক তাহা বলিব কোন্ যুক্তিবলে? আর যে প্রকৃতির বিবিধরূপে বন্ধন বা দুঃখভোগ ও মুক্তি বা দুঃখনিবৃত্তি ঘটে, তাহাকে অচেতন বলিব কোন্ অর্থে? বস্তুতঃ কারিকার নির্দ্দেশ হইতে যুক্ত অনুমান এই,—শেষোক্ত প্রকৃতি ও পুরুষ অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্বদ্ধ আর সেই সম্বন্ধে চরমতত্ত্বের পূর্ণতার সন্ধান আছে।

কিন্তু এই অসম্পূর্ণতা যোগদর্শনে ও গীতায় নাই

কারিকা এই চরমতত্ত্ব পর্য্যন্ত অগ্রসর হন নাই, পরন্তু তাহার নিত্যসংযুক্ত দ্বিবিধ ভাবকে স্বতন্ত্র তত্ত্ব রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। এই অপূর্ণতা কি সমগ্র সাংখ্যশাস্ত্রের লক্ষণ? যাহা কারিকায় নাই, তাহা সাংখ্যের নহে,—এ অভিমত গ্রহণ করি না। যে নৈতিক উপদেশের জন্য সাংখ্য সুবিখ্যাত, যাহা গ্রহণ করায় প্রাচ্যে বৌদ্ধ ধর্ম্মের অনুপম প্রভাব হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ পর্য্যন্ত কারিকায় নাই। পরন্তু পতঞ্জলি ও

ব্যাসদেবের সাংখ্যপ্রবচনে নৈতিক উৎকর্ষকে পরমার্থের পথে প্রথম ও প্রধান সম্বল বলা হইয়াছে। পতঞ্জলি এই পাথেয়কে যম ও নিয়ম আখ্যা দিয়াছেন,(১) আর গীতায় ইহা দৈবী সম্পৎ নামে প্রসিদ্ধ(২)। কিন্তু কেবল নামেই প্রভেদ, কারণ সাংখ্যের সকল সম্প্রদায় অঙ্গীকার করেন যে অমনা হইবার পূর্ব্বে সুমনা হওয়া আবশ্যক। এখন জিজ্ঞাসা করি,—কারিকার মতে কি এই প্রকার উন্নতি নিষ্প্রয়োজন? গীতা ঈশ্বরকে পরম তত্ত্ব বলিয়াছেন, আর যোগসূত্রে ঈশ্বরপ্রণিধান সমাধি-সিদ্ধির উপায় বলিয়া আদিষ্ট হইয়াছে, অথচ কারিকায় ঈশ্বরের উল্লেখ নাই। সুতরাং প্রশ্ন হয়, কারিকা কি নিরীশ্বরবাদ প্রচার করিয়াছেন? প্রশ্ন দুইটির সদুত্তর দিবার জন্য কারিকার সীমা ও উদ্দেশ্য স্মরণ রাখা উচিত। যাঁহারা জ্ঞানযোগ অভ্যাস করিতে প্রস্তুত, তাঁহাদিগের পক্ষে এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা স্মারক-লিপির মত। সাধনার পদ্ধতি ও সিদ্ধির স্বরূপ ইহাতে সংক্ষেপে অথচ সুস্পষ্ট ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ তত্ত্বের উল্লেখও আছে বটে; কিন্তু এই তত্ত্বনির্দ্দেশ সম্পূর্ণ নহে, কারণ প্রস্তাব অনুসারে তাহা আবশ্যক হয় নাই। সুতরাং বিশাল ও উদার সাংখ্যধর্ম্মের একদেশিক পরিচয় মাত্র আমরা কারিকায় পাই।

পরমর্ষি কপিল এই ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক্। প্রত্যেক আর্য ধর্ম্ম বেদানুমত, অর্থাৎ ঈশ্বরবাদে সুপ্রতিষ্ঠিত। অধিকন্তু শ্রুতি বলিয়াছেন, ঈশ্বর কপিলকে পরম জ্ঞানে বিভূষিত করিয়াছিলেন। নিরীশ্বরবাদ প্রচারের জন্য কি তিনি এই সম্পদ্ লাভ করেন? কোন্ শুভক্ষণে কপিল কারুণ্যবশতঃ দুঃস্থ মানবকে ধর্ম্মোপ-দেশ দিয়াছিলেন, তাহা স্থির করা কঠিন, কারণ সে অতি প্রাচীন যুগের কথা। কিন্তু বর্ত্তমান কালেও দেখিয়াছি,

(১) যোগসূত্র ২।৩০,৩২; (২) গীতা ১৬।১-৩

যাঁহারা জ্ঞানযোগ অভ্যাস করেন, সাধনায় ও উপদেশে প্রণবই তাঁহাদিগের মহামন্ত্র, আর সর্ব্ববিধ আচরণে নারায়ণকে স্মরণ তাঁহাদিগের বিধি। তবে মধ্যযুগে অন্তর্দৃষ্টি ক্ষীণ হয় আর তর্কশাস্ত্রে আস্থা আপ্তবাক্যে শ্রদ্ধার স্থান অধিকার করে। তখন কোন কোন সাংখ্যাচার্য্য যুক্তিতর্কের সাহায্যে সকল সমস্যার সমাধান করিতে অগ্রসর হন আর পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের সুশৃঙ্খল বিবরণ দিয়া ধর্ম্মোপদেশ সাঙ্গ করেন। উহাতে ভক্তি, পরহিতৈষণা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার স্থান নাই; শুষ্কজ্ঞান উহার উপজীব্য ও তাহার অনুশীলন উহার সাধনা। তাদৃশ বিকলাঙ্গ সাংখ্য যথাকালে অনাদৃত হয়, কারণ তাহা ধর্ম্মই নহে। সুতরাং সাংখ্যের লুপ্ত গৌরব উদ্ধার করিতে হইলে, গীতা ও যোগদর্শনকে প্রামাণিক গ্রন্থরূপে গ্রহণ করা আবশ্যক।

উপনিষৎ, সাংখ্য ও গীতায় চরম তত্ত্ব

প্রাচীন উপনিষদ্‌গুলির শ্রেষ্ঠ উপদেশে চরমতত্ত্বের স্বরূপ ও প্রকাশ সন্নিবদ্ধ। স্বরূপে তিনি শুদ্ধ চৈতন্য, নিত্য ও নির্ব্বিকার, কিন্তু প্রকাশ তাঁহার নানারূপ ও প্রত্যেক প্রকাশ পরিণামী, অথচ স্বরূপ ও প্রকাশে দেশ, কাল বা নিমিত্তের ব্যবধান নাই। এ দৃষ্টি উদার, আরণ্যকের পক্ষে যথেষ্ট; কিন্তু নিত্যানিত্য বিচারে যাহারা অসমর্থ, তাহাদিগের জন্য সাধনার স্পষ্ট ইঙ্গিত ইহাতে নাই। সাংখ্য নিত্যানিত্যবিবেক অবলম্বন করিয়া দুইটি পরস্পরবিরুদ্ধ তত্ত্বের সন্ধান দিয়াছেন। একটি স্ববোধমাত্র, নিত্য একরূপ; অন্যটি বিষয়ভাব, একাকী অব্যক্ত তথাপি স্ববোধের সান্নিধ্যে বিশ্বজননী। কিন্তু বিশ্বের বৈচিত্র্য সজাতীয় জীবচিত্তে নিয়ত বিক্ষোভ সৃষ্টি করে; সুতরাং শান্তিকামী সুখদুঃখে চিত্রিত যাবতীয় চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ করিবেন। আপত্তি হইতে পারে,—চিত্তলয়ে দুঃখের অবসান

হয় সত্য, কিন্তু তৎসহ ব্যবহারিক জীবনেরও অন্ত হয়। কিন্তু তাহা সর্ব্বনাশ নহে। বিষয়ী হইতে বিষয় বিচ্ছিন্ন হইলে, বিষয় অব্যক্ত হয়, সন্দেহ নাই, কিন্তু বিষয়ী অচেতন হন বলা অবিমিশ্র প্রলাপ, কারণ তিনি চৈতন্যস্বরূপ। বিষয়বোধে স্ববোধের অপেক্ষা থাকে বটে, তথাপি বিষয়বোধের অভাবে স্ববোধের লোপ হইবে কেন? অতএব, এই নিরুপদ্রব স্ববোধে স্থিতির জন্য প্রচেষ্টা বাঞ্ছনীয়,—সাংখ্যের উপদেশ এইরূপ। গীতা এই সাধনার উপাদেয়ত্ব স্বীকার করিয়াছেন, পরন্তু পুরুষোত্তমে আত্মনিবেদনই তাঁহার মুখ্য উপদেশ, যেহেতু ইহার ফলে জীবের সকল সমস্যার পূরণ হয়, সকল অভাব দূর হয়।

শাস্ত্রত্রয়ে সাধনার ভেদ

উপনিষৎ বলিয়াছেন,—জীব ও ব্রহ্মে প্রকৃত ভেদ নাই, উপাধির সঙ্কীর্ণতা ভেদ সৃষ্টি করে, সুতরাং অনন্যমনে অহরহ ব্রহ্মচিন্তাই ভেদ অতিক্রম করিবার উপায়। এই উপদেশ কর্ম্মনিবৃত্ত ভিক্ষুর পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী। সাংখ্য বলিয়াছেন, অনিত্য বিষয় অর্জ্জনে ও রক্ষণে শান্তি নাই, বরং দুঃখ স্থায়ী হয়, সুতরাং বিষয়মুখী চিত্তের নিরোধ আবশ্যক। যাঁহারা জনসমাজে কর্ম্মবহুল জীবন অপেক্ষা নিভৃতে আত্মপরীক্ষার পক্ষপাতী, এই উপদেশ তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করে। গীতা বলিয়াছেন,—ঈশ্বরের অতীত কেহই নহে, কিছুই নাই, সুতরাং তাঁহার উদ্দেশে কর্ম্ম ও কর্ম্মফল অর্পণপূর্ব্বক যন্ত্রবৎ স্বধর্ম্ম পালন করিলে, তাঁহার শান্তিপূর্ণ অব্যয় পদে স্থিতি সম্ভব হয়। যাঁহারা সুখদুঃখরূপ কর্ম্মফলের অনিশ্চয়তা উপলব্ধি করেন অথচ নির্জ্জনে জ্ঞানানুশীলন অপেক্ষা বিবিধ জনহিতকর কর্ম্মে তৎপর, তাঁহারা গীতার এই আশ্বাসে যোগ্য প্রেরণা লাভ করেন।

কিন্তু কর্ম্ম কোন শাস্ত্রে প্রতিষিদ্ধ হয় নাই

সকল শ্রেণীর সাধকই যে কর্ত্তব্যপরায়ণ ও ভক্তিমান তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু সাধনার পদ্ধতি অনুসারে কর্ম্মক্ষেত্র সঙ্কুচিত বা প্রসারিত হয়, ধ্যেয় সম্বন্ধে ধারণারও কিছু প্রভেদ হইয়া থাকে। তথাপি কোন শাস্ত্রে কর্ম্ম প্রতিষিদ্ধ বা নিরীশ্বরবাদ প্রচারিত হয় নাই। উপনিষদে জ্ঞানহীন কর্ম্মের নিন্দা আছে বটে; কিন্তু শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন মোক্ষপ্রদ জ্ঞানলাভের উপায় বলিয়া আদিষ্ট হইয়াছে, আর ইহারাও কর্ম্ম। চিত্তবৃত্তি নিরোধের জন্য অভ্যাস ও প্রযত্ন আবশ্যক, এই নির্দ্দেশ সাংখ্য দিয়াছেন, অথচ অভ্যাস ও প্রযত্ন যে কর্ম্ম নহে তাহা কেহ বলেন নাই। কেবল তাহাই নহে, শ্রুতিতে দেখি, প্রাজ্ঞ পরহিতার্থ তত্ত্ব ও ধর্ম্মের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন। আর সাংখ্যের ইতিহাস এ বিষয়ে স্মরণীয়। পঞ্চশিখ, সুলভা, পতঞ্জলি ও ব্যাসদেব জ্ঞানমার্গে আপনারা অগ্রসর হইয়া পরিতৃপ্ত হন নাই। বর্ত্তমান যুগেও সাংখ্য-যোগীকে জনহিতার্থ জ্ঞানদানে ব্যাপৃত থাকিতে দেখিয়াছি।

গীতার কর্ম্মযোগ

কিন্তু কর্ম্ম শব্দটি ব্যাপক অর্থে গীতা গ্রহণ করিয়াছেন। কৃষি, বাণিজ্য, এমন কি যুদ্ধের মত নিষ্ঠুর ব্যাপার সমাজের কল্যানার্থ মুমুক্ষুর পক্ষেও করণীয়। তথাপি সংশয় হয়,—এই সকল কর্ম্ম যথারীতি সম্পাদিত হইলে ইহ বা পরকালে উন্নতির পথ উন্মুক্ত করিতে পারে বটে, কিন্তু মুক্তি বা দুঃখনিবৃত্তির সন্ধান এই পথে আছে কি? অতএব স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, গীতায় কর্ম্মযোগ আদিষ্ট হইয়াছে আর কেবল শুভকর্ম্মের আচরণে কর্ম্মযোগ হয় না। তাবৎ কর্ম্ম ও কর্ম্মফল ঈশ্বরের; তথাকথিত কর্ত্তা ও ভোক্তা নিমিত্তমাত্র,—এই বিশ্বাসে স্বভাব অনুযায়ী কর্ম্ম করিলে কর্ম্ম যোগে উন্নীত হয়। কর্ত্তৃত্বাভিমান কর্ম্মের সাফল্য সম্বন্ধে উৎকণ্ঠা সৃষ্টি করে, আর ফলে অভিলাষ চিত্তবিক্ষেপের

প্রসিদ্ধ হেতু। সুতরাং কর্ম্ম ও কর্ম্মফল ঈশ্বরে উৎসর্গ করিলে, দেহ ও ইন্দ্রিয় সক্রিয় থাকিতেও চিত্ত শান্ত হয় অর্থাৎ সাধক যোগযুক্ত হন ও যোগফল লাভ করেন।

দার্শনিকের আপত্তি ও গীতার উত্তর

দার্শনিক হয়ত বলিবেন,—যাঁহার ঐশ্বর্য্যের ইয়ত্তা নাই, কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের অপেক্ষা তাঁহার আছে কি? সুতরাং এই-গুলি তাঁহাকে অর্পণ করা কি সঙ্গত? পক্ষান্তরে উপাধি-পরিচ্ছিন্ন জীবের কর্ম্মে ও কর্ম্মফলে আসক্তি স্বাভাবিক, কারণ পরিচ্ছেদে অভাব ও আকাঙ্ক্ষা অনুস্যূত। যাহা স্বাভাবিক তাহার প্রতিরোধ কি সম্ভব, আর সম্ভব হইলেও যিনি কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের অতীত তাঁহাকে কর্ম্মী ও ফলাভিসন্ধী মনে করা কি মুক্তির জন্য সত্যসাধনা? গীতা এতাদৃশ প্রতিবাদের উত্তরে একদেশিক ও অপ্রতিষ্ঠ তর্ক ব্যবহার করেন নাই, পরন্তু ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগে ও বিশ্বরূপের বর্ণনায় ইহার চূড়ান্ত উত্তর দিয়াছেন। বিষয়টি পূর্ব্বেই কিছু আলোচিত হইয়াছে। তথাপি এই প্রসঙ্গে তাহার আরও আলোচনা বাঞ্ছনীয়।

প্রশ্ন এই,—জীবের জন্য কর্ম্মযোগ আদিষ্ট হইয়াছে কেন? ঈশ্বরের সহিত তাহার প্রকৃত সম্বন্ধ কি? গীতা তাহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়াছেন। চিত্তেন্দ্রিয়যুক্ত ও পঞ্চভূতে রচিত দেহই তাহার ক্ষেত্র, কারণ কৃষক যেরূপ অধিকৃত ভূমি কর্ষণ করিয়া শস্য লাভ করে, জীবমাত্রেই স্বীয় দেহের ব্যবহার অনুসারে সুখদুঃখরূপ কর্ম্মফলভাগী হয়। প্রত্যেক দেহ আপনার বৈশিষ্ট্য রক্ষায় তৎপর; প্রতপ্ত লৌহপিণ্ডের সর্ব্বাংশে অগ্নির যেরূপ পরিচয়, ইহার বিভিন্ন অবয়বে চেতনার অভিব্যক্তি সেইরূপ; সুতরাং সুখ, দুঃখ, অনুরাগ ও বিদ্বেষের ইহাতেই উদ্ভব। এতাদৃশ দেহ বা ক্ষেত্রকে যে আপনার সম্পত্তি মনে করে, তাহাকে সাধারণতঃ ক্ষেত্রজ্ঞ বলা হয়, কারণ এই ধারণার

বশে সে ক্ষেত্রের ব্যবহারে নিয়ত প্রবৃত্ত থাকে(১)। সংসারে জীব বা ক্ষেত্রজ্ঞের সংখ্যা নির্ণয় করা যায় না; সুতরাং ক্ষেত্রের সংখ্যাও নির্ণেয় নহে।

এই অগণিত ক্ষেত্র প্রত্যক্ষতঃ পরিণামী, সুতরাং নিত্য পদার্থের মধ্যে গণ্য নহে। তবে কি ইহারা স্বতঃ উদ্ভূত হইয়াছে? জ্ঞানের বাহিরে উদ্ভব বা অভিভব নাই, এমন কি স্থিতিও নাই। অতএব ক্ষেত্রজ্ঞ ইহাদিগের সর্ব্বাবস্থায় আশ্রয়। তথাপি জীবরূপ সংখ্যাতীত ক্ষেত্রজ্ঞ সে অবলম্বন নহে, কারণ ক্ষেত্রেই তাহাদিগের আবির্ভাব আর ক্ষেত্র তাহাদিগকে নিয়ত প্রভাবিত করে। সুতরাং স্বীকার করিতে হয়, অন্য ক্ষেত্রজ্ঞ আছেন; শুদ্ধ চৈতন্যই তাঁহার অক্ষয় ভাব অথচ প্রকাশে তিনি বহুরূপ। আপত্তি হইতে পারে,—যিনি নির্বিকার ও নিরঞ্জন, তাঁহার বহুধা প্রকাশ অসম্ভব। কিন্তু বোধাত্মক শব্দস্পর্শাদির অন্য আশ্রয় বা কারণ অনুমেয় নহে, অথচ ইহারাই বিশ্বের উপাদান। আর চৈতন্য নিরবয়ব হইলেও প্রকাশে বিভক্তের মত হন, কারণ প্রকাশের ধারা এই; সীমা ব্যতীত প্রকাশ বা অভিব্যক্তি হয় না। সুতরাং যিনি চৈতন্যস্বরূপ, তাঁহার নির্বিশেষ, নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞান বিশেষিত হওয়ায় অগণিত ভোগ্য বা দৃশ্যের আকার ধারণ করে। দার্শনিক বলিয়া থাকেন, চৈতন্যের মত নির্বিশেষ তত্ত্ব কখন বিশেষিত হয় না, সুতরাং শক্তিরূপ অর্থাৎ প্রসবধর্ম্মী অন্য স্বতন্ত্র তত্ত্ব আছে, আর তাহাই চৈতন্যের সংস্পর্শে নানাভাবে বিকশিত হয়। কিন্তু নিরালম্ব শক্তির অভিজ্ঞতা মানবের নাই, আর দর্শন সাধারণ অভিজ্ঞতার অপলাপ করিতে অসমর্থ।

(১) গীতা ১৩।১,৫,৬

কেবল দৃশ্যে কিন্তু সৃষ্টি বাস্তব হয় না ; বিশ্ব যাঁহার বিচিত্র বিকাশ, তিনি নিজেই উহাকে সতত দর্শন করিতেছেন বলিয়া উহা বিদ্যমান রহিয়াছে ; অন্য প্রকার অস্তিত্ব উহার নাই(১)। সুতরাং ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ উভয়ই তিনি ; অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান, ব্যবহিত, দূরবর্ত্তী ও সমীপস্থ, সকলই তাঁহার অনুপম জ্ঞানের অন্তর্গত ও তজ্জন্য বাস্তব। তাঁহার এই বিরাট ক্ষেত্রও প্রকৃতপক্ষে এক ও অবিচ্ছিন্ন, কারণ অসীম ও অখণ্ড দেশকালে ইহা বিস্তৃত, আর দৃষ্টির সঙ্কীর্ণতাবশতঃ দেশে ও কালে বিভাগ কল্পিত হইলেও মুখ্য ক্ষেত্রজ্ঞের দৃষ্টি অবাধ। শব্দস্পর্শাদির উল্লেখে বহির্জগৎই লক্ষ্য করিয়াছি, কিন্তু অন্তর্জগতের ব্যাখ্যাও ঐরূপ। বস্তুতঃ চৈতন্যের অতীত বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন ও ইন্দ্রিয় কল্পনীয়ও নহে। সুতরাং চৈতন্যময় ঈশ্বরেই ইহাদিগের প্রতিষ্ঠা ; তিনি ইহাদিগেরও চরম কারণ ও আশ্রয়।

কিন্তু এই অকুণ্ঠ অদ্বৈতবাদে জীবের অবকাশ কোথায় ? তাহার উপযোগিতাই বা কি ? তাহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলা হইয়াছে। কিন্তু তাহার ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ, আর এই সঙ্কীর্ণতা কর্ম্মে ও ভোগে প্রতিফলিত হয়। ক্ষেত্রের প্রকারও অনেক, সুতরাং কর্ম্ম ও ভোগ সর্ব্বত্র একরূপ নহে, অর্থাৎ বহির্জগতের মত অন্তর্জগতেও বৈচিত্র্য বিদ্যমান। অতএব জীবের অভাবে যাহা বিস্তীর্ণ চিত্রপটের মত হইত, জীবের আবির্ভাবে তাহা অপরূপ মহাকাব্যের অভিনয়ে পরিণত হইয়াছে। বহুরূপে চিত্রিত দেশ ও কাল ইহার রঙ্গমঞ্চ আর সর্ব্ববিধ অভিজ্ঞতা ইহার বিষয়। চৈতন্যের মত অমেয় তত্ত্বের ইহাই যথাযোগ্য প্রকাশ।

কিন্তু এই প্রকাশে জীবের নিগ্রহ হয় কেন ? চৈতন্য শিব,

(১) গীতা ১৩।২

শান্ত ও অনন্ত ; তাহার প্রকাশ অমঙ্গলের কারণ হইতে পারে না। অথচ জীব যে সংসারে আসিয়া দুঃখভোগ করে তাহাও প্রসিদ্ধ। এই সমস্যার সমাধানের জন্য জিজ্ঞাসা করি,—জীব প্রকৃতপক্ষে কে, আর কর্ম্ম ও ভোগের সহিত তাহার সম্বন্ধ কিরূপ ? অবশভাবে সে ক্ষেত্রে প্রবেশ করে ও অবশভাবেই তাহা ত্যাগ করে। ক্ষেত্রে অবস্থানকালেও ব্যবহারে তাহার স্বাতন্ত্র্য নাই, কারণ বুদ্ধি, অহঙ্কার ও একাদশ ইন্দ্রিয় কর্ত্তৃক কর্ম্ম ও ভোগ নিষ্পন্ন হয়, আর ইহারা বিকারী ও দৃশ্যজাতীয় হওয়ায় ক্ষেত্রের অন্তর্গত অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ঞ বা জীব নহে। বস্তুতঃ ক্ষেত্রের যাবতীয় ব্যাপারের সে কেবল সাক্ষী, যদিও মোহ-বশতঃ স্বীয় কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব কল্পনা করে। তাবৎ ক্ষেত্র ঈশ্বরের প্রকাশ, সুতরাং তাঁহার নিয়মাধীন। তিনি চিন্ময় অতএব শক্তিমান, যেহেতু চৈতন্যেই শক্তি নিহিত, অন্য কোন আধার কল্পনা করিলে তাহা প্রকাশের অন্তর্গত হয়। জীব কিন্তু ঈশ্বরের অংশ হইলেও স্বরূপে চিন্মাত্র অর্থাৎ শক্তিহীন কারণ শক্তিযুক্ত উপাধি কর্ত্তৃক সে পরিচ্ছিন্ন। সুতরাং কর্ম্ম ও ভোগ শক্তিমান ঈশ্বরে অর্পণপূর্ব্বক আপনার অকর্ত্তৃত্ব অঙ্গীকার করিলে, তাহার পক্ষে অসত্যসাধন হয় না, বরং সাক্ষিভাবে অবস্থানের ফলে সে বিপর্য্যয়ের মধ্যেও শান্তি লাভ করে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে দার্শনিক বিভাগ ও তুলনামূলক বিচার আছে। সুতরাং তাৎপর্য্য স্পষ্ট করিবার জন্য স্থানে স্থানে যুক্তি দিলাম। কিন্তু যিনি এক ও অদ্বয়, কাহার সহিত তাঁহার যোগ্য তুলনা সম্ভব, কোন্ যুক্তিই বা তাঁহাকে প্রমিত করিতে পারে ? বস্তুতঃ তিনি দর্শনের বিষয় নহেন ; কেবল ভক্তিমানের নির্ম্মল ও স্থিরচিত্তে তিনি অবধার্য্য। সেই অবধারণের প্রতিরূপ

একাদশ অধ্যায়ের দিগন্তব্যাপী দৃশ্যে আমরা পাই। ঈশ্বরে কোমল ও কঠোর, সুন্দর ও ভীষণ সমাবিষ্ট। দেব, দানব, ঋষি, সিদ্ধ ও অন্যান্য জীবের তাঁহাতেই অবস্থান, আর তাহারা সর্ব্বতোভাবে তাঁহার শাসনাধীন। তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সকল জ্ঞেয় বস্তুও তিনি, সুতরাং পরিণামী বিশ্বে ও বিশ্ববাসীতে তাঁহার অনন্ত রূপের প্রকাশ ও অমিত বিক্রমের প্রমাণ। অথচ শুদ্ধ চৈতন্যই তাঁহার পরম অব্যয় ধাম, আর এই শান্তভাবে অনিত্য সৃষ্টির লয় হয়।

কর্ম্মযোগের মূলমন্ত্র

যাঁহারা পুণ্যবলে এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, তাঁহাদিগের স্থির ধারণা হয় যে ঈশ্বরই পরম প্রাপ্য, অস্থায়ী স্বর্গসুখ নহে। সুতরাং ঈশ্বরে অর্পণ করিবার মানসে তাঁহারা বিহিত কর্ম্মে নিমিত্তরূপে প্রবৃত্ত হন। অধিকন্তু ঈশ্বরের ভজনায় তাঁহারা কালাতিপাত করেন আর ভজনার অন্তরায়বোধে সংসারের কোন বিষয়ে আসক্ত হন না, কাহারও প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেন না। ফলে ঈশ্বরের সহিত তাঁহাদিগের নিরন্তরাল মিলন হয়। একাদশ অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে কর্ম্মযোগ এইরূপে সূত্রিত হইয়াছে। ইহাই গীতার মুল মন্ত্র, শ্রেষ্ঠ উপদেশ, যদিও গীতা অন্য প্রকার সাধনাও অনুমোদন করিয়াছেন।

জ্ঞানযোগের উৎকর্ষ খ্যাপনার্থ কেহ কেহ বলেন, মুক্তির জন্য কর্ম্মার্পণ অপেক্ষা কর্ম্মত্যাগ সরল ও সঙ্গত উপায়। কিন্তু মানবের দেহাদি এরূপে গঠিত যে কর্ম্ম তাহাকে করিতেই হয়। জীবিকানির্ব্বাহের জন্যও সাধারণতঃ কায়িক বা মানসিক পরিশ্রম আবশ্যক, আর পরপ্রদত্ত অন্নাদি গ্রহণ করিলে কোনরূপ প্রতিদান কর্ত্তব্য। সুতরাং নৈসর্গিক ও নৈতিক নিয়ম অনুসারে কর্ম্ম অপরিহার্য্য। কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলিকে সংযত

করিলে নানাবিধ কর্ম্ম পরিহার করা যায় বটে ; কিন্তু তাদৃশ নিরোধও চেষ্টাসাপেক্ষ আর সঙ্কল্পের অনুগামী, সুতরাং কর্ম্ম। যথাসম্ভব কর্ম্মত্যাগই জ্ঞানযোগীর অভিপ্রেত, সন্দেহ নাই, আর বিক্ষেপজনক কর্ম্মই পরিত্যক্ত হয়। তথাপি অভ্যস্ত কর্ম্ম ত্যাগেও দুঃখ আছে আর দুঃখনিবৃত্তিই তাহার উদ্দেশ্য, অথচ অন্ততঃ সাধনার আরম্ভে স্বার্থ ব্যতীত তাঁহার অন্য প্রেরণা নাই। পক্ষান্তরে, কর্ম্মযোগে ভক্তিই প্রবর্ত্তক, আর 'অনন্যা ভক্তির' প্রেরণা উপেক্ষা করিলে সত্যের অপলাপ হয়।

কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগের উপযোগিতা

দার্শনিক হয়ত বলিবেন, নিষ্কাম কর্ম্ম বিরুদ্ধ বাক্য, কারণ কামনা ব্যতীত কর্ম্ম হয় না। কিন্তু গীতায় 'কাম' শব্দের অর্থ বিষয়ভোগের ইচ্ছা, আর এই ইচ্ছা প্রবল হইলে ক্রোধ ও মোহে পরিণত হয়, সুতরাং ইহা নরকের দ্বারস্বরূপ। ইহাকে দমন করিবার প্রবৃত্তি প্রত্যেক মানবে আছে, কিন্তু ইহার দৌরাত্ম্যে সে প্রবৃত্তি সাধারণতঃ কার্য্যকরী হয় না, কারণ ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি সকলকেই ইহা কলুষিত করে(১)। তথাপি উন্নত উদ্দেশ্যের আহ্বানে কিংবা কর্ত্তব্যের অনুরোধে ইহার নির্য্যাতন বিরল নহে। বস্তুতঃ বহু লোক পরের দুঃখমোচন করিতে নিজের সুখৈশ্বর্য্য বিসর্জ্জন দেন অথবা সত্যের সন্ধানে কিংবা অন্যায়ের প্রতিরোধে প্রাণ পর্য্যন্ত বিপন্ন করেন। অতএব নিষ্কাম কর্ম্মের পরামর্শ দিয়া গীতা সাধককে কোন অসম্ভব ব্যাপারে প্রণোদিত করেন নাই। কামনার মূলোচ্ছেদ যে সুকঠিন তাহা স্পষ্ট বাক্যে স্বীকৃত হইয়াছে, কিন্তু কর্ম্মত্যাগকে ইহার প্রকৃষ্ট উপায় বলা হয় নাই, যেহেতু কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলিকে নিশ্চল করিলেও কলুষিত মন বিষয় ধ্যানেই ব্যাপৃত থাকে(২)।

এই অভিমত জ্ঞানযোগের নিন্দা নহে, অনধিকারীর প্রতি

(১) গীতা ৩।৪০ (২) গীতা ২।৬২,৬৩ ; ৩।৬

নিষেধবাণী। যাঁহাদিগের কোন ব্যক্তি বা বস্তুতে মমতা নাই, কোন প্রকার কর্ম্মেও স্পৃহা নাই, পরন্তু চিত্ত সংস্কারবশে বিষয়বিমুখ হইয়াছে, তাঁহারাই কেবল জ্ঞানযোগের অধিকারী(১)। অন্যে জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করিয়া কর্ম্ম সম্বন্ধে শাস্ত্রের আদেশ পালন করিবেন ও ভক্তিযুক্ত চিত্তে কৃতকর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পণ করিবেন। গীতা বলিয়াছেন,—এই দ্বিবিধ নিষ্ঠা অতি প্রাচীন কাল হইতে জনসমাজে আদৃত(২), আর উভয়ই মুক্তিপ্রদ কিন্তু কর্ম্মযোগ অপেক্ষাকৃত সুকর, কারণ ইহার অভ্যাসে বিষয়ে অনুরাগ প্রশমিত হয়, ফলে সাধক নির্ব্বিঘ্নে মুক্তির পথে যাত্রা করেন(৩)। পক্ষান্তরে চিত্ত রাগদ্বেষে কলঙ্কিত থাকিতে জ্ঞানযোগে প্রতিষ্ঠিত হওয়া কঠিন, কারণ তাদৃশ চিত্ত কর্ম্মত্যাগ করিতে প্রায়শঃ বিমুখ হয়(৪)।

কর্ম্মযোগ সম্বন্ধে আরও কিছু বিচার

এখন আমরা কর্ম্মযোগ সম্বন্ধে কয়েকটি আপত্তি পরীক্ষা করিব। প্রথম আপত্তি,—কর্ম্মমাত্রেই সদোষ, সুতরাং কর্ম্মত্যাগে মুক্তির সম্ভাবনা আছে, কর্ম্মযোগে তাহা নাই। সত্য বটে, জ্ঞান ও সামর্থ্যে সঙ্কীর্ণতা বশতঃ জীবের প্রত্যেক কর্ম্মই সদোষ। কিন্তু ভক্তিমান সাধক কর্ত্তব্যপালনের কালে ও পরে স্বীয় কর্ম্ম ও কর্ম্মফল ঈশ্বরে নিবেদন করিয়া নিশ্চিন্ত হন। এই প্রকার কর্ম্মে কর্ত্তৃত্ব প্রত্যাখ্যান ও কর্ম্মফলে স্বত্বত্যাগ কি আত্মপ্রতারণা? প্রকৃতপক্ষে চরম ভোক্তা এক,—যিনি সর্ব্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ। তাঁহার ভোগ সীমাহীন দেশে ও কালে বিস্তৃত হইলেও এক; তাঁহার কর্ম্মও তদনুরূপ, অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী ও সর্ব্বজীবের হিতকর। এই অপরিসীম কর্ম্ম ও ভোগের কণামাত্রে প্রত্যেক জীবের ইতিহাস পর্য্যবসিত।

(১) গীতা ১৮।৪৯ (২) গীতা ৩।৩
(৩) গীতা ৫।২,৩ (৪) গীতা ৫।৬

সুতরাং ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গত অবকাশ নাই। উদ্দেশ্য ও ফল লক্ষ্য করিয়া বিবিধ কর্ম্মে তারতম্য করা হয়, সত্য। কিন্তু শ্রেষ্ঠ জীবের কর্ম্মও একদেশিক ও অসম্পূর্ণ অতএব দোষযুক্ত, আর কর্ত্তৃত্বাভিমান ও ফলাকাঙ্ক্ষা থাকিতে এই দোষ তাঁহাতে সংক্রমিত হয়। সুতরাং কর্ম্ম ঈশ্বরের; জীব যন্ত্রবৎ তাঁহার কর্ম্মে নিযুক্ত; সিদ্ধি বা অসিদ্ধি, কল্যাণ বা অকল্যাণ, তাহার লক্ষ্য নহে; এই মনোভাব লইয়া সাধক স্বধর্ম্মপালনে অগ্রসর হন। ইহাই কর্ম্মযোগ, আর ইহার অভ্যাসে পাপপুণ্যের অতীত নিশ্চিন্তভাব আয়ত্ত হয় বলিয়া ইহাকে কর্ম্ম করিবার কৌশল বলা হইয়াছে।

দ্বিতীয় আপত্তি,—শাস্ত্রের বিধানে জীবহিংসা অনুমোদিত হওয়ায় তাহা অশুদ্ধ, সুতরাং তাহা পালন করিলে, পরে লাঞ্ছিত হইবার আশঙ্কা থাকে। কিন্তু জনসাধারণের আচার-ব্যবহার ও বিশৃঙ্খলার পরিণাম লক্ষ্য করিয়া শাস্ত্র তৎকালীন সমাজের মঙ্গলজনক নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন সুতরাং দেশ, কাল ও পাত্রভেদে তাহার পরিবর্ত্তন বাঞ্ছনীয় হইতে পারে। তথাপি অল্পবুদ্ধি মানবের পক্ষে শাস্ত্রের আদেশই প্রথমে পালনীয়(১)। পরে নিষ্ঠার গুণে কর্ত্তৃত্বাভিমান, অনুরাগ ও বিদ্বেষ খর্ব্ব হইলে শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধের অপেক্ষা থাকে না। তখন ঈশ্বর স্বয়ং যেন পথপ্রদর্শক হন,(২) অর্থাৎ ভক্ত উপলব্ধি করেন সংসারের মত অজ্ঞাত ও বিঘ্নসঙ্কুল পথে ঈশ্বরের নির্দ্দেশ পদে পদে থাকে বলিয়া স্খলনের সম্ভাবনা তিরোহিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা কি কল্পনা মাত্র? ঈশ্বরের অনুচিন্তনে চিত্ত নির্ম্মল ও সুস্থির হয় ও তাদৃশ চিত্তে কার্য্যাকার্য্য সম্বন্ধে কোন সংশয়ের অবকাশ থাকে না।

(১) গীতা ১৬।২৪ (২) গীতা ১৮।৬৬

সুতরাং ইহা ন্যায়সঙ্গত নিয়ম অর্থাৎ বিজ্ঞানঘন ঈশ্বরের বিধান, ভিত্তিহীন কল্পনা নহে।

তৃতীয় আপত্তি:—বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানে ইহ বা পরকালে অভ্যুদয় হয় সত্য ; কিন্তু তাহা অস্থায়ী, আর তাহার অবসানে আক্ষেপ ও অবনতি অনিবার্য্য ; সুতরাং এই পথে মুক্তি লাভ হয় না। কিন্তু গীতায় কেবল পুণ্যাচরণ আদিষ্ট হয় নাই, কর্ম্মযোগের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। আর এই যোগের অভ্যাস দ্বারা সাধক অনুরাগ, বিদ্বেষ ও ভয়ের অতীত হইলে, কর্ম্মফল যাহাই হউক না কেন, তাঁহার শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য অক্ষুণ্ণ থাকে। কর্ম্মের চূড়ান্ত বিশ্লেষণের পরে সাংখ্য শাস্ত্র তাহার পাঁচটি কারণ নির্ণয় করিয়াছেন, যথা,—দেহ, কর্ত্তৃত্ববোধ, বিবিধ ইন্দ্রিয়, প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুর চেষ্টা ও দৈব নামে খ্যাত অজ্ঞাত বা অল্পজ্ঞাত অনুগ্রাহক(১)। সুতরাং আত্মা বা জীবের চিৎস্বরূপ অন্তরতম সত্তা কর্ম্মের নির্ব্বাহক নহেন ; বস্তুতঃ কর্ম্ম ও কর্ম্মফল তাঁহাকে স্পর্শও করে না। কর্ম্ম ও কর্ম্মফল ক্ষেত্রের অন্তর্গত আর আত্মা ক্ষেত্রজ্ঞমাত্র। তথাপি মোহবশতঃ ইহাদিগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ কল্পিত হয় ও তাহার ফলে জীব সংসার অরণ্যে আবদ্ধ থাকে। কর্ম্মযোগ এই অন্যায্য কল্পনা দূর করিবার প্রকৃষ্ট উপায়।

চতুর্থ আপত্তি:—অহঙ্কার ব্যতীত কর্ম্ম হয় না ; গীতাও স্বীকার করিয়াছেন কর্ত্তৃত্ববোধ কর্ম্মের অন্যতম কারণ ; বস্তুতঃ সঙ্কল্প ও চেষ্টা অনুসারে আত্মবোধের বিশেষ হয়, অথচ আত্মা অসঙ্গ ও অক্রিয় আর তিনিই জীবের স্বরূপ ; সুতরাং কর্ম্মীর পক্ষে স্বরূপে অবস্থান অসম্ভব, অর্থাৎ কর্ম্ম থাকিতে বিশুদ্ধ ও নিরুপদ্রব ভাব অপ্রাপ্য ; মুক্তিকামী এই জন্যই কর্ম্ম বর্জ্জন

(১) গীতা ১৮।১৪

করেন। এই আপত্তির বিচারে সঙ্কল্প ও চেষ্টার উৎপত্তি পরীক্ষা করা আবশ্যক। যাবতীয় চেষ্টায় ইন্দ্রিয়গুলি স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়; সঙ্কল্প পূর্ব্বগামী মাত্র, প্রবর্ত্তক নহে, যেহেতু সঙ্কল্পের মত চিত্তবৃত্তি ও হস্তপদাদি সঞ্চালনের মত দৈহিক গতি এতই বিসদৃশ যে একটিকে অন্যের নিয়োজক বলা যায় না। বস্তুতঃ চিত্ত নিয়োজক হইলে নিযুক্ত পদার্থ সম্বন্ধে অজ্ঞতার কোন হেতু থাকিত না। কিন্তু অঙ্গচালনা যদিও অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার, ব্যাপৃত স্নায়ু, শিরা ও পেশী সম্বন্ধে জ্ঞান কোন মতেই সাধারণ নহে। আর সঙ্কল্পই বা কি? উপলক্ষ্য অনুসারে স্মৃতি ও কল্পনারূপে সংস্কারের উদয়ে ইহার জন্ম। সুতরাং এবংবিধ নিয়মাধীন পরিণামে জীবের প্রকৃতপক্ষে স্বাতন্ত্র্য নাই। অহঙ্কার বা কর্ত্তৃত্বাভিমান সঙ্কল্পে ও চেষ্টায় গ্রথিত থাকে বলিয়া উহাকে কর্ম্মের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বা উপাদান বলা সঙ্গত। কিন্তু তাদৃশ অঙ্গের উল্লেখে কর্ম্মের উৎপত্তি সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যাত হয় না। আত্মা অক্রিয়, অহঙ্কার কর্ম্মের অন্যতম উপাদান, ইন্দ্রিয়গুলি কর্ম্মনিষ্পাদক যন্ত্রমাত্র, অতএব প্রেরয়িতা বা নিয়ন্তা কে?

ঈশ্বরের বর্ণনায় গীতা এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন, আর তাঁহার অর্চ্চনার পক্ষে কর্ম্মযোগ যে বিশেষ উপযোগী তাহাও বার বার বলিয়াছেন। উপদেশের মর্ম্ম এইরূপ:—জীবিকা-নির্ব্বাহের মত সাধারণ কর্ম্ম, যজ্ঞ, দান ও তপস্যার মত অসাধারণ কর্ম্ম ও তাহাদিগের সুখদুঃখরূপ ফল, সকলই ঈশ্বরে অর্পণ করিবে। কর্ম্ম ফলপ্রসূ হওয়ায় তাহাকে বন্ধনের হেতু বলা হয়; কিন্তু জীব মনে করে তাহার অন্তরতম সত্তাও কর্ম্মে লিপ্ত ও সেইজন্য কর্ম্মের নিগড়ে আবদ্ধ থাকে। বিশেষিত আত্মভাব বা অহঙ্কার আর ব্যবহার অর্থাৎ কর্ম্ম ও ভোগ

ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধ বটে ; কিন্তু তাহারা ক্ষেত্রের অন্তর্গত, সুতরাং তাহাদিগের ঘনিষ্ঠতা দোষাবহ নহে। দোষের উৎপত্তি হয় ক্ষেত্রজ্ঞ ও পূর্ব্বোক্ত অস্মিতার একত্ববোধে। ক্ষেত্রজ্ঞ স্বরূপে অবিক্রিয় ও অসঙ্গ পরন্তু অস্মিতা পরিণামী ও ব্যবহারের অঙ্গীভূত। আর এতাদৃশ বিসদৃশ পদার্থদ্বয়ের অভেদবোধই অসন্তোষ, ব্যর্থতা, অনুতাপ ও লাঞ্ছনার কারণ। কিন্তু ক্ষেত্রের যাবতীয় পরিণতি ক্ষেত্রপতিকে নিবেদন করিলে এই দুর্দ্দশার অবসান হয়। সুতরাং কর্ম্মযোগ কেবল সত্যের সাধনা নহে, উহা স্বস্তিলাভের সঙ্গত উপায়।

তথাপি এই স্বস্তিলাভও কর্ম্মযোগের প্রধান উদ্দেশ্য নহে। বিশ্ব যাঁহার সৃষ্টি, তিনিই বিশ্ববাসীর প্রভু, সুহৃৎ ও আশ্রয়। বস্তুতঃ সংসারী জীবের আত্মা তাঁহার উপাধিপরিচ্ছিন্ন ভাব ব্যতীত অন্য কিছু নহে, অর্থাৎ স্বরূপে জীব ও ঈশ্বর অভিন্ন। এই অভেদ ব্যবহারে সচরাচর আবৃত থাকে, অথচ ইহার উপলব্ধিতে সকল সমস্যার সমাধান হয়। কেবল স্বস্তিলাভের জন্য কিন্তু কর্ম্ম ও ভোগ অর্পণ করিলে এই উপলব্ধি হয় না, পরম শ্রদ্ধা সহকারে নিবেদন আবশ্যক। সুতরাং উপযুক্ত মনোভাব দৃঢ় করিবার জন্য গীতায় পূজার বিধান আছে। যত্নলভ্য উপচারের প্রয়োজন নাই ; মন্ত্রপাঠ ও বিবিধ অনুষ্ঠান আবশ্যক হয় না। দেবতাকে কিছু উপহার দিবার আকাঙ্ক্ষা পূরণার্থ পত্র, পুষ্প, ফল কিংবা কিঞ্চিৎ জল তাঁহাকে নিবেদন করিলেই যথেষ্ট। কিন্তু সংযতচিত্তে পরম শ্রদ্ধা সহকারে অর্পণ করিতে হইবে ; তাহা হইলে সেই ভক্তির উপহার তিনি সাদরে গ্রহণ করিবেন(১)। যাহা হউক, এই পূজাও শ্রেষ্ঠ সাধনা নহে। যাবতীয় বিষয়ে অনাসক্ত হইয়া চিত্ত যখন সতত

(১) গীতা ৯।২৬

ঈশ্বরাভিমুখ থাকে, তখনই সাধনা সম্পূর্ণ হয়, ঈশ্বর সুলভ হন(১)। এজন্য কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবার প্রয়োজন নাই; 'কর্ম্ম প্রকৃতপক্ষে তাঁহার, আমি নিমিত্তমাত্র,' এই ভাব পোষণ করিতে হয়। কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সন্দিহান হইলে শাস্ত্রের আদেশ পালনীয়। পরে শরণাপত্তির মহিমায় কর্ত্তৃত্বাভিমান, অনুরাগ ও বিদ্বেষ নিঃশেষে উণ্মূলিত হইলে বিধিনিষেধ আর প্রয়োজন হয় না। আর তখন সাধক কর্ম্ম সত্ত্বেও পূর্ণ শান্তি উপভোগ করেন। ইহাই পরম মঙ্গল।

কর্ম্মযোগের অভ্যাস সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র আপত্তি আছে। মূঢ় মানব কামনার ইঙ্গিতে গর্হিত কর্ম্মে নিযুক্ত হয়, অথচ পরে তাদৃশ কর্ম্মে ঈশ্বরের প্রেরণা কল্পনা করে। এ অভিযোগ ভিত্তিহীন নহে; কিন্তু জগতে আত্মপ্রবঞ্চনার অভাব নাই। অবসরসুখ উপভোগার্থ নিভৃতে উপবিষ্ট থাকিলে ধ্যান হয় না, কিংবা আলস্যবশতঃ সংসারত্যাগ করিলে সন্ন্যাস হয় না। পরন্তু ঈদৃশ ধ্যানী ও সন্ন্যাসী বিরল নহে। তথাপি প্রকৃত ধ্যান ও সন্ন্যাসের মাহাত্ম্য অঙ্গীকার করিতে হইবে। কর্ম্মযোগের মহিমাও ঐরূপেই নির্ণেয়, অর্থাৎ কপট কর্ম্মযোগীর দৃষ্টান্ত এ আলোচনায় অপ্রাসঙ্গিক। বস্তুতঃ ইচ্ছামত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া পরে তাহা ঈশ্বরে অর্পণ করা বিধি নহে। তিনিই প্রকৃত কর্ত্তা ও ভোক্তা; অসংখ্য জীব তাঁহার অশেষবিধ কর্ম্ম ও ভোগের নিমিত্ত মাত্র, এই ধারণা পোষণ করিয়া 'স্বভাবনিয়ত' কর্ম্মে ব্রতী হইবে,—ইহাই উপদেশ। অর্জ্জুনকে বলা হইয়াছিল,—যুদ্ধ নিষ্ঠুর কর্ম্ম হইলেও বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তোমার কর্ত্তব্য; সুতরাং তাহার পরিণাম সম্বন্ধে চিন্তাকুল হইও না; পরন্তু স্মরণ রাখিও ঈশ্বর তোমাকে এই কার্য্যে

(১) গীতা ৮।১৪

নিযুক্ত করিয়াছেন, অতএব দ্বিধা বা সঙ্কোচের অবকাশ নাই।

কর্ম্মযোগ ও ধর্ম্মশাস্ত্রের নির্দ্দেশ

কর্ম্মযোগের উপযোগিতা খ্যাপন করিলেও, গীতা কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তন্নতন্ন বিচার করেন নাই, এই অনুযোগ কোথাও কোথাও দেখা যায়। কিন্তু তাদৃশ বিচার ধর্ম্মশাস্ত্রের অঙ্গ; আপ্ত পুরুষ মূলসূত্রই প্রতিপাদন করেন, অবস্থানুসারে তাহার বিভিন্ন প্রয়োগের বর্ণনায় প্রবৃত্ত হন না। সুতরাং ব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিলে স্মৃতির অন্তর্গত আচারসংগ্রহই উত্তরের জন্য আলোচিত হইয়া থাকে। কিন্তু সেই উত্তর সঙ্কীর্ণ বা অসঙ্গত বোধ হইলে, আপ্ত মূলসূত্রের পরীক্ষাও করেন ও সংশয় নিরসনার্থ তাহাকে নূতন আকার দেন। গীতা তাহাই করিয়াছেন ও মোক্ষশাস্ত্রের পক্ষে তাহা পর্য্যাপ্ত। ভীষণ যুদ্ধ আসন্ন দেখিয়া অর্জ্জুন স্বীয় কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়াছিলেন। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ধর্ম্মযুদ্ধ কর্ত্তব্য, অথচ স্বজন ও সুহৃদ্ বধ গর্হিত। অতএব উভয় সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, বিরুদ্ধ বিধিনিষেধের কোন্‌টি শ্রেয়োলাভের নিশ্চিত উপায়। উত্তরে মূলনীতি বিশদ ও ব্যাপক ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, আর তাহাই গীতার মত শাস্ত্রের যোগ্য পদ্ধতি।

উত্তরে প্রথমে পাই, অর্জ্জুনের সমস্যা সম্বন্ধে পুণ্যাপুণ্য বিচার অর্থাৎ শীলবিদ্যার আলোচনা। দেহনাশে দেহীর নাশ হয় না, আর কোন দেহই চিরস্থায়ী নহে, পরন্তু ধর্ম্ম শাশ্বত। সুতরাং দুর্জ্জনের উপদ্রবে ধর্ম্ম বিপন্ন হইলে, তাহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ যুদ্ধব্যবসায়ীর অবশ্যকর্ত্তব্য। ইহাই প্রকৃত ধর্ম্মযুদ্ধ, আর ইহাতে প্রবৃত্ত হইলে ইহ বা পরলোকে অভ্যুত্থান সুনিশ্চিত। অহিংসা ও মৃদুতা দৈবী সম্পদের মধ্যে গণ্য

বটে। কিন্তু দুর্বৃত্ত যদি দুর্দ্দান্ত হয়, তাহাকে ক্ষমা করিলে অধর্ম্ম প্রশ্রয় পায়, ফলে শিষ্ট নির্যাতিত হন। বিশেষতঃ শাসনভার যাহাদিগের উপরে ন্যস্ত, তাহাদিগের এতাদৃশ ব্যবহার প্রভূত অকল্যাণের হেতু হইয়া থাকে, কারণ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির আচরণ অন্যে অনুকরণ করে। সুতরাং সেনাপতি যদি আত্মীয় বা বন্ধুর প্রতি মমতা বশতঃ ধর্ম্মযুদ্ধে পরাঙ্মুখ হন, তাঁহার অপরাধ অমার্জ্জনীয়। আর বৃত্তিপরিবর্ত্তনে অর্থাৎ অপ্রীতিকর ক্ষাত্রধর্ম্ম ত্যাগপূর্ব্বক নিরীহ ভিক্ষাচর্য্যা অবলম্বনে সে অপরাধের ক্ষালন হয় না, কারণ প্রকৃতি-বিরুদ্ধ বৃত্তি বা পরধর্ম্ম শ্রেয়োলাভের অন্তরায়।

জন্মগত সংস্কার, শৈশবে গুরুজনের শাসন ও পরে পারি-পার্শ্বিক অবস্থা ও শিক্ষা জীবের প্রকৃতি গঠন করে, আর সেই প্রকৃতির অনুরূপ আচরণই স্বধর্ম্ম। কিন্তু প্রকৃতি অন্তরতর ও স্থায়ী ভাব হইলেও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে অনুরাগ ও বিদ্বেষ কখন কখন ইহার প্রতিকূল হয়। ঈদৃশ বিরোধ অগ্রাহ্য করাই উচিত, কারণ সাময়িক উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিলে অধোগতি অবশ্যম্ভাবী। অধিকন্তু, স্বধর্ম্ম পালন সমাজের কল্যানকর, যেহেতু সমাজের বিবিধ প্রয়োজন অনুসারে মানবজাতি চারি বর্ণে বিভক্ত হইয়াছে, আর প্রত্যেক ব্যক্তি স্বধর্ম্ম পালন করিলে বর্ণচতুষ্টয়ে সহযোগ সম্ভব হয়। সুতরাং গীতার উপদেশ অনুসারে স্বধর্ম্ম বা স্বভাবনিয়ত ধর্ম্ম ও বর্ণধর্ম্মে প্রভেদ নাই। বস্তুতঃ সুনিয়ন্ত্রিত সমাজে গুণ ও কর্ম্ম বর্ণের পরিচায়ক হয়। ইহা ঐশ বিধান বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে, কারণ ইহাই ন্যায্য নিয়ম (১)।

নীতিনিরূপণে প্রত্যেক ধর্ম্মশাস্ত্র সমাজের কুশলকে

(১) গীতা ৪।১৩

নিকষরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, আর গীতায় এই প্রথা সমর্থিত হইয়াছে। বিদ্বান সতত লোকসংগ্রহের প্রতি দৃষ্টি রাখেন(১); নিষ্পাপ ও সংশয়শূন্য ঋষিগণ প্রাণিজাতের হিতে রত থাকিয়া ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করেন (২); এমন কি, যাঁহারা ব্রহ্মের নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় ভাবেই আসক্ত, তাঁহারাও যাবতীয় জীবের মঙ্গল কামনা করিয়া পরমার্থ প্রাপ্ত হন (৩), এতাদৃশ উক্তিগুলি ধর্ম্মশাস্ত্রের বিচারপদ্ধতির স্পষ্ট প্রতিপোষক। ধর্ম্মাচরণ ও কর্ম্মযোগ এক নহে সত্য, যেহেতু ধার্ম্মিকের সাধারণতঃ কর্তৃত্বাভিমান ও ফলাভিসন্ধি থাকে, অথচ কর্ম্মযোগীর পক্ষে ইহারা বর্জ্জনীয়। কিন্তু গীতার উদার আলোচনায় ধর্ম্মের দুইটি দিক্ সুস্পষ্ট হইয়াছে,—একটি জাতির প্রতি ব্যক্তির কর্ত্তব্য আর অন্যটি পরমতত্ত্বে আত্মনিবেদন। প্রথমটি ধর্ম্মশাস্ত্রের ভিত্তিস্বরূপ ও দ্বিতয়টি কর্ম্মযোগের মূলসূত্র। এইরূপে আদর্শ ব্যবহারে ও মুক্তিকামীর সাধনায় গীতা সঙ্গতি প্রদর্শন করিয়াছেন।

নীতিশাস্ত্রবিৎ, মুক্তি সম্বন্ধে উদাসীন হইলে, বলিতে পারেন তাঁহার শাস্ত্রের যুক্তিযুক্ত বিধিনিষেধ অনুসারে ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করিলে ইহ ও পর লোকে মঙ্গল হয়, সমাজও ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, সুতরাং কর্ম্মযোগের অভ্যাস নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু লাভালাভ সম্বন্ধে মতভেদের অবকাশ থাকে। অর্জ্জুনকে প্রথমে বলা হয়, ধর্ম্মযুদ্ধে হত হইলে তিনি দেহান্তে স্বর্গসুখ ভোগ করিবেন আর জয়লাভ করিলে পৃথিবীর ঐশ্বর্য্য তাঁহার হইবে; অথচ ঈদৃশ যুদ্ধে বিমুখ হইলে নিন্দা ও অপমান তাঁহার জীবন বিষময় করিবে। কিন্তু অর্জ্জুনের চিন্তাধারা অন্যরূপ:—ভীষ্ম তাঁহার পিতামহ, দ্রোণ তাঁহার আচার্য্য,

(১) গীতা ৩।২৫ (২) গীতা ৫।২৫ (৩) গীতা ১২।৩,৪

উভয়েই মহানুভব ও তাঁহার হিতৈষী, আর কৌরবগণ দুরাচার হইলেও তাঁহার নিকট আত্মীয়, সুতরাং তাহাদিগকে হত্যা করিলে যদি স্বর্গের আধিপত্য লাভ হয় তাহাও তিনি কামনা করেন না। নীতিজ্ঞ এই মনোভাবের বিরুদ্ধে কি বলিতে পারেন? তস্করকে যদি বলা হয়, চৌর্য্যবৃত্তির ফলে তাহার ইহ ও পর কালে অবনতি সুনিশ্চিত, আর সে উত্তর দেয়, যখন অনশনে মৃতপ্রায় স্ত্রীপুত্রকে অন্য উপায়ে একমুষ্টি অন্ন দিতে সে অক্ষম, চৌর্য্যের শোচনীয় পরিণাম সে আনন্দ সহকারে বরণ করিবে, তাহাকেই বা নীতিজ্ঞ বিরত করিবেন কোন্ যুক্তিবলে? বস্তুতঃ কেবল ফলাফলের আলোচনায় ধর্ম্মের সপক্ষে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয় না; তাহার জন্য জীব ও ঈশ্বরের সম্বন্ধ নিরূপণ আবশ্যক, অথচ তাদৃশ নিরূপণে বিচার অপারগ, সুতরাং মহাপুরুষের অপরোক্ষ অনুভূতিই আমাদিগের সম্বল।

গীতার একাদশ অধ্যায়ে এই অনুভূতি দৃশ্যরূপে বিবৃত হইয়াছে। ঈশ্বর বিশ্বে আত্মপ্রকাশ করিতেছেন। কিছুই তাঁহার অতীত নহে; সুতরাং এই প্রকাশ দিগন্তব্যাপী, আর দৃশ্যজাত লয়োদয়শীল হওয়ায় ইহা কালত্রয়ে প্রসারিত। বহির্জগতে বৈচিত্র্যের অন্ত নাই, সুতরাং উহা তাঁহার অনন্ত রূপ। অন্তর্জগতেও প্রভেদের অশেষ অবসর, আর তাহাতেই দেবনরাদি অগণিত জীবের উদ্ভব। কিন্তু এই সার্ব্বভৌম প্রকাশ তাঁহার সীমা নহে, যেহেতু ইহাকে তিনিই নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। এই পূর্ণতায় তবে জীবের স্থান কোথায়? ইন্দ্রিয়রূপ উপাধিযোগে তাহার ব্যবহার, আর উপাধির সঙ্কীর্ণতা অনুসারে তাহার কর্ম্মক্ষেত্রও সঙ্কীর্ণ। কিন্তু জ্ঞানময় ঈশ্বর সর্ব্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ, আর তাবৎ ক্ষেত্রও তাঁহার অন্তর্গত যেহেতু শব্দস্পর্শাদিময় জগৎ ও সুখদুঃখাদি চিত্তবিকার

জ্ঞানকে অতিক্রম করে না। সুতরাং বেত্তা ও বেদ্য উভয়ই তিনি অর্থাৎ জীব সকল প্রকারে তাঁহার অধীন। তিনি বলবানের বল, বুদ্ধিমানের বুদ্ধি, তেজস্বীর তেজ, তপস্বীর তপস্যা, আর জীবসমষ্টির প্রাণ, অর্থাৎ জীবের পক্ষে স্বাতন্ত্র্যের কোন অবকাশ নাই। বস্তুতঃ প্রত্যেক জীব তাঁহার অমেয় সত্তার কোন বিশেষিত ভাব; তথাপি স্বীয় কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব সম্বন্ধে সে কৃতনিশ্চয়। কিন্তু এই অহঙ্কার অনিবার্য্য নহে ও ইহার অপনয়নে জীবের দুঃখ ও দুর্গতির অবসান হয়। কর্ম্মযোগ আদিষ্ট হইয়াছে, কারণ তাহা এই অলীক অহঙ্কার প্রশমিত করে ও অভ্যাসের ফলে পূর্ণাঙ্গ আত্মনিবেদনে পরিণত হইলে শাশ্বতী শান্তির অব্যবহিত হেতু হয়।

আপ্ত পুরুষের এই উপদেশ, বিচারের ভাষায় অনূদিত হইলে অর্থাৎ সংশয়ের মীমাংসায় ইহাকে পরিণত করিলে, যেরূপ হয় তাহা নিম্নে দিলাম। জীব যদি কেবল প্রকৃতির বিকাশ হয়, তাহা হইলে অহঙ্কার অনিবার্য্য, কারণ অহঙ্কার উক্ত বিকাশের ভিত্তিস্বরূপ। জীব যদি শুদ্ধ চৈতন্য হয়, তাহা হইলে মুক্তির জন্য প্রচেষ্টা অনাবশ্যক, কারণ শুদ্ধ চৈতন্য বা স্ববোধ নির্ব্বিকার ও নিরপেক্ষ অর্থাৎ স্বাধীনতার প্রতিমা। আর জীব যদি ঈশ্বরের অনন্ত রূপের রেখামাত্র হয়, তাহা হইলেও প্রচেষ্টা নিষ্প্রয়োজন, কারণ ঐশ বিধান অনুসারে সীমাহীন দেশে ও কালে তাহার পূর্ণ উদ্‌ঘাটন হইবে; সে বিধান উল্লঙ্ঘন করিবার মত শক্তি তাহার নাই। তাহার ইচ্ছামূলক ও অযত্নসম্ভূত ক্রিয়ায় প্রভেদ করা হয় বটে, কিন্তু উহাদিগের কোনটি নিষ্কারণ নহে। অতএব প্রশ্ন হয়,—এই অলঙ্ঘ্য পরিণামক্রমে পুরুষকারের অবকাশ কোথায়, শাস্ত্রীয় নির্দ্দেশের সার্থকতাই বা কি?

কিন্তু জীব কেবল প্রকাশ নহে, প্রকাশকও বটে; ক্ষর ও অক্ষরভাব তাহাতে সম্মিলিত। এই সম্মিলনের ফলে অক্ষরের স্বস্থ ও সুস্থ ভাব আবৃত হয়; ক্ষতি ক্ষরের, সন্দেহ নাই; তাহাতেই কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বের উদ্ভব, সুতরাং লাঞ্ছনা ও দুঃখের নিয়ত আবির্ভাব। কিন্তু সংসারে দ্রষ্টা ও দৃশ্যের সম্বন্ধ নিতান্ত ঘনিষ্ঠ হওয়ায় জীবই যেন দুঃখভাগী হয়, যদিও তাহার অন্তরতম সত্তা সুখদুঃখের অতীত। সুতরাং উপদ্রব হইতে উদ্ধার জীবের কাম্য। কিন্তু উপায় অবলম্বন করিবে কে? অক্ষর বা জীবাত্মা অক্রিয় ও উদাসীন, কারণ বন্ধনে তাঁহার বিপর্য্যয় হয় না। সাংখ্য বলিয়াছেন, বন্ধন ও মুক্তি প্রকৃতির হয়, পুরুষের গতিমুক্তি নাই, সুতরাং প্রকৃতিই মুক্তির জন্য চেষ্টা করে। গীতার অভিমতও অনুরূপ, কারণ বলা হইয়াছে মানব মনকে সংযত করিয়া তাহার দ্বারা আপনার উদ্ধার সাধন করিবে(১)। অতএব চঞ্চল, অব্যবস্থিত মনের প্রতি শাস্ত্রের আদেশ, নির্ব্বিকার আত্মার প্রতি নহে।

ভাবপ্রবণ সাধক বলেন,—শাস্ত্রের নির্দ্দেশ বিবিধ ও কখন কখন পরস্পরবিরুদ্ধ, কর্ম্মও বিচিত্র ও প্রায়শঃ জটিল, পরন্তু ভক্তিভরে ঈশ্বরের গুণকীর্ত্তন ও তাঁহার মহিমার আলোচনা সরল ও সুখময় সাধন, সুতরাং কর্ম্মের পথে দুঃখপূর্ণ সংসার অতিক্রম করা কঠিন, অথচ এই নির্ব্বিরোধ ও প্রেমপূর্ণ আরাধনা আশুফলপ্রদ, আর গীতাও দশম অধ্যায়ের চারিটি শ্লোকে এই পদ্ধতির প্রশংসা করিয়াছেন(২)। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে, কীর্ত্তনাদিও কর্ম্ম আর বুদ্ধিযোগে তাহাদিগের পরিসমাপ্তি হয়। বলা হইয়াছে বটে যে দুর্ব্বত্তও অনন্যা ভক্তির প্রভাবে অচিরে ধর্ম্মাত্মা হয় ও শাশ্বতী শান্তি লাভ

(১) গীতা ৬।৫,৬,৩৫ (২) গীতা ১০।৮-১১

করে(১)। কিন্তু অনন্যা ভক্তি অসাধারণ সম্পদ্ অর্থাৎ ইচ্ছামাত্রে সে ধনে ধনী হওয়া যায় না। মুক্তির জন্য ঈশ্বর-প্রসাদই যথেষ্ট, এইপ্রকার উক্তিও গীতায় একাধিকবার পাই(২)। কিন্তু শরণাপত্তি ব্যতীত তাহা লাভ করা যায় না, ইহাও গীতা বলিয়াছেন। এই শরণাপত্তি কিরূপ? স্বধর্ম্মপালন করিলে ঈশ্বরের অর্চ্চনা হয়, কারণ তিনিই কর্ম্মে প্রবৃত্তি দিয়াছেন(৩); তিনি পূর্ণ, শাশ্বত ও মঙ্গলময়, অতএব তাঁহার আনুগত্যই শ্রেয়ঃ, অস্থায়ী ও অকিঞ্চিৎকর সুখৈশ্বর্য্যভোগ তাহা নহে; সুতরাং স্বভাবনিয়ত কর্ম্মের ফল, যাহাই হউক না কেন, আশঙ্কা বা অনুযোগের অবকাশ নাই,—এই প্রকার মনোভাবই প্রকৃত শরণাপত্তি, আর কর্ম্মযোগে ইহাই প্রয়োজন, অর্থাৎ প্রভেদ কেবল নামে।

কর্ম্মযোগ ও যজ্ঞ

বস্তুতঃ কর্ম্মযোগের আদেশে কোন সঙ্কীর্ণ পন্থার সন্ধান দেওয়া হয় নাই। বিবিধ প্রকৃতির সমাবেশে মানবসমাজ রচিত, আর এই বৈচিত্র্যে ইহার শোভা ও শক্তি। সুতরাং সকলের পক্ষে এক প্রকার ব্যবহার বাঞ্ছনীয় নহে। লক্ষ্য করিতে হইবে, গীতায় ভক্তের আবেগপূর্ণ আরাধনার প্রশংসা থাকিলেও, প্রস্তাবনায় ও উপসংহারে অর্জ্জুনকে যুদ্ধের মত নির্ম্মম কর্ম্মে প্ররোচিত করা হইয়াছে। কিন্তু স্বভাব অনুসারে কর্ত্তব্য ভিন্ন হইলেও মূলনীতিতে কোন প্রভেদ করা হয় নাই, কারণ প্রত্যেক কর্ম্মযোগী সমাজের কুশল ও আপনার মুক্তি উদ্দেশ্যরূপে গ্রহণ করিবেন, ইহাই অভিপ্রায়। তথাপি প্রশ্ন হইতে পারে, উদ্দেশ্য দুইটি পরস্পরবিরুদ্ধ হইলে, কোন্‌টিকে ত্যাগ করা উচিত? তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে যজ্ঞের সারগর্ভ

(১) গীতা ৯।৩০,৩১ (২) গীতা ১৮।৫৬,৬২ (৩) গীতা ১৮।৪৬

বর্ণনায় গীতা এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। সুতরাং বিবরণটির তাৎপর্য্য নিম্নে সাধ্যমত প্রকাশ করিলাম।

যজ্ঞের উপযোগিতা দ্বিবিধ, অতএব দ্বিবিধ উপদেশ আমরা পাই। প্রথম উপদেশে সমাজের নৈতিক ভিত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহা এইরূপ :—কল্পারম্ভে প্রজাপতি মানবগণকে যজ্ঞের অধিকারিরূপে সৃষ্টি করিয়া বলিয়াছিলেন, ইহার অনুষ্ঠান তাহাদিগের শ্রীবৃদ্ধির কারণ হইবে, এমন কি সর্ব্ববিধ ন্যায্য অভিলাষও পূর্ণ করিবে, কারণ দেবগণ যোগ্য উপায়ে সম্বর্দ্ধিত হইলে যজমানের তাবৎ অভাব দূর করিবেন; পরন্তু তাঁহাদের অনুগ্রহ লাভ করিয়া প্রতিদানে বিমুখ হইলে ব্যবহার তস্করের মতই হইবে (১)। সুতরাং প্রত্যেক যজ্ঞে কোন ভোজ্য বা পানীয় দেবতার উদ্দেশে অনলে আহুতি দেওয়া হইত। আর নিত্যযজ্ঞের প্রচলন থাকায় সংসারযাত্রা ত্যাগমূলক ছিল, যেহেতু কোন প্রিয় বস্তু নিবেদন করিয়া গৃহস্থ পানভোজনাদি দৈনন্দিন ব্যাপার আরম্ভ করিতেন।

যজ্ঞ বৈদিক অনুষ্ঠান, সুতরাং হিন্দুর প্রাচীনতম ধর্ম্মাচরণ। ব্রাহ্মণগ্রন্থে ও শ্রৌত সূত্রে যজ্ঞের সবিশেষ বিবরণ আছে, গীতায় তাহা নাই, কারণ গীতা বাহ্য ব্যাপার উপেক্ষা করিয়া অন্তরস্থ ভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছেন। সুতরাং নিয়ত বা অবশ্যকরণীয় ও কাম্য অর্থাৎ ঐহিক বা পারত্রিক সুখৈশ্বর্য্যের জন্য সম্পাদ্য,—যজ্ঞের এই স্থূল বিভাগ আমরা গীতায় পাই। অগ্নিহোত্র নিয়ত কর্ম্মের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ইহার সম্পাদনে বিভব বা প্রতিপত্তির প্রয়োজন হইত না, অতএব নিত্য কর্ম্মের মধ্যে ইহা গণ্য হইত, অর্থাৎ ইহার প্রাত্যহিক আচরণে অবহেলা করিলে প্রত্যবায় ঘটিত।

(১) গীতা ৩।১০-১২

সামান্য দুগ্ধ, দধি বা তণ্ডুল এই যজ্ঞে আহুতির জন্য বিহিত ছিল, কিন্তু ইহাদিগের অভাবে যজমান শ্রদ্ধাকেই আহুতি দিতে পারিতেন। প্রাতঃকালে মানবজাতি দেবগণকে দক্ষিণারূপে পাইত ও সন্ধ্যায় মনুষ্য দক্ষিণারূপে তাঁহাদিগের করে অর্পিত হইত। রূপকটির তাৎপর্য্য সুস্পষ্ট। দিবাভাগে আহূত দেবতা মানবকে তাহার কর্ম্মে সাহায্য করেন ও রজনীতে মানব তাঁহার আশ্রয়ে নিশ্চিন্তভাবে বিশ্রামসুখ উপভোগ করে,—দেবনরে এই দ্বিবিধ সম্বন্ধ দক্ষিণার ব্যবস্থায় স্বীকৃত হইয়াছিল।

কাম্যকর্ম্মের উদাহরণরূপে জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞ সচরাচর গ্রহণ করা হয়। ইহা সোমযাগের অন্তর্গত ছিল; ষোড়শ পুরোহিত ইহার সম্পাদনে নিযুক্ত হইতেন; দ্বাদশশত গাভী দক্ষিণারূপে প্রদত্ত হইত ও যাজ্ঞিক প্রচুর অন্নদানের ব্যবস্থা করিতেন। বিবিধ ক্রিয়াকলাপ ও বহু অর্থব্যয় আবশ্যক হওয়ায় সাধারণ গৃহস্থ ইহাতে ব্রতী হইতে পারিতেন না, যদিও মহাপাতকনাশক বলিয়া ইহার প্রসিদ্ধি ছিল। সুতরাং ইহার অকরণে প্রত্যবায় হইত না। বস্তুতঃ ইহ বা পর লোকে অসাধারণ ঐশ্বর্য্যলাভ কিংবা অসাধারণ বিপত্তি নিবারণের জন্য প্রধান প্রধান কাম্য কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইত, আর যাঁহারা ধনী ও সমাজে প্রতিপত্তি-শালী ছিলেন, তাঁহারাই কেবল এবংবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন।

কিন্তু অর্চ্চিত দেবগণ সম্বন্ধে ধারণা কিরূপ ছিল? বেদের মন্ত্রভাগে দেখি,—তাঁহারা উজ্জ্বল ও শক্তিমান, মানব অপেক্ষা অগ্রে জাত ও গুরুতর কর্ম্মে নিযুক্ত, অথচ ধর্ম্মের সহায় ও মানবের হিতকারী। তাদৃশ মিত্রের প্রতি অনুরাগ যথেষ্ট নহে; তাঁহাদিগের অসামান্য উৎকর্ষ ও হিতৈষণা উপলব্ধি

করিয়া হৃদয় বিস্ময় ও কৃতজ্ঞতায় যুগপৎ আপ্লুত হইত। সুতরাং তাঁহাদিগকে যে আহুতি দেওয়া হইত তাহা শ্রদ্ধার মূর্ত্ত পরিচয়, উপহারের মত সাধারণ অনুরাগের নিদর্শন নহে। কাম্য কর্ম্মে ভাবী লাভের আশা প্রবল থাকিত বটে ; তথাপি দেব ও নরে অসামান্য পার্থক্য বশতঃ অনুষ্ঠান পণ্যবিনিময়ের মত হইত না। বস্তুতঃ কাম্য ও নিত্য কর্ম্ম উপচারে ও ক্রিয়াকলাপে বিসদৃশ হইলেও শ্রদ্ধা ও ত্যাগে প্রবৃত্তি উভয়েরই যথাযথ আচরণে প্রয়োজন হইত।

গীতা বলিয়াছেন, প্রজাপতি স্বয়ং যজ্ঞের প্রবর্ত্তক আর সৃষ্টির প্রারম্ভেই মানবকে এই প্রবর্ত্তনা দেওয়া হয়। ইহা কি প্রবাদমাত্র ? ইতর প্রাণী দুঃখনিবারণ কিংবা পানভোজনের জন্য প্রভুর আশ্রয় গ্রহণ করে বটে, কিন্তু অন্যের সেবায় ও অদৃশ্য দেবতার সন্তোষবিধানে প্রবৃত্ত হয় না। সুতরাং যজ্ঞে রুচি অর্থাৎ অলৌকিক উপায় অবলম্বনে স্পৃহা মানবের বৈশিষ্ট্য। কেহ কেহ বলেন ক্রমোন্নতির ফলে মানবচিত্তে এই প্রবৃত্তির উন্মেষ হইয়াছে। কিন্তু বীজ হইতেই বিকাশ সম্ভব, আর অভিজ্ঞতা সেই বিকাশকে বিশেষিত করিতে পারিলেও নূতন বীজ বা প্রবৃত্তি সৃষ্টি করে না। সুতরাং লৌকিক উপায়ে উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হইলে যোগ্যতর লৌকিক উপায়ের সন্ধানই স্বাভাবিক ; চরিতার্থতার জন্য অভিনব, এমন কি, বিপরীত পথে অগ্রসর হওয়ার কারণ কি ? উত্তরে আমরা বলিতে বাধ্য,—উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য এই নূতন সাধনায় মানবের জন্মগত অধিকার ছিল, অর্থাৎ প্রজাপতি মানবচিত্তে যজ্ঞে অভিরুচি বীজরূপে বপন করিয়াছিলেন।

কিন্তু এই অভিরুচি কিরূপ ? প্রজাপতির উপদেশ সাবধানে পরীক্ষা করিলে তাহা সুস্পষ্ট হয়। গীতায় দেখি,—

তিনি বলিয়াছিলেন, পরস্বাপহরণরূপ মহাপাতক নিবারণার্থ দেবগণের উদ্দেশে যজ্ঞের অনুষ্ঠান আবশ্যক, কারণ তাঁহাদিগের আনুকূল্যে মানব বাঞ্ছিত বস্তু লাভ করে; সুতরাং যাঁহারা দেহ রক্ষার্থ যজ্ঞাবশেষমাত্র গ্রহণ করেন, তাঁহারা পাপমুক্ত হন, পরন্তু যে কেবল স্বীয় উদরপূরণের জন্য পাক করে তাহার অন্ন পাপে পরিণত হয়। অতএব প্রজাপতি পাপপুণ্যের নিরপেক্ষ বিচারে যজ্ঞের উৎকর্ষ নিরূপণ করিয়াছিলেন, লাভালাভের তুলাদণ্ডে নহে। তথাপি ব্যক্তির ও সমষ্টির অভ্যুদয় তাঁহার নির্দ্দেশে উপেক্ষিত হয় নাই, কারণ উচ্চ ও নীচ পরস্পরের সহায় হইলে জীবসমাজ উন্নতির পথে অগ্রসর হয় আর যজ্ঞই তাদৃশ সহযোগের প্রকৃষ্ট উপায়,—ইহাও তাঁহার অভিমত। সংশয় হইতে পারে,—একই উপায়ে দ্বিবিধ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে কেন? অতএব উত্তরে বলি, তাহা নিয়তই হইতেছে। দেবপূজার জন্য উদ্যানে পুষ্পবৃক্ষ রোপণ করিলাম, ফলে স্থানটি রূপে ও গন্ধে মনোরম হইল। ইহা অবান্তর লাভ বটে, কিন্তু মুখ্য উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে অন্তরায় নহে।

যাহা হউক, এই উপদেশ কাহাকে প্রদত্ত হইয়াছিল আর কালে ইহা উপেক্ষিত হইল কেন? সৃষ্টির প্রারম্ভে এই উপদেশ গ্রহণের যোগ্য কেহ ছিল কি? কোন কোন মনীষীর মতে,—দূর অতীতে অতৃপ্ত অভিলাষ ও অকারণ আশঙ্কার পীড়নে দুর্ব্বল ও অবোধ মানব অলৌকিক উপায় কল্পনা করে, পরে মার্জ্জিত বুদ্ধির আলোকে ইহার অসারতা প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু প্রত্যক্ষ বা ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান এই বুদ্ধির মূলধন, আর অনুমানের প্রয়োগে তাহা বহুগুণ বর্দ্ধিত হইলেও অপ্রত্যক্ষ তত্ত্বের পরিচয় তাহাতে নাই। অথচ মানবচিত্ত নিতান্ত বিকৃত না হইলে প্রত্যক্ষের পশ্চাতে তাহার

পরমাশ্রয় বোধে অপ্রত্যক্ষের সন্ধান করে। যজ্ঞের অনুষ্ঠানে এই প্রচেষ্টার প্রথম অভিব্যক্তি, আর অভাব বা ভয় নিমিত্ত হইলেও, শ্রদ্ধা ও ত্যাগে রুচি ইহার অন্তরঙ্গ বা মূলনীতি। সুতরাং শ্রদ্ধা ও ত্যাগবুদ্ধি মানবচিত্তে প্রথম হইতেই আছে। এই তত্ত্ব প্রজাপতির উক্তিরূপে কবির ভাষায় গীতা ব্যক্ত করিয়াছেন।

প্রতিবাদী হয়ত বলিবেন,—যাহা প্রথম হইতে আছে, তাহাই যে উৎকৃষ্ট বা চিরন্তন, এ অভিমত গ্রহণ করি না, কারণ এ বিষয়ে তাহার উপযোগিতাই বিবেচ্য। অতএব উত্তরে বলি,—হিন্দুর অধঃপতনের পূর্ব্বে বিলাসিতা বর্জ্জন, পূজ্যের পূজা, জ্ঞানীর সমাদর ও ক্ষুধার্ত্তের ক্ষুন্নিবারণ প্রত্যেক বৃহৎ যজ্ঞের অঙ্গস্বরূপ ছিল; সামান্য ব্যাপারেও দীনের অভাবমোচন কর্ত্তব্যবোধে যথাসম্ভব করা হইত। সুতরাং অন্নবস্ত্রের অভাবে দুঃখ, দুর্দ্দশা ও দুর্নীতি প্রতিকারের সীমা লঙ্ঘন করিত না, এইরূপ অনুমান হয়। প্রজাপতির নির্দ্দেশ কালোচিত নহে বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু ফল যে বিষময় হইয়াছে তাহা অস্বীকার করা অসম্ভব।

সমাজের এই সমস্যার সমাধানার্থ মনীষিগণ ইদানীং কয়েক প্রকার ব্যবস্থা দিতেছেন। পরিস্থিতিই তাঁহাদিগের আলোচ্য, ভোগ্যের প্রাচুর্য্য তাঁহাদিগের লক্ষ্য আর প্রবল শক্তির প্রয়োগ তাঁহাদিগের অভীষ্টসিদ্ধির উপায়। কিন্তু পরিস্থিতি পরিবর্ত্তনশীল; প্রাচুর্য্যের মাত্রা স্থির নহে অর্থাৎ অদ্য যাহা প্রচুর বলিয়া স্বীকৃত হইতেছে পরে তাহা অভাবের নিদর্শন হইবে, আর বলপ্রয়োগে 'অবাধে ক্রমোন্নতি হয় না। পক্ষান্তরে যজ্ঞরূপ প্রজাপতির বিধান শ্রদ্ধায় সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল ও সংযম অভ্যাস উহার দৃঢ় অবলম্বন

বলিয়া আদৃত হইত; আর শ্রদ্ধার ফলে শুভ কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মিত ও সংযম, আনুষ্ঠানিক হইলেও, প্রতিকূল চিত্তবৃত্তি-গুলিকে দমন করিত। সুতরাং যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা অভ্যুত্থান ও নৈতিক উন্নতি উভয়ই লাভ করিতেন, আর তাহার ফলে সমাজও উপকৃত হইত।

যজ্ঞ সম্বন্ধে প্রথম উপদেশ আলোচিত হইল। দ্বিতীয় উপদেশের ব্যাখ্যা নিম্নে দিতেছি। ইহা গীতার নিজস্ব, আর ইহাতে কর্ম্মযোগের স্বরূপ পরিস্ফুট হইয়াছে। আপত্তি হইতে পারে,—পুণ্যসঞ্চয় যজ্ঞের উদ্দেশ্য কিন্তু গীতা মোক্ষশাস্ত্র, সুতরাং গীতায় যজ্ঞের আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক। আপত্তিটির সংক্ষিপ্ত অথচ বিশদ উল্লেখ ও উত্তর গীতাতেই পাই। নিম্নে উভয়ের মর্ম্ম দিলাম। নির্ব্বিকার ও নিরাময় আত্মার ধ্যানে যিনি সতত মগ্ন থাকিতে চাহেন কারণ তাহাতেই পূর্ণ সন্তোষ লাভ করেন অর্থাৎ অন্য কিছু প্রয়োজন হয় না, কর্ম্মে তিনি নিযুক্ত হইবেন কেন, বিশেষতঃ যখন আত্মতত্ত্বে অবহিত হইবার জন্য দেব বা নর কাহারও সহায়তা আবশ্যক হয় না(১)? এই সংশয় প্রথমে সঙ্গতই মনে হয়, যেহেতু আত্মার পূর্ণতা ও পবিত্রতা উপলব্ধি করিয়া সাধক যে আনন্দ উপভোগ করেন তাহার তুলনায় যজ্ঞলব্ধ সুখ বা সম্পদ্ তুচ্ছ, কারণ চরম উৎকর্ষেও ইহারা অস্থায়ী ও অসম্পূর্ণ। সুতরাং সেই আনন্দে প্রতিষ্ঠিত হইলে কামনার অবসর থাকে না। কিন্তু কামনার সহিত কর্ম্মের অবসান হইবে কেন? বিষয়মরীচিকা তাঁহাকে আর আকর্ষণ করে না, সত্য। কিন্তু সংসারপঙ্কে পতিত অন্যান্য ব্যক্তির উপকারার্থ তিনি অনাসক্ত চিত্তে সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারেন(২)। শ্রীকৃষ্ণ মুক্ত পুরুষ,

(১) গীতা ৩।১৭,১৮ (২) গীতা ৩।১৯-২১

তথাপি জীবের কল্যাণার্থ কর্ম্মে অনুক্ষণ ব্যাপৃত আছেন; তাহাতে তাঁহার ক্ষতি, বৃদ্ধি, ব্যগ্রতা বা অবসাদ নাই। তিনি সুখদুঃখের অতীত অথচ সংসারে তাঁহার এই পদ্ধতি(১)।

প্রতিপক্ষ বলিবেন,—আত্মায় স্থিতি যাঁহার সিদ্ধ হইয়াছে, তিনি অন্যের মঙ্গলার্থ অনাসক্তচিত্তে কর্ম্ম করিতে পারেন, কিন্তু যাঁহাদের সাধনা সম্পূর্ণ হয় নাই, তাঁহাদের পক্ষে কর্ম্মে আসক্তিত্যাগ অসম্ভব; আর কাম্য কর্ম্মে কামনা ব্যতীত প্রবৃত্তি হইতে পারে না। কিন্তু জীব মুক্ত বা বদ্ধ হউন, দেহ থাকিতে কর্ম্ম তাঁহাকে করিতেই হয়; প্রকৃতির শাসন এ বিষয়ে অলঙ্ঘ্য। সুতরাং জনকাদি রাজর্ষিগণ কর্ম্মের পথেই মোক্ষ লাভ করিয়াছিলেন(২)। জনসাধারণ লাভের আশায় যজ্ঞে প্রবৃত্ত হয়, সেই জন্য শাস্ত্র কাম্য কর্ম্মের বিধান দিয়াছেন। কিন্তু সমাজের নেতা যদি লাভালাভে উদাসীন হইয়া ঈদৃশ কর্ম্ম বর্জ্জন করেন, অন্যান্য ব্যক্তি লোভের বশীভূত থাকিয়াও তাঁহাকে অনুসরণ করিবে, অর্থাৎ কাম্য কর্ম্মের সম্পাদনে যে পরিমাণ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্ভব, তাহাও তাহাদিগের হইবে না। সুতরাং যাঁহারা সমাজের শীর্ষস্থানীয়, লোকশিক্ষার জন্য তাঁহাদিগের অনাসক্তচিত্তে কাম্যকর্ম্মও করা উচিত। বস্তুতঃ যাবতীয় কর্ম্ম প্রকৃতির, যদিও অহঙ্কারের বশে জীব আপনাকে কর্ত্তা ও ভোক্তা মনে করে। অতএব যাঁহারা সাধনায় উন্নত অর্থাৎ কর্ম্মযোগের উপযুক্ত, তাঁহাদিগের পক্ষে কর্ম্ম থাকিতেও কর্ত্তৃত্বাভিমান ও ফলাভিসন্ধি ত্যাগ করা সম্ভব।(৩)

সুতরাং গীতা, মোক্ষশাস্ত্র হইলেও, কাম্য কর্ম্ম নিষেধ করেন নাই, কিন্তু মুমুক্ষুকে কামনা বর্জ্জন করিতে উপদেশ

(১) গীতা ৩।২২-২৪ (২) গীতা ৩।২০ (৩) গীতা ৩।২৫-২৯

দিয়াছেন। স্বর্গসুখ যাহাদিগের পরমার্থ, তাহার অতিরিক্ত কিছুই নাই যাহারা বিশ্বাস করে ও স্বর্গলাভের আশায় বহু-শ্রমসাধ্য যজ্ঞে ব্রতী হয়, তাহাদিগকে অবোধ বলা হইয়াছে। কামনা নানাবিধ ও ভোগে তাহার নিবৃত্তি নাই; সুতরাং কামনা পোষণ করিলে চিত্ত বিষয়ের পর বিষয়ান্তরে আকৃষ্ট হইতে থাকে, বিক্ষোভের আর উপশম হয় না(১)। আর স্বর্গলোক বিশাল ও ভোগে পরিপূর্ণ হইলেও কর্ম্মজনিত ভোগ চিরস্থায়ী হইতে পারে না, যেহেতু কর্ম্মই তাহার পরিমাপক। এমন কি, স্বর্গসুখের লোভে ঈশ্বরের আরাধনা করিলেও, স্বর্গভোগ সেই কামনালাঞ্ছিত কর্ম্মের অনুপাতেই হইয়া থাকে ও তাহার অবসানে দুঃখময় মর্ত্ত্যলোকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়। সুতরাং সোমপায়িগণ যে অক্ষয় স্বর্গবাস কল্পনা করিতেন তাহা ভিত্তিহীন; কামনা থাকিতে গতাগতি অনিবার্য্য।(২)

প্রজাপতির নির্দ্দেশেও এই প্রকার ক্রিয়াবহুল যজ্ঞের বিধান নাই। সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তিগণের সমারোহপ্রিয়তায় ইহা পরিকল্পিত হয় ও শাস্ত্র তাহাদিগের জন্য আড়ম্বরপূর্ণ ব্যবস্থা রচনা করেন, যেহেতু নিয়ম সদোষ হইলেও স্বৈরাচার অপেক্ষা নিয়মানুবর্ত্তিতা নিরাপদ্। যাহা হউক, সেই সকল নিয়ম চিরন্তন নহে, যজ্ঞই চিরন্তন। তথাপি অনুষ্ঠানের দোষ পরে প্রদর্শিত হওয়ায় যজ্ঞই বিরাগভাজন হইল, অর্থাৎ শুষ্ক শাখা কর্ত্তন না করিয়া প্রাচীন মহীরুহের আশ্রয়ত্যাগে হিন্দু অগ্রসর হইলেন। গীতা সম্ভবতঃ এই সঙ্কটকালে রচিত হয়। সুতরাং গীতার মতে যজ্ঞ বা শুভকর্ম্ম কিরূপ তাহা আমরা সাবধানে পরীক্ষা করিব। গীতা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে শাস্ত্রের সাধারণ নির্দ্দেশ গ্রহণ করিলেও(৩) শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট ক্রিয়াকলাপের

(১) গীতা ২।৪২-৪৪ (২) গীতা ৯।২০-২১ (৩) গীতা ১৬।২৪

আলোচনা করেন নাই, বরং মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন শাস্ত্ররচিত আবেষ্টনের বাহিরেও ধর্ম্মজীবন সম্ভব, যেহেতু শ্রদ্ধাই জীবন নিয়ন্ত্রিত করে আর শ্রদ্ধা বিশুদ্ধ হইলে কামনা বা সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতা থাকে না অথচ শুভকর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়।(১) পক্ষান্তরে ক্রিয়াকলাপ যথারীতি হইলেই যে প্রকৃত যজ্ঞ হয় না, তাহাও স্পষ্ট ভাষায় প্রচারিত হইয়াছে। সপ্তদশ অধ্যায়ে দেখি, —শ্রদ্ধা ব্যতীত যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও অন্যান্য কর্ম্ম ব্যর্থ হয়।(২) কিন্তু এই অন্যান্য কর্ম্ম কি? মানবসমাজ গুণ বা প্রকৃতি ও কর্ম্ম বা অভ্যস্ত আচরণ অনুসারে চারি বর্ণে বিভক্ত হইয়াছে। সুতরাং যজ্ঞ, দান ও তপস্যা ব্যতীত, প্রত্যেক ব্যক্তির এই বিভাগ অনুযায়ী স্বীয় কর্ম্ম করা উচিত। আর শ্রদ্ধা পূর্ব্বক ও সংযম সহকারে সেই কর্ম্মগুলি করিলে ব্যষ্টি ও সমষ্টির সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল হয়। বস্তুতঃ গীতার মতে দান, তপস্যা ও বর্ণানুযায়ী কর্ম্ম যজ্ঞেরই অন্তর্গত কারণ গীতা বলিয়াছেন যজ্ঞের অতিরিক্ত সকল কর্ম্মই বন্ধনের হেতু হয়।(৩)

যজ্ঞ সম্বন্ধে উক্ত দ্বিবিধ উপদেশে প্রভেদ আছে, স্বীকার করি; কিন্তু বিরোধ দেখি না। প্রজাপতি বলিয়াছেন,— দেবতার প্রাপ্য দেবতাকে দিবে; যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহাই তোমার ভোগ্য। সুতরাং এই বিভাগ কর্ম্মফলের, আর দেবতার অংশ তাঁহাকে নিবেদন করাই যজ্ঞ নামে বিশিষ্ট ধর্ম্মাচরণ। কর্ম্ম মানবের; কিন্তু দেবতার অনুগ্রহ ব্যতীত তাহা নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় না কিংবা আশানুরূপ ফল প্রসব করে না। অতএব ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের জন্য দেবতাকে কৃতজ্ঞচিত্তে আহুতি প্রদান কর্ত্তব্য। এই প্রকার মনোভাব ও ইহার অনুরূপ আচরণ ধর্ম্মজীবনে একটি প্রসিদ্ধ স্তর, সুতরাং

---

(১) গীতা ১৭।৩ (২) গীতা ১৭।২৮ (৩) গীতা ৩।৯

গীতায় ইহা প্রত্যাখ্যাত হয় নাই। কিন্তু গীতার মতে, কেবল কর্ম্মফলের অংশ নহে, সমগ্র কর্ম্মফল আর কর্ম্মও দেবতার; মানব নিমিত্তমাত্র; সুতরাং উভয়ই তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে অর্পণ করা উচিত। তবে এ দৃষ্টি স্বার্থপর মানবের প্রথমেই হয় না। প্রজাপতির নির্দ্দেশ অনুসারে নিয়ত পুণ্যাচরণ করিলে পাপ নিঃশেষে ক্ষয় হয়, আর সাধক তখন ভজনীয় সম্বন্ধে যুক্ত ধারণা লাভ করেন ও সকলই তাঁহাকে অর্পণ করিতে প্রস্তুত হন। সুতরাং ধর্ম্মের যে বীজ সৃজনকালে মানবচিত্তে বপন করা হইয়াছিল, তাহাই ক্রমোন্নতির ফলে প্রথমে সাধারণ যজ্ঞের আকার ধারণ করে ও পরে কর্ম্মযোগে পরিণত হয়।

দ্রব্যার্পণরূপ যজ্ঞে নিবেদন আংশিক ও তাহা সাময়িক ব্যাপার। কর্ম্মযোগে নিবেদন সম্পূর্ণ, সুতরাং তাহা জীবন-ব্যাপী অনুষ্ঠান। এই তারতম্য শ্রুতিও লক্ষ্য করিয়াছিলেন। ছান্দোগ্যে দেখি,—ঘোর আঙ্গিরস স্বীয় শিষ্য দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন,—সমগ্র মানবজীবনই যজ্ঞ, যদিও কর্ম্ম ও ভোগ অনুসারে তাহাকে চতুর্ধা বিভক্ত করা হয়।(১) গীতা এই তত্ত্বেরই বিশদ ও বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিয়াছেন। কেবল দ্রব্যময় যজ্ঞ, দান ও তপস্যা নহে, পরন্তু তোমার সকল কর্ম্ম ও ভোগ স্রষ্টা ও পাতাকে অর্পণ করিও, যেহেতু কর্ম্মের উৎপত্তি ও ভোগরূপে অবসান প্রকৃতপক্ষে তাঁহাতেই হয়,—গীতার উপদেশ এইরূপ।

কর্ম্মযোগের যে সুদীর্ঘ আলোচনা করিলাম, তাহা পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতির কারণ হইতে পারে। তথাপি আবশ্যক বোধে এ বিষয়ে আরও কিছু বলিব, যেহেতু মধ্যযুগে যাঁহারা ধর্ম্মসংস্কারে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদিগের প্রচেষ্টা জনসাধারণের উপযোগী হয়

(১) ছান্দোগ্য ৩।১৭

নাই। যাঁহারা জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করিলেন, নিভৃতে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন তাঁহাদিগের সাধনা হইল আর সন্ন্যাসীকে তাঁহারা এ সম্বন্ধে যোগ্য উপদেশ দিলেন। কিন্তু সংসার হেয় কিংবা অলীক, এই ধারণার বশে সংসারী উপেক্ষিত হইল; ফলে উপযুক্ত শিক্ষা ও দৃষ্টান্তের অভাবে সাধারণ ব্যক্তি আচারে ও শুচিতায় গুরুত্ব আরোপ করিলেন। অর্চ্চনা অন্তরের ব্যাপার, অথচ উৎসব ও সম্পন্ন গৃহস্থের আলয়ে বাহ্যাড়ম্বর তাহার স্থান অধিকার করিল। আর বিশিষ্ট ধর্ম্মাচরণের মধ্যে রহিল সন্ন্যাসীর সেবা, তীর্থ-ভ্রমণ ও প্রচলিত প্রথামত পুরোহিত কর্ত্তৃক কুলদেবতার সংবর্দ্ধনা। যাঁহারা ভক্তিমার্গ অবলম্বন করিলেন, তাঁহাদিগের আবেগময়ী ভাষা ও নামকীর্ত্তন শুষ্ক হৃদয়ে ধর্ম্মের শীতল বারি সিঞ্চন করিল বটে, আর দৈনিক নামজপের অভ্যাসে ভজনীয়ের সিংহাসন অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু ভক্তের আহ্বান রহিল মধুরের পূজায়, অথচ বিশ্বরূপে মধুর ও কর্কশ অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্বদ্ধ। বস্তুতঃ এই দ্বিবিধ সংস্কারেই জীবনে একটি কৃত্রিম বিভাগ সৃষ্ট হইল; ধর্ম্মচিন্তাকে দেওয়া হইল কিয়দংশ, অবশিষ্ট রহিল সংসারের অধিকারে। কিন্তু গীতা বলিয়াছেন,—তোমার তাবৎ কর্ম্ম ও ভোগ শ্রদ্ধা সহকারে পরম গুরু ঈশ্বরে নিবেদন করিবে, কারণ জীবনের কোন অংশই ঐশ প্রকাশের অতীত নহে(১)। আর ইহাই প্রকৃতপক্ষে কর্ম্মযোগ বা গীতার অভিপ্রেত যজ্ঞ।

জ্ঞানযোগ ও যজ্ঞ

আপত্তি হইতে পারে,—জ্ঞানযোগ গীতার মতে অন্যতর সাধনা, আর ইহার বর্ণনায় সংযম সম্বন্ধে প্রশস্ত উপদেশ থাকিলেও যজ্ঞ বা নিবেদনের উল্লেখ নাই। কিন্তু শ্রদ্ধা ও ত্যাগে আগ্রহ ব্যতীত এই সকল সংযম মানসিক ব্যায়ামমাত্র, আর ইহার অভ্যাসে সাধক হঠযোগীর মত অসামান্য শক্তি

বা সহিষ্ণুতা লাভ করিলেও পারমার্থিক উন্নতি তাঁহার হয় না। সুতরাং ভোগেচ্ছাবর্জ্জন, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, চিত্তবৃত্তিনিরোধ, মনোনিবেশপূর্ব্বক শাস্ত্রাধ্যয়ন ও প্রাণায়াম গীতায় যজ্ঞরূপে বর্ণিত হইয়াছে(১)। ইহা কেবল চিত্তাকর্ষক রচনাভঙ্গী নহে; তত্ত্বদর্শীর সারগর্ভ উপদেশ। বস্তুতঃ এই তপোযজ্ঞগুলি ব্রহ্মযজ্ঞ নামে খ্যাত জ্ঞানযোগীর মুখ্য সাধনার উপক্রমস্বরূপ। সেই সাধনায় যজ্ঞের পরিকল্পনা স্মরণ রাখিয়া তিনি দেখেন ব্রহ্মই হোতা, হবি, হবন ও হোমাগ্নি(২)। প্রগাঢ় ধ্যানে তাঁহার এই যজ্ঞ সম্পন্ন হয়, আর কর্ম্মযোগী জীবনের প্রত্যেক ব্যাপারে ইহার অনুষ্ঠান করেন, যেহেতু তাবৎ কর্ম্ম ও ভোগ ব্রহ্মে নিবেদন করাই তাঁহার বিধি। প্রভেদ এই,—প্রথম সাধক, প্রকৃতি অনুসারে শারীরিক ক্রিয়া যথাসম্ভব সঙ্কুচিত করিয়া ভাবনাময় যজ্ঞে ব্রহ্মের সর্ব্বময়ত্ব উপলব্ধি করেন, পরন্তু দ্বিতীয় সাধক সমুদায় বিহিত কর্ম্ম করিলেও নিয়ন্তাকে স্মরণ করিয়া কর্ত্তৃত্বাভিমান ও ভোগাভিলাষ বর্জ্জিত হন। উভয়ের সাধনাই কামনামূলক দ্রব্যার্পণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কারণ অনাবিল শান্তির হেতু হয়, কিন্তু কোনটি কর্ম্মহীন নহে, কারণ সংযম, নিরোধ, ধ্যান, অধ্যয়ন ও প্রাণায়াম হস্তপদাদি সঞ্চালন ব্যতিরেকে সাধ্য হইলেও কর্ম্ম। গীতা বলিয়াছেন, সাধক যে পথই গ্রহণ করুন, কর্ম্ম ব্যতীত যজ্ঞ হয় না তাহা স্মরণ রাখিতে হইবে(৩)।

জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগে উপাস্য

কিন্তু উক্ত দ্বিবিধ সাধনার মূলে যে অনুভূতির প্রেরণা আছে, তাহার সবিশেষ বিবরণ গীতায় নাই। মহাসমরের অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রধান যোদ্ধাকে কর্ত্তব্যে অবহিত করিবার জন্য গীতার আরম্ভ; সুতরাং প্রকরণ অনুসারে লয়ে ব্রহ্মের পরিচয়

(১) গীতা ৪।২৬-৩০ (২) গীতা ৪।২৪ (৩) গীতা ৪।৩২

প্রকৃষ্টরূপে দেওয়া হইয়াছে, উদয়ে ব্রহ্মের সন্ধান তাদৃশ প্রশস্ত নহে। যাহা হউক, প্রাচীনতর শাস্ত্রে ইহার বিস্তারিত বর্ণনা আমরা পাই অর্থাৎ সৃষ্টি রহস্য যথাসম্ভব উদ্ঘাটিত হইয়াছে। পুরুষযজ্ঞের বিবরণে ঋগ্বেদ অমর ছন্দে এই তত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন। ক্রিয়াকলাপের ব্যবস্থা ব্রাহ্মণ গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও স্থানে স্থানে ইহার আবৃত্তি আছে, আর উপনিষদে আত্মার সম্পদের বর্ণনায় ইহারই প্রতিধ্বনি আমরা শুনি। ঋগ্বেদের উপদেশ সুস্পষ্ট করিবার জন্য কিছু যুক্তি সহকারে নিম্নে দিলাম।

প্রশ্ন এই,—কোন্ দেবতার উদ্দেশে বিশ্বপ্রকাশক যজ্ঞ বা শুভকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছিল? পরম পুরুষ তাহার অনুষ্ঠাতা, অথচ যাবতীয় যজ্ঞে তিনিই প্রধান দেবতা। সুতরাং অনুষ্ঠান বা প্রকাশেই তাহার সমাপ্তি হয়; কোন দেবতার সন্তোষ-বিধানার্থ তাহার আয়োজন হয় নাই। সেই যজ্ঞে যজমানের কোন প্রয়োজন ছিল কি? তাঁহার সামান্য এক অংশে বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত; বিশ্বের তিনি আশ্রয়, বিশ্ব তাঁহার অবলম্বন নহে; অতএব বিশ্বের সৃষ্টিতে তাঁহার কোন অভাব দূর হয় নাই। বস্তুতঃ জ্ঞানময় পুরুষের তাহা স্বাভাবিক অভিব্যক্তি বা স্বতঃ-স্ফুরণ। অভাব ব্যতীত যে কর্ম্ম হয় না তাহা সত্য নহে; অভিব্যক্তিও কর্ম্ম ও অবাধ অভিব্যক্তি পূর্ণতারই লক্ষণ। কাহাকে এই যজ্ঞে বলি দেওয়া হয়? যজ্ঞের পূর্ব্বে পুরুষ ব্যতীত কেহ ছিল না; সুতরাং তিনিই পশুরূপে যজ্ঞসম্পাদনার্থ খণ্ডিত হইয়াছিলেন, অর্থাৎ নির্বিশেষ চৈতন্য স্বতঃ বিশেষিত বা খণ্ডিত হওয়ায় এই বিশ্বের উৎপত্তি হয়। দার্শনিক বলিতে পারেন শুদ্ধ চৈতন্যে ক্রিয়া সম্ভব নহে। কিন্তু ক্রিয়া রূপান্তরতা-মাত্র, আর রূপের অস্তিত্ব জ্ঞানে। সুতরাং ক্রিয়া জ্ঞানেরই

ভেদ, আর ভোগও তাহাই। তথাপি সংশয় হয়, চৈতন্যের মত নির্বিশেষ তত্ত্বে বিশেষের স্বতঃ উদ্ভব সম্ভব নহে; চতুষ্কোণ পদার্থ কি বিনা কারণে বৃত্তাকার হয়? কিন্তু সসীম বস্তুর আকৃতির পরিবর্ত্তন অকারণে হয় না, উক্ত দৃষ্টান্তে এইমাত্র বলা হইয়াছে। নিমিত্ত ব্যতীত সর্ব্বাধার অপ্রমেয় তত্ত্বের প্রকাশ অসম্ভব, ইহা অন্য প্রতিজ্ঞা। যাহা হউক, এবংবিধ আপত্তির প্রতি ইঙ্গিত করিয়া ঋগ্বেদ যে উত্তর দিয়াছেন তাহাতে অনুমান ও বিতর্কের দ্বৈতভাব অতিক্রান্ত হইয়াছে; অর্থাৎ শাস্ত্র প্রকৃত অদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়াছেন। কাহারা এই বিরাট যজ্ঞে উদ্যোক্তা ছিলেন, ব্রহ্মের কি কোন সহকারী ছিল না?—এই প্রশ্নের উত্তরে দেব, ঋষি ও সাধ্যগণের উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু তাহারা সকলেই এই যজ্ঞজাত; অতএব জন্মের পূর্ব্বেই তাঁহারা উদ্যোগী হইয়াছিলেন। তাৎপর্য্য এই,—যাবতীয় সসীম ভাব আদিকারণে নিহিত ছিল ও তাঁহার সার্ব্বভৌম প্রকাশে উপযুক্ত অভিব্যক্তির জন্য বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করিল।

ব্রহ্মে জীবের লয় ও উদয় হইলেও স্থিতিতে তাহার বৈশিষ্ট্য নাই কি? তৈত্তিরীয় আরণ্যক বলিয়াছেন, প্রজাপতি জীব-নিবাস ও জীবদেহ সৃষ্টি করিয়া স্বয়ং সেই সকল দেহে অনু-প্রবিষ্ট হইয়া আছেন। শতপথ ব্রাহ্মণে অগ্নিচয়নের বর্ণনায় এই তত্ত্ব আরও পরিস্ফুট হইয়াছে। প্রজাপতি বৈশ্বানর অগ্নিরূপে কর্ম্ম ও ঘটনার মূল, তিনি কালরূপে অবস্থিত অর্থাৎ ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানে সকল ঘটনাই তাঁহার অভিব্যক্তির অন্তর্গত। আর যজমান ও তিনি অভিন্ন অর্থাৎ যজমানের পৃথক্ কর্ত্তৃত্ব নাই। সুতরাং দেবনরের যাবতীয় অনুষ্ঠান তাঁহার যজ্ঞরূপ বস্ত্রের তন্তুস্বরূপ। এই বস্ত্রে বিশ্ব চিত্রিত, আর ইহার

বয়ন বা সৃষ্টি প্রকৃতপক্ষে বিসৃষ্টি বা মূল সত্তার বিবিধ বিকাশ। কিন্তু এই মূল সত্তা স্বরূপে কি? উপনিষৎ বলিয়াছেন, তিনি আত্মা বা পুরুষ। আলোচনার সুবিধার জন্য দার্শনিক জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞানে ভেদ করিয়া থাকেন; ব্যবহারে ইহার প্রামাণ্যও আছে। কিন্তু চরম তত্ত্বের ধারণায় ইহা কৃত্রিম, অযথার্থ। তিনি পরম পুরুষ অর্থাৎ পূর্ণ অথচ অন্যনিরপেক্ষ।

গীতার উপদেশও কি এইরূপ? পুরুষসূক্তের মত সৃষ্টির বর্ণনা গীতায় নাই। কিন্তু সপ্তম অধ্যায়ের শেষে ও অষ্টম অধ্যায়ের আরম্ভে ব্রহ্মজ্ঞানের ব্যাখ্যায় বৈদিক বিবরণ অনুমোদিত হইয়াছে। এই ব্যাখ্যায় আমরা ব্রহ্মের কয়েকটি ভাবের উল্লেখ পাই। প্রথমতঃ তাঁহার নিরুপাধিক ভাব; এই ভাবের ব্যত্যয় নাই, কারণ চৈতন্যের সাক্ষ্য ব্যতীত অভাবও বাস্তব হয় না; সুতরাং গীতা ইহাকে পরম অক্ষর বলিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ প্রতিদেহে তাঁহার আত্মভাবে অধিষ্ঠান; বস্তুতঃ আত্মভাবই তাঁহার শুদ্ধ প্রতিকৃতি, যদিও দেহের সংসর্গে তাহা সুখদুঃখের ভোক্তারূপে পরিচিত হয়। আর এই দেহাদিপরিণামী জড়বর্গের উৎপত্তি ও বিকাশের জন্য তাঁহার যে বিস্তার বা বিশেষ তাহাই কর্ম্ম নামে প্রখ্যাত(১)।

বিশেষের আরও কিছু বিবরণ গীতা দিয়াছেন; তাহার মর্ম্ম যুক্তিসহকারে নিম্নে দিলাম। কল্পব্যাপী রূপরসাদিময় বিশ্ব বা গ্রাহ্যসমষ্টি জ্ঞানেই সত্তা লাভ করে; কিন্তু জীবের জ্ঞান সঙ্কীর্ণ ও লয়োদয়শীল; সুতরাং ব্রহ্মের জ্ঞানেই তাবৎ গ্রাহ্যের উদ্ভব ও পরিণতি; জীব যোগ্যতা ও সুযোগ অনুসারে তাহাদিগকে গ্রহণ করে মাত্র। আর সেই গ্রহণই বা কিরূপ?

(১) গীতা ৮।৩

গ্রহণাত্মক ইন্দ্রিয়গ্রামের ক্রিয়ায় ব্যবহারের আরম্ভ আর ব্যবহারেই জীবভাবের বিকাশ হয়; সুতরাং ব্রহ্মই তাহাদিগের প্রেরক, জীব নহে। কিন্তু জীবহৃদয়ে যে ধর্ম্মাধর্ম্ম বোধ আছে, তাহা ব্যবহারের দান নহে, কারণ পূর্ব্ব ব্যবহার কেবল লাভালাভ বা সুখদুঃখের সন্ধান দিতে সক্ষম, শ্রেয়োমার্গের সঙ্কেত তাহাতে নাই। সুতরাং ব্রহ্মই অন্তর্য্যামিরূপে জীবকে এই প্রকৃষ্ট জ্ঞান দিয়া থাকেন। জীবের সহিত তাঁহার এই ত্রিবিধ সম্বন্ধ লক্ষ্য করিয়া গীতা তাঁহাকে অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞ বলিয়াছেন(১)। অতএব গীতার মতে তিনি কেবল সমাহিত, নিঃসঙ্গ, নিষ্ক্রিয় পুরুষ নহেন অথচ তাঁহাকে স্বতন্ত্র উপাদানযোগে বিশ্বের রচয়িতা কিংবা বিশ্ব ও বিশ্ববাসীর নিয়ন্তামাত্র বলিলে অযোগ্যভাষণ হয়। তিনি সর্ব্ব, কারণ সকলই তাঁহার অন্তর্গত(২)। এই তত্ত্ব স্মরণ রাখিয়া জ্ঞানযোগী ব্রহ্মযজ্ঞে নিবিষ্ট হন আর কর্ম্মযোগী তাঁহাকে যাবতীয় শুভকর্ম্মের প্রভু ও ভোক্তা বলিয়া অঙ্গীকার করেন(৩)। বস্তুতঃ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর সম্বন্ধে এই প্রকার ধারণা হিন্দুধর্ম্মের মূলতত্ত্ব, তাহার সুদৃঢ় ভিত্তিস্বরূপ।

হিন্দুধর্ম্মের সমালোচনা

প্রতিবাদী বলেন,—বেদে সুখসমৃদ্ধির জন্য বহু উপাস্যের অনুগ্রহভিক্ষা দেখি; গীতা ঈশ্বরতত্ত্বের বিশদ ব্যাখ্যা দিলেও অভ্যুদয়ের জন্য দেবার্চ্চনার উপযোগিতা স্বীকার করিয়াছেন(৪), আর পরবর্ত্তী কালে বিভিন্ন দেবমূর্ত্তির বিবিধ উপচারে পূজা হিন্দুর প্রধান ধর্ম্মাচরণ হইয়াছে; সুতরাং প্রাচীন ইতিবৃত্তে কিংবা বর্ত্তমান ব্যবহারে হিন্দুধর্ম্মের উক্ত বর্ণনা সমর্থিত হয় না। কিন্তু কোন পুরাতন ধর্ম্মের প্রকৃত

(১) গীতা ৮।৪ (২) গীতা ১১।৭০

(৩) গীতা ৯।২৪ (৪) গীতা ৭।২১,২২, ১৭।৪

রূপ নির্ণয় করিতে হইলে পরম তত্ত্ব সম্বন্ধে তাহার উপদেশই প্রথমে আলোচ্য। ক্রিয়াকলাপে ও উৎসবে লোকাচার ও পরিস্থিতির প্রভাব সামান্য নহে। সুতরাং তাহাদিগের আলোচনা সমাজের ইতিহাস সঙ্কলনে প্রয়োজন হইলেও ধর্ম্মের স্বরূপ নিরূপণে অপ্রাসঙ্গিক। আমাদিগের প্রথম প্রশ্ন এই,—বৈদিক ধর্ম্মের সার সত্য কি? জ্ঞানাত্মক উপনিষদেই তাহার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে, আর শ্রদ্ধা সহকারে তাহার বর্ণনা পূর্ব্বে দিয়াছি। সুতরাং উপদেশের মর্ম্ম এস্থলে সংক্ষেপে দিলাম। চরম তত্ত্ব বা ব্রহ্ম চিন্ময় পুরুষ অতএব নানাত্ববর্জ্জিত, তথাপি বিচিত্র রূপের উদ্ভব, বিকাশ ও অভিভব তাঁহাতেই হয়; সুতরাং এই সকল রূপ অর্থাৎ বস্তু বা ঘটনা অলীক কিংবা বিজাতীয় নহে, কিন্তু অনিত্য, অথচ অনিত্যে শান্তি বা সন্তোষ নাই; জ্ঞানী এই জন্য ব্রহ্মের আংশিক ও অস্থায়ী প্রকাশে অবহিত না হইয়া তাঁহার নিত্য শান্ত ভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন; বস্তুতঃ ইহাই নিঃশ্রেয়স বা মুক্তির উপায়; পরন্তু অভ্যুত্থানমাত্রেই সাময়িক, সুতরাং তাহার জন্য প্রযত্ন মুক্তির উপায় নহে।

কিন্তু এই ব্যাখ্যায় প্রতিবাদী নিরুত্তর হন না। তাঁহার মতে,—সংযত ব্যবহার ও আদর্শ পুরুষের ধ্যান শান্তিলাভের প্রণালী বটে; কিন্তু ধর্ম্ম সম্বন্ধে জনসাধারণের ধারণা কখন এরূপ ছিল না, এখনও নাই। অনাবিল পূজাপদ্ধতি ও হিতকর নীতির নির্দ্দেশে ধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রকট হয়, অথচ সংহিতায় স্বার্থসিদ্ধির জন্য বহু দেবতার স্তুতি আছে, আর ব্রাহ্মণে ক্রিয়াকলাপের সাড়ম্বর বর্ণনায় সত্য, দয়া, ক্ষমা প্রভৃতি সদ্‌গুনের বিশেষ উল্লেখ নাই। পরবর্ত্তী কালে দার্শনিকগণের অসামান্য গবেষণা উপনিষৎ নামে বেদের অন্তর্ভুক্ত হয় বটে,

কিন্তু এই সংযোগ ঘনিষ্ঠ বা বাস্তব হইয়াছিল কি ? কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডে সাধনায় ও সাধ্যে বিরোধ সুস্পষ্ট, আর মানব সাধারণতঃ জ্ঞান অপেক্ষা কর্ম্মের পক্ষপাতী। সুতরাং সাধারণ্যে পূর্ব্বতন কর্ম্মকাণ্ডই সমাদৃত রহিল, যদিও অল্পসংখ্যক সূক্ষ্মদর্শী জ্ঞানকাণ্ডের অনুশীলনে নিযুক্ত হইলেন। ধর্ম্মাচরণের আধুনিক পদ্ধতিও এই অনুমানের অনুকূল; যেহেতু বহুদেব-বাদের প্রভাব ব্যাপক ও স্থায়ী হইয়াছে, অথচ তত্ত্বজ্ঞানের চর্চ্চা পূর্ব্বাপেক্ষাও এখন সঙ্কুচিত। অতএব অপ্রিয় সত্য হইলেও হিন্দুদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে তাহারা চির-দিনই একেশ্বরবাদের বিরোধী।

এই সমালোচনায় সত্যের কিছু আভাস থাকায় ইহা সাংঘাতিক হইয়াছে, কারণ বিদেশীয় চিন্তাধারায় ইহার উৎপত্তি হইলেও, প্রগতিশীল স্বদেশবাসী দ্রুত উন্নতির জন্য ইহাকে নির্বিচারে গ্রহণ করিতেছেন। আর এই প্রবৃত্তি কখন অতীতের যাবতীয় নির্দ্দেশের প্রতি ঔদাসীন্যে প্রকাশ পায়, কখন বা উৎকট প্রতিবাদে। বস্তুতঃ কেবল চিন্তারাজ্যে নহে, জীবনের নানা ব্যাপারে নবীন ও দূরাগতের এবংবিধ সংবর্দ্ধনা অত্য পরিস্ফুট। সে যাহা হউক, উক্ত সমালোচনার মূলসূত্র কি আর ভারতের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য ও কৃষ্টি সম্বন্ধে উহা প্রযোজ্য কি না, তাহাই আমরা বর্ত্তমান প্রসঙ্গে দেখিব।

মূলসূত্র এইমাত্র, আর্য্যজাতির বিভিন্ন শাখা দেশদেশান্তরে বসবাস করিলেও প্রথমে প্রকৃতির উপাসক ও বহুদেববাদী ছিল; পরে অন্য জাতির সংশ্রবে আসিয়া কিংবা বুদ্ধির স্বাভাবিক বিকাশের ফলে তাহাদিগের ধর্ম্ম অল্পাধিক পরিবর্ত্তিত হয়; আরও পরে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকগণের উপদেশ ও ব্যবহারে কোন কোন শাখা যীশু খ্রীষ্টের উন্নত ধর্ম্ম গ্রহণ করেন অর্থাৎ

একেশ্বরবাদী হন; ভারতীয় আর্য্যদিগের ভাগ্যে কিন্তু তাহা ঘটে নাই। প্রত্নবিৎ বলেন, গ্রীক্, রোমান্, ও হিন্দুগণের পুরাতত্ত্বে এই সূত্র সমর্থিত; অন্যান্য শাখার প্রাচীন ইতিহাসও ইহার সপক্ষে। যাহা হউক, উক্ত জাতিত্রয়ের আদি ধর্ম্ম সম্বন্ধে নিম্নে কিছু বলিতেছি।

প্রত্নবিৎ গ্রীক্ ও রোমান্ ধর্ম্মের তথ্য কাব্য, ইতিহাস ও ভাস্কর্য্য হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, অথচ ইহাদিগের সাক্ষ্য নিপুণতা সহকারে সংকলিত হইলেও অসম্পূর্ণ ও অসম্বদ্ধ হইতে বাধ্য। পক্ষান্তরে হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত রূপ নির্ণয় করিবার জন্য তিনি বেদ পরীক্ষা করিয়াছেন, আর বেদই হিন্দুগণের প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ, অর্থাৎ কোন সম্প্রদায় ইহার নির্দ্দেশ প্রত্যক্ষতঃ অগ্রাহ্য করেন না। এই তুলনামূলক আলোচনার ফলে সিদ্ধান্ত হইয়াছে,—গ্রীক্ ও রোমান্ দেবদেবী রূপ, গুণ ও ব্যবহারে বহুলাংশে মানবের মত, যদিও শক্তি ও ঐশ্বর্য্যে মহত্তর; তথাপি তাঁহারা স্বতন্ত্র নহেন কারণ স্বর্গেও রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত আর স্বর্গের অধিপতি শৌর্য্যে ও বিক্রমে অন্যান্য স্বর্গবাসী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; সুতরাং অমোঘ প্রভাবের ফলে তাঁহার নিয়ম বা নীতি স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে প্রতিপালিত হয়। যাহা হউক, এ সকল উপকথায় পরিণত হইয়াছে, কারণ গ্রীক্ ও রোমান্ খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

হিন্দুধর্ম্ম কালক্রমে অল্পাধিক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে বটে, তথাপি কোন পরিবর্ত্তন বেদবিরোধী হয় নাই। সুতরাং হিন্দুধর্ম্মের স্বরূপ নির্দ্ধারণার্থ বেদের আলোচনা সঙ্গতই হইয়াছে। কিন্তু পাশ্চাত্য প্রত্নবিৎ 'বেদ' শব্দটি সঙ্কীর্ণ অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। ভারতীয় আর্য্যগণের ধর্ম্মজ্ঞাপক আদি শাস্ত্রচতুষ্টয়ের নাম বেদ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ জ্ঞান। কিন্তু বিষয়

অনুসারে চতুর্ব্বেদই চারি ভাগে বিভক্ত। সংহিতায় মন্ত্র বা অর্চ্চনীয়ের স্তুতি পাই; ব্রাহ্মণে অর্চ্চনার বিধি আছে; আরণ্যক উপচার ও বাহ্যক্রিয়া ব্যতিরেকে অর্চ্চনার নির্দ্দেশ দিয়াছেন; আর নিখিল অর্চ্চনায় চরম অর্চ্চনীয় কে তাহাই উপনিষদে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই অর্চ্চনার প্রসিদ্ধ নাম যজ্ঞ। কোন কারণে ভারতে অথর্ব্ববেদের যজ্ঞে ব্যবহার হয় নাই কিংবা তাদৃশ ব্যবহার পরিত্যক্ত হইয়াছিল। সুতরাং ত্রয়ী নামে খ্যাত ঋক্, সাম ও যজুঃ এস্থলে আলোচিত হইবে। ইহাদিগের প্রত্যেকে সংহিতা ও ব্রাহ্মণ সুসম্বদ্ধ, কারণ পূর্ণাঙ্গ যজ্ঞে উভয়েরই আবশ্যক। কেবল স্তোত্রের আবৃত্তি করিলে এই প্রকার অনুষ্ঠান হয় না; উপচার ও বিবিধ ক্রিয়ার প্রয়োজন হয়, আর সেই জন্য সংহিতা ও ব্রাহ্মণ একত্র কর্ম্মকাণ্ড নামে পরিচিত। পক্ষান্তরে, বাহ্যক্রিয়া যথাসম্ভব সঙ্কুচিত করিয়া দৃষ্টি ক্রমশঃ পরমতত্ত্বে নিবদ্ধ রাখিবার উপায় আরণ্যক ও উপনিষদে প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং জ্ঞানকাণ্ড ইহাদিগের সার্থক নাম।

কিন্তু প্রতীচ্য পণ্ডিতগণের মতে সংহিতা অর্থাৎ নানা দেবদেবীর স্তুতিই বিশুদ্ধ বেদ। প্রকৃতির বিরাট সংস্থানে অনভিজ্ঞ ও অসহায় মানব অচেতন শক্তির বিচিত্র পরিচয় পাইয়া, পরিচয় অনুসারে বিস্ময়ে, ভয়ে বা আনন্দে অভিভূত হইত ও তাহার অনিয়ন্ত্রিত মন উক্ত রূপগুলির পশ্চাতে অসামান্য জ্ঞান ও বিক্রম কল্পনা করিত। এই কল্পিত দেবগণের তোষণার্থ মন্ত্র বা স্তোত্রের রচনা হয়। শিশুর কাকলীর মত অধিকাংশ রচনাই সরল ও সুমধুর অথচ অসম্বদ্ধ ও অতিরঞ্জিত। গ্রীক্ ও রোমান্ দেবতা মানব অপেক্ষা শৌর্য্যে ও জ্ঞানে উন্নত হইলেও তাহাদিগের মধ্যে

প্রকৃতিগত ভেদ ছিল না। কিন্তু সংহিতায় দেবদেবীর মানবতা তাদৃশ সুস্পষ্ট নহে। অগ্নির মধ্যবর্ত্তিতায় দেব ও মানবে সম্বন্ধ স্থাপিত হইত; নচেৎ নৈসর্গিক অধিষ্ঠানের অন্তরালে তাঁহারা প্রচ্ছন্ন থাকিতেন। যাহা হউক, বৈদিক যুগে স্তোত্রের আবৃত্তিই ভারতীয় আর্য্যগণের প্রধান ধর্ম্মাচরণ ছিল। কিন্তু কালক্রমে সমাজ পুরোহিতপ্রধান হইলে, পুরোহিতগণ স্বীয় প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য ক্রিয়াবহুল যজ্ঞের প্রবর্ত্তন করিলেন। ফলে, অজ্ঞ, দুর্ব্বল মানবের সরল, স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মে পরিণত হইল। আরও পরে ক্ষত্রিয় নৃপতিগণের মধ্যে কেহ কেহ প্রচলিত ধর্ম্মের অসম্পূর্ণতা লক্ষ্য করিয়া চিন্তাশীল জিজ্ঞাসুকে আত্মা ও পরলোক সম্বন্ধে উন্নত উপদেশ প্রদান করেন। কিন্তু তাহা দর্শনের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় অধ্যায় হইলেও ভারতীয় ধর্ম্মে তাহার প্রভাব উল্লেখযোগ্য হয় নাই, কারণ সাধারণ হিন্দু এখনও বহুদেববাদী, অনুষ্ঠানপ্রিয় ও প্রতিমাপূজক।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অসাধারণ বিদ্যাবত্তা ও অধ্যবসায়ের ফলে আমার মত অজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে মূল শাস্ত্রের আলোচনা সম্ভব হইয়াছে। সুতরাং তাঁহাদিগের দান কৃতজ্ঞচিত্তে অঙ্গীকার করিতেছি। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের মূল্য নিরূপণে তাঁহারা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে আপনাদিগের সংস্কৃতি ও ব্যবহার মানদণ্ডরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, অথচ হিন্দুকে প্রথমতঃ স্বীয় ধর্ম্মেই সত্য ও নীতি অন্বেষণ করিতে হয়। অতএব বিদেশী ও বিধর্ম্মীর গবেষণা মূল্যবান হইলেও নির্বিচারে তাঁহার সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারি না। দৃষ্টিভঙ্গী ভিন্ন, সুতরাং সিদ্ধান্তে অনৈক্য বিচিত্র নহে। আর হিন্দুমাত্রেরই নিজ ধর্ম্মের মূল্য নির্দ্ধারণে সুস্পষ্ট অধিকার আছে,

যদিও তাহা পূর্ব্বকালে সম্মানিত হয় নাই। যাহা হউক, সেই অধিকারের বলে, পূর্ব্বোক্ত সমালোচনার বিরুদ্ধে কয়েকটি আপত্তি উত্থাপন করিব।

সমালোচকের মতে,—বৈদিক যুগে স্তোত্রের রচনা ও আবৃত্তিতে ধর্ম্মাচরণ পর্য্যবসিত ছিল; পরে ব্রাহ্মণজাতি স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাহার সহিত ক্রিয়াকলাপ যোগ করায় যজ্ঞের প্রবর্ত্তন হয়। কিন্তু প্রথম ঋকেই বলা হইয়াছে, অগ্নি যজ্ঞের পুরোহিত, যজ্ঞে তিনি সমধিক তেজস্বী হন ও তাঁহার আশ্রয়ে যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়। আমরা একটিমাত্র উদাহরণ দিয়া ক্ষান্ত হইলাম, কারণ ঋক্ সংহিতার প্রায় সর্ব্বত্রই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যজ্ঞের উল্লেখ আছে। বস্তুতঃ ধর্ম্মের প্রাচীন ইতিহাসে দেবতার মহিমাকীর্ত্তন, তাঁহাকে প্রণতি ও প্রিয় বস্তু প্রদান সংযুক্ত, অর্থাৎ পুরাকালে আর্য্য ও অনার্য্য এই ত্রিবিধ উপায়েই তাঁহার তুষ্টিসাধন করিতেন। প্রাচীন ভারতবর্ষে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াছিল কি? কোন্ যুক্তিবলে সিদ্ধান্তটি প্রতিপন্ন হয়?

যুক্তি এইমাত্র,—ঋগ্বেদে যজ্ঞের বিভাগ ও বর্ণনা নাই, উল্লেখ আছে মাত্র; সুতরাং অভাবপূরণ কিংবা দুঃখমোচনের জন্য প্রার্থনা ও স্তুতিবাদ বৈদিক যুগে প্রকৃত ধর্ম্মাচরণ ছিল; নতি ও কিঞ্চিৎ উপহার প্রদান তাহার স্বাভাবিক অনুষঙ্গ, আর তাহাকেই মন্ত্ররচয়িতা যজ্ঞ বলিয়াছেন; কিন্তু যজ্ঞের অর্থ বিশিষ্ট ও কষ্টসাধ্য ক্রিয়াকলাপ; তাহার প্রচলন অনুন্নত সমাজে সম্ভবপর নহে; অতএব আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মের উদ্ভব বৈদিক যুগে হয় নাই।

কিন্তু যজুর্ব্বেদে যজ্ঞে প্রযোজ্য মন্ত্র ও যজ্ঞ সম্পাদনের বিধি

উভয়ই সন্নিবিষ্ট। এই সকল বিধান অনুসারে অধিকাংশ যজ্ঞই নিষ্পন্ন হইত, যদিও যজ্ঞের সম্পূর্ণতা ও শোভার জন্য যাজক ঋকের স্তোত্র ও সামের গীতি যজুর্ব্বেদীয় মন্ত্রের সহিত ব্যবহার করিতেন। বস্তুতঃ যজুর্ব্বেদের নির্দ্দেশ ব্যতীত কোন যজ্ঞের ভিত্তিস্থাপন হইত না, আর প্রায় সকল মূল বা 'প্রকৃতি' যাগই যজুর্ব্বেদীয় ছিল; অন্য বেদের শাসন 'বিকৃতি' যজ্ঞের ব্যবস্থায় দেখা যায় আর সেই শাসনও আংশিক। সুতরাং সায়ণাচার্য্য সত্যই বলিয়াছেন,—যজুর্ব্বেদ যজ্ঞদেহ গঠন করেন, ঋগ্বেদ বিবিধ ভাবগর্ভ মন্ত্রে সেই দেহ বিভূষিত করেন ও তাহাদিগের কয়েকটি সামগানরূপে গীত হওয়ায় মণিমুক্তাখচিত অলঙ্কারের মত শোভা পায়। অতএব যজুর্ব্বেদেই ভারতীয় আর্য্যধর্ম্মের মূল অন্বেষণ করা সঙ্গত।

তথাপি পরবর্ত্তী শাস্ত্রসমূহে ঋগ্বেদ মুখ্য স্থান অধিকার করিয়াছে, আর প্রতীচ্য সমালোচক ইহাতেই হিন্দুধর্ম্মের আদিরূপ সন্ধান করিয়াছেন। এই পক্ষপাত বিস্ময়কর নহে। ঋগ্বেদ পদ্যময়, আর পদ্যেই ভাবতরঙ্গের পূর্ণ অভিব্যক্তি হয়। ধর্ম্মে মর্ম্মোচ্ছ্বাসের স্থান গৌণ নহে, সুতরাং ঋগ্বেদের আবেগপূর্ণ স্তুতিগুলি ধার্ম্মিকের মনোভাব প্রকাশের পক্ষে উপযুক্ত। বস্তুতঃ ভাব ও ভাষার সম্পদে আর ছন্দের লালিত্যে ইহা প্রাচ্য ও প্রতীচ্য পণ্ডিতগণকে মুগ্ধ করিয়াছে। সামবেদ ইহার প্রকৃত প্রতিদ্বন্দ্বী নহে, কারণ সাম ঋকের আশ্রিত, ইহারই মন্ত্রগুলি সুরযোগে গানে পরিণত করিয়াছে। পরন্তু যজুর্ব্বেদ গদ্যে রচিত আর গদ্য পদ্যের মত চিত্তাকর্ষক না হইলেও বিধান প্রবর্ত্তনের বিশেষ উপযোগী। সুতরাং যজুর্ব্বেদে মন্ত্র ও বিধি উভয়ই আছে, অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ যজ্ঞের রূপ ইহাতেই পাওয়া যায়। কিন্তু যাঁহারা যজ্ঞে শ্রদ্ধালু নহেন, তাঁহাদের

পক্ষে যজ্ঞ সম্পাদনের বিধান অত্যন্ত নীরস আর গদ্যময় মন্ত্র কবিতাবলীর মত প্রীতিপ্রদ নহে।

সুতরাং প্রতীচ্য পণ্ডিত দুই প্রকারে বিভ্রান্ত হন। উৎকৃষ্ট কবিতারও পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ অজ্ঞাত থাকিতে সম্যক্ গুণগ্রহণ হয় না, আর যজ্ঞেই ঋঙ্‌মন্ত্রের পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ আছে। ফলে, তিনি ঋঙ্‌মন্ত্রগুলির সমুচিত আদর করিতে অক্ষম হন, তাহাদিগকে অসম্বদ্ধ ও অত্যুক্তিপূর্ণ মনে করেন। দ্বিতীয়তঃ যজ্ঞের স্বরূপ উপলব্ধি না করায় যজনীয় সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা অস্পষ্ট ও অনিশ্চিত হয়। একটি প্রাচীন কথা আছে, যজ্ঞের জন্যই বেদের প্রবর্ত্তন হইয়াছিল, আর গীতাও ইহার উল্লেখ করিয়াছেন(১)। সুতরাং যজ্ঞের তাৎপর্য্য সাবধানে পরীক্ষা না করিলে প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মের আকার পরিস্ফুট হয় না। সমালোচক বলেন, ঋগ্বেদীয় মন্ত্রগুলি প্রাচীনতর হিন্দুধর্ম্মের সম্বল ছিল, পরে অনাবশ্যক অনুষ্ঠানাদি যোগ করা হয়। কিন্তু ব্যাসের সঙ্কলনের বহুপূর্ব্বে কি ছিল, বা ছিল না তাহা কল্পনার বিষয়, আর কল্পনা করিতে হইলেও স্মরণ রাখা উচিত যে ঋগ্বেদের মার্জ্জিত ভাষা ও পদবিন্যাস সম্ভবতঃ যজুর্ব্বেদের সরল, অলঙ্কারবর্জ্জিত রচনাপদ্ধতির পরবর্ত্তী। যজুর্ব্বেদীয় যজ্ঞে ঋঙ্‌মন্ত্রের প্রয়োগ আছে, স্বীকার করি; কিন্তু যজ্ঞের আকার যে পূর্ব্বাপর একই ছিল তাহা বলি না। সায়ণাচার্য্যের উক্তি ক্রমবিকাশের সপক্ষে; অর্থাৎ যজ্ঞ প্রথমে অপেক্ষাকৃত সামান্য অনুষ্ঠান ছিল, পরে ঋঙ্‌মন্ত্র ও সামগান যোগ করায় সমৃদ্ধ হয়, এই অনুমান সমর্থন করে। বস্তুতঃ, সামাজিক ব্যাপার কালক্রমে জটিল হওয়ায় ধর্ম্মে ও কর্ম্মে কৃত্রিম বিভাগ ঘটিয়াছে; পূর্ব্বে প্রাত্যহিক কর্ম্মও যজ্ঞে

(১) গীতা ৩।১০

আরব্ধ হইত ; কিন্তু বর্ত্তমানে ধর্ম্মাচরণ স্তুতিবাদ ও প্রার্থনায় পরিণত হইয়াছে, আর এই অভিনব ব্যবস্থাই সমালোচক প্রাচীন সমাজের নিয়ম বলিয়া প্রচার করিয়াছেন।

শ্রদ্ধা, সংযম ও নিবেদন বৈদিক যজ্ঞের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল। রাজসূয়ের মত ক্রিয়াবহুল যজ্ঞে ও অগ্নিহোত্রের মত বাহুল্যবর্জ্জিত উপাসনায় এই লক্ষণত্রয় দেখি। গীতাও বলিয়াছেন, ইহাদিগের অভাবে সকাম বা নিষ্কাম যজ্ঞ কোনটি সুসম্পন্ন হয় না। কিন্তু যজনীয় কে বা কাহারা? বেদে বহুদেবদেবীর অর্চ্চনা আছে অথচ ঈশ্বরও নানা স্থলে অর্চ্চিত হইয়াছেন। সুতরাং প্রশ্ন হয়,—দেবতা ও ঈশ্বরে সম্বন্ধ কিরূপ? প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য মনীষী মোক্ষমুলার বলিয়াছেন,—আর্য্যগণ বহুদেববাদী হইলেও প্রত্যেক প্রধান দেবতার উপাসনাকালে উপাস্যে তদ্গতচিত্ত হওয়ায় তাঁহাতে সর্ব্বময়ত্ব ও সর্ব্বাধিষ্ঠাতৃত্ব আরোপ করিতেন। কিন্তু ধ্যানের লক্ষণ এইরূপ ; প্রগাঢ় ধ্যানে ধ্যেয় চিত্তকে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করে ; সুতরাং তাহার সীমানির্ণয় সম্ভব হয় না। ভাবাবেশেও চিত্ত সীমা বা সঙ্গতির প্রতি লক্ষ্য রাখে না। পরন্তু অন্য দেবতার অনুরূপ উপাসনায় এই পক্ষপাত কার্য্যতঃ প্রত্যাখ্যাত হইত। সুতরাং ভারতীয় আর্য্যগণ যে একেশ্বরবাদী ছিলেন তাহা চিত্তবৃত্তির উক্ত বৈশিষ্ট্যের উল্লেখে প্রতিপন্ন হয় না। প্রতিপাদনের জন্য আমরা একটি বিখ্যাত যজ্ঞের কিছু পরিচয় দিব, আর তাহাতে দেবতার সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধও পরিস্ফুট হইবে।

বাজপেয় যজ্ঞের আরম্ভ সূর্য্যদেবের উপাসনায়। তাহা সংক্ষেপে এইরূপ :—সহস্ররশ্মি! তুমি ব্রীহিযবাদি অন্নের সৃষ্টিস্থিতিলয়কারী ও বাক্যের অধিপতি ; এই যজ্ঞ সম্পাদনের

জন্য আমাদিগকে প্রচুর খাদ্য দান কর ও আমাদিগের বাক্‌শক্তি পবিত্র মন্ত্র উচ্চারণের উপযুক্ত কর(১)। কিন্তু পরে বলা হইয়াছে, আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত অন্তরে ও বাহিরে যাঁহার অধিষ্ঠান, যিনি পুরাতন, জ্ঞানময়, সর্ব্বাধিপ ও সকলের স্রষ্টা, যিনি অর্য্যমা, বৃহস্পতি, ইন্দ্র, বিষ্ণু এবং অন্নবান সূর্য্যকে আমাদিগের মঙ্গলার্থ সতত নিযুক্ত রাখিয়াছেন, সেই দেবাদিদেব আমাদিগের এই যজ্ঞকে কল্যাণযুক্ত করুন(২)। এই দ্বিবিধ প্রার্থনায় ঈশ্বর কে আর তাঁহার সহিত দেবগণের সম্বন্ধ কিরূপ তাহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। মানবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ বেদ অন্যত্র প্রচার করিয়াছেন। তাহার তাৎপর্য্য এইরূপ :—ঈশ্বর সর্ব্বদর্শী ; ভূলোকে বা দ্যুলোকে তাঁহার মত ঐশ্বর্য্যশালী কেহ নাই, পূর্ব্বে ছিল না, পরেও হইবে না ; তাঁহার প্রসাদে আমরা ভূমিকর্ষণ পূর্ব্বক অন্নোৎপাদনে সমর্থ হই আর দুর্বৃত্তকে অভিভূত করিয়া সাধুগণকে রক্ষা করি ; অতএব সম্পদে ও বিপদে তাঁহাকেই স্মরণ করা উচিত।

তথাপি প্রতিপক্ষ বলিতে পারেন,—যজ্ঞে ঈশ্বরের প্রাধান্য স্বীকৃত হইলেও অন্য দেবতার অর্চ্চনা প্রত্যাখ্যাত হয় নাই, সুতরাং বৈদিক যুগেও ভারতীয় আর্য্যগণ একেশ্বরবাদী ছিলেন না। কিন্তু বেদ বলিয়াছেন, দেবগণ ঐশ নিয়ম অনুসারে ইতর জীবের মঙ্গল সাধন করেন ; অতএব তাঁহাদিগের অর্চ্চনা প্রকারান্তরে ঈশ্বরের অর্চ্চনাই হইত। তথাপি আপত্তি হইতে পারে,—নিত্য ও নৈমিত্তিক দেবপূজায় ব্যাপৃত থাকিলে, অন্তরে আর ঈশ্বরের স্থান থাকে না, কেবল বাক্যে তাঁহার উৎকর্ষ অঙ্গীকৃত হয় ; সুতরাং যাঁহারা দেবপূজায় নিরত ছিলেন, তাঁহাদিগকে ঈশ্বরোপাসক বলা সঙ্গত নহে। কিন্তু বৈদিক

(১) যজুর্ব্বেদ ৯।১ (২) যজুর্ব্বেদ ৯।২৩—২৯, যজুর্ব্বেদ ২৭।৩০—৩৭

যুগের চিন্তাধারা সাবধানে পরীক্ষা করিলে দেখা যায় এবংবিধ অবনতি পরে ঘটিলেও বৈদিক যুগে হয় নাই। যজুর্ব্বেদে প্রধান যজ্ঞগুলির বর্ণনার পরে কয়েকটি অধ্যায়ে বহু মন্ত্রের সন্নিবেশ আছে। ইহাদিগের কতক প্রত্যেক যজ্ঞে ব্যবহৃত হইত; অবশিষ্ট মন্ত্রের যজ্ঞবিশেষে প্রয়োগ ছিল। সুতরাং অনুমান করি,—প্রবর্ত্তিত যজ্ঞানুষ্ঠানের অসম্পূর্ণতা ব্যক্ত হওয়ায় অনতিকাল পরে ইহাদিগের প্রচার হয়। ইহারা খিল মন্ত্র বা পরিশিষ্ট ভাগ বলিয়া খ্যাত, আর এই নামও উক্ত অনুমান সমর্থন করে। অতএব এই মন্ত্রসমূহ হইতে দুইটি মন্ত্র লইয়া বৈদিক যুগে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি কিরূপ ছিল তাহা দেখাইব।

ষড়বিংশ অধ্যায়ের প্রারম্ভে বলা হইয়াছে,—অগ্নি ও পৃথিবী, বায়ু ও আকাশ, সূর্য্য ও জ্যোতির্ম্ময় ঊর্দ্ধলোক, আর বরুণ ও সলিল যেরূপ নিত্যসম্বদ্ধ, পরব্রহ্ম বা ঈশ্বরের সহিত আমার সেইরূপ সম্বন্ধ প্রকট হউক; অর্থাৎ আমি যেন অন্তরে তাঁহার অধিষ্ঠান সতত উপলব্ধি করি। কিন্তু এই ঈশ্বর কিরূপ? বেদের বহুস্থলে তাঁহার বর্ণনা আছে, তথাপি দ্বাত্রিংশ অধ্যায়ে বর্ণনাটি সর্ব্বাপেক্ষা বিশদ ও বিস্তৃত। সুতরাং তাহারই মর্ম্ম নিম্নে দিলাম।

'ঈশ্বর ভূলোক ও দ্যুলোক উভয়ই চিরদিন ধারণ করিয়া আছেন। বস্তুতঃ তাঁহাতেই সমগ্র জগতের আবির্ভাব ও তিরোভাব হয়। সুতরাং তিনি চরাচরের উপাস্য। অগ্নি, মরুৎ, সূর্য্য প্রভৃতি দেবগণ তাঁহার শাসনাধীন। জীবদেহে তিনি বল দিয়াছেন ও আত্মারূপে তাহাতে বিরাজ করিতেছেন। অতএব জ্ঞানী স্বীয় হৃদয়ে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়া চরিতার্থ হন, যদিও জ্ঞানী কিংবা অজ্ঞ সকলেরই তিনি

সর্ব্বভাবে রক্ষক, কারণ তিনি সর্ব্বতোমুখ। কিন্তু জ্ঞানই কেবল সর্ব্বব্যাপী হইতে পারে, সুতরাং তিনি জ্ঞানময় বা জ্ঞানস্বরূপ। সেই জ্ঞানের ছায়ামাত্র পাইলে মানব অমরত্ব লাভ করে, পরন্তু তাহার অভাবে করাল মৃত্যুর অধীন হয়।' সমালোচক হয় ত জিজ্ঞাসা করিবেন,—বৈদিক যুগে ইতর ভদ্র সকলেরই কি এই প্রকার বিশ্বাস ছিল? প্রশ্নটি কঠিন বটে; কিন্তু উত্তরে জানিতে চাহি,—অন্যত্র স্বর্গবাসী ঈশ্বর সম্বন্ধে জনসাধারণের ধারণা কি জ্ঞানবিজ্ঞানসম্মত?

কেহ কেহ বলেন বৈদিক ধর্ম্মাচরণ প্রকৃতির উপাসনা ব্যতীত অন্য কিছু নহে। প্রকৃতির উপাসনা বলিতে বুঝি, বিশ্বে যাহা বিরাট বা সুন্দর, মুগ্ধচিত্তে তাহার স্তুতি কিংবা তাহাকে সচেতন বোধে অর্ঘ্য দান। কিন্তু বৈদিক দেবদেবীর এবংবিধ বর্ণনা প্রমাণসিদ্ধ নহে। অগ্নি প্রত্যহ প্রতিগৃহে পূজিত হইতেন অথচ তাঁহাকে 'বলজাত' বলা হইত, কারণ সবলে অরণিদ্বয় ঘর্ষণ অগ্নি উৎপাদনের সাধারণ পদ্ধতি ছিল। তথাপি আর্য্যগণ কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁহার অর্চ্চনা করিতেন, যেহেতু তাঁহার সহায়তা ব্যতীত যজ্ঞসম্পাদন, এমন কি, নির্ব্বিঘ্নে জীবনধারণ সম্ভব হইত না। কিন্তু তাঁহার অর্চ্চনাকে প্রকৃতির পূজা বলা যায় কি? বস্তুতঃ তাঁহার প্রকাশে মানবের কৃতিত্ব ও প্রকৃতির বশ্যতা খ্যাপিত হইত। প্রকৃতির তিনটি শ্রেষ্ঠ প্রকাশের সহিত ইন্দ্র, বরুণ ও সবিতার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ বটে। কিন্তু বেদে দেখি; বজ্রপাণি ও বর্ষণকারী ইন্দ্রের নিকট কেবল যুদ্ধে জয়লাভ ও প্রচুর অন্ন প্রার্থনা করা হয় নাই, উৎকৃষ্ট ইন্দ্রিয় ও মন আর আধ্যাত্মিক উন্নতি ভিক্ষা করা হইয়াছে। বরুণ মর্ত্ত্যে ও অন্তরীক্ষে জলরাশি স্থাপন করিয়াছেন বলিয়া মন্ত্ররচয়িতা ক্ষান্ত হন নাই; তাঁহাকে ধর্ম্মরাজ্যের অধিপতি

বলা হইয়াছে। সবিতা যে মানবকে শস্য উৎপাদনে সাহায্য করেন তাহা সুস্পষ্ট ; কিন্তু বেদ বলিয়াছেন বাক্‌শক্তির উন্নতিও তাঁহার অনুগ্রহে হয়। প্রকৃতির পূজায় অধিষ্ঠান ও অধিষ্ঠাতায় সন্নিপাত থাকিবার কথা ; কিন্তু বেদে তাহা দেখি না, কারণ অন্যান্য দেবতাও এইরূপে অধিষ্ঠানের সীমা অতিক্রম করিয়া বিবিধ কল্যাণকর কর্ম্মে নিযুক্ত হইতেন। সুতরাং অনুমান করি, এই সকল দেবদেবী প্রকৃতির বিকাশ নহেন, ঈশ্বরেরই বিশেষিত প্রকাশ, আর সেই জন্য প্রাচীন আর্য্যগণ ঈশ্বরবাদ ও দেবার্চ্চনায় বিরোধ কল্পনা করেন নাই।

কিন্তু বর্ত্তমান যুগ অনুষ্ঠানের পক্ষপাতী নহে, যদিও পূর্ব্বে কখন জীবন এরূপ কর্ম্মময় ছিল না। এই অসঙ্গতির সপক্ষে বলা হয়,—ভগবৎচিন্তার জন্য শুদ্ধ, শান্ত চিত্ত আবশ্যক, অথচ ক্রিয়াকলাপ ও উপচারের ব্যবস্থা চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করে। কিন্তু চিত্ত স্বভাবতঃ চঞ্চল আর অপ্রত্যক্ষ বিষয়ে তাহাকে নিবিষ্ট রাখা অত্যন্ত কঠিন। সুতরাং যজ্ঞ অস্থির চিত্তের অবলম্বনস্বরূপ হইতে পারে, কারণ তাহার প্রত্যেক ব্যাপার উপাস্যকে স্মরণ করাইয়া দেয়। গীতা ক্রিয়াবহুল যজ্ঞের নিন্দা করিয়াছেন সত্য। কিন্তু তাহা প্রকৃতপক্ষে ক্রিয়ার নিন্দা নহে, ক্রিয়ার পশ্চাতে যে কামনার প্ররোচনা থাকে তাহারই অপবাদ। কর্ম্মযোগ যে শাস্ত্রের মুখ্য উপদেশ, ক্রিয়া তাহার বিচারে হেয় হইতে পারে না। যজ্ঞের আর একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিতে হইবে। তাহা সকাম হইলেও, দেবতার প্রসাদে কামনা পূর্ণ হইবে, এই ধারণা থাকায়—যাজ্ঞিক অন্যায় আচরণ যথাসম্ভব ত্যাগ করিতেন, পরন্তু প্রয়োজনীয় কর্ম্মে নিরুদ্যম হইতেন না।

গীতা দেবার্চ্চনাকে শ্রেষ্ঠ স্থান দেন নাই, কারণ তাহার

র্মলে মুক্তিলাভ হয় না; কিন্তু ইহাও বলিয়াছেন যে কদাচ কেহ মুক্তির জন্য সাধনা করে, অথচ সাত্বিক ব্যক্তিমাত্রেরই দেবার্চ্চনায় প্রবৃত্তি হয়। সুতরাং বেদে সকাম যজ্ঞের উপদেশ ব্যর্থ হয় নাই। পরন্তু এই উপদেশও যজুর্ব্বেদের শেষ বাণী নহে, কারণ বলা হইয়াছে:—শান্তিকামী ও ধীমান দেবদত্ত সুখৈশ্বর্য্য ভোগের পরে উপলব্ধি করেন ভোগে প্রকৃত শান্তি নাই, সুতরাং স্বর্গসুখেও বীতস্পৃহ হইয়া বিশ্বস্রষ্টা পরমাত্মার সহিত আপনার যোগ অনুভব করিতে যত্নবান হন, আর এই প্রচেষ্টা সফল হইলে তাঁহার কোন অভাব বা আকাঙ্ক্ষা থাকে না, তিনি ব্রহ্মই হন; অতএব ব্রহ্মাভিমুখ বুদ্ধিই শ্রেষ্ঠ সম্পদ, যাজ্ঞিকেরও অবশেষে তাহা একান্ত প্রার্থনীয়। বেদ যোগ্য পাত্রের জন্য এই প্রকার উপদেশ দিয়াছেন; সুতরাং কর্ম্মকাণ্ডে সকাম যজ্ঞের বিস্তৃত বর্ণনা থাকিলেও নিঃশ্রেয়সের উপাদেয়ত্ব উপেক্ষিত হয় নাই(১)।

পাশ্চাত্য চিন্তাধারা যাঁহাদিগের চিত্তকে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়াছে, তাঁহারা বলেন, দেবতা নাই আর থাকিলেও তাঁহাদিগের উপাসনা অনাবশ্যক, হয় ত ক্ষতিকর। কিন্তু এই দিগন্তপ্রসারিত বিশ্বে মানব অপেক্ষা যে উন্নততর জীব নাই, তাহার প্রমাণ কি? দ্যুলোক বা অন্তরীক্ষ বা জলধিগর্ভ মানবের অবস্থানযোগ্য নহে, এই পর্য্যন্ত বলা যায়। কিন্তু পঞ্চভূতের অন্য প্রকার সংঘাত যে বুদ্ধিপ্রমুখ করণবর্গের উৎকৃষ্ট আধার হইতে পারে না, তাহার প্রমাণ কোথায়? বস্তুতঃ সীমাহীন জগতে মাত্র একটি ক্ষুদ্র গ্রহ শ্রেষ্ঠ জীবের বাসস্থান হইয়াছে, অথচ অগণিত সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহ ইহাতে

(১) যজুর্ব্বেদ ৩২

বিদ্যমান,—এই অভিমত গ্রহণ করা কিছু কঠিন। এমন কি, পৃথিবীতে যে মানবচক্ষুর অগোচর অথচ মানব অপেক্ষা মহত্তর জীব নাই, তাহা কে প্রতিপন্ন করিতে পারে? পিপীলিকার মধ্যে দার্শনিক থাকিলে বলিত পিপীলিকা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জীব মর্ত্ত্যে নাই, অন্য সকলই অচেতন পদার্থের সংঘাত, কারণ অন্য জীবের ব্যবহার তাহার বোধগম্য নহে, রূপও তাহার দৃষ্টিশক্তির অতীত। দেবতায় অবিশ্বাসী এই প্রকার ন্যায় আশ্রয় করেন কি? বিশুদ্ধ বিজ্ঞান এ বিষয়ে নীরব, কারণ প্রত্যক্ষ তাহার অবলম্বন হইলেও, প্রৌঢ়িবাদ তাহার প্রথা নহে।

তথাপি প্রতিবাদী বলেন, যাহা প্রমাণসিদ্ধ নহে, তাহার অর্চ্চনায় লাভ নাই। কিন্তু বৈজ্ঞানিক আবশ্যকমত তথ্য অতিক্রম করিয়া যাহা অপ্রত্যক্ষ অথচ সম্ভব তাহাতে আস্থা স্থাপন করেন, আর এইরূপে জ্ঞানের প্রসার হয়। আমরা মহত্তর মানবকে শ্রদ্ধা করি, তাঁহার প্রসাদ ভিক্ষা করি। ফলে তিনি সাহায্য না করিলেও আমাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়। কিন্তু আর একটি আপত্তি রহিয়া যায়। অনেকে মনে করেন, কল্পিত দেবতার অনুগ্রহ ভিক্ষা অপেক্ষা ঈশ্বরের আরাধনা যুক্তিযুক্ত ও আশুফলপ্রদ। কিন্তু ঈশ্বরের যোগ্য ধারণা সকলের পক্ষে সহসা সম্ভব নহে, কারণ তাহার জন্য শুদ্ধ ও শান্ত চিত্ত আবশ্যক। সুতরাং যজ্ঞের বর্ণনায় প্রথমে ঈশ্বরের উপাসনা প্রায় নাই, মধ্যে কিংবা শেষে তাঁহার মহিমা প্রচার করা হইয়াছে। বস্তুতঃ তথাকথিত একেশ্বরবাদী যখন বিজয়ের জন্য প্রার্থনা করেন তখন ইন্দ্রই তাঁহার উপাস্য হন, যখন প্রাচুর্য্য কামনা করেন সবিতাকে তাঁহার নতি হয়, যখন পাপমোচনের জন্য আবেদন করেন তাঁহার দৃষ্টি ধর্ম্মরাজের প্রতি থাকে। চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বর সম্বন্ধে শুদ্ধ জ্ঞান অর্থাৎ

যোগে তাঁহার উপলব্ধি তাঁহার নিকট একমাত্র প্রার্থনীয়। এই প্রার্থনা সার্থক হইলে নিঃশ্রেয়স বা পরমা শান্তি লাভ হয়—শ্রুতির ইহাই অভিমত। আর গীতাও ফলে তারতম্য লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, দেবতার উপাসনা অনিত্য সুখসমৃদ্ধি ভোগের উপায় বটে, কিন্তু নিত্য নিরাময় ভাব আয়ত্ত করিবার জন্য ঈশ্বরের আরাধনা প্রয়োজন(১)।

ঋগ্বেদে ঈশ্বর—জ্ঞানের ক্রমবিকাশ

যজুর্ব্বেদের নির্দ্দেশমত ঈশ্বরের বর্ণনা দিলাম। ঋগ্বেদের কয়েকটি সূক্তে এই পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানের ক্রমবিকাশ দেখি। দেবগণ স্তুতি ও উপহারে আপ্যায়িত হইলে স্ব স্ব সামর্থ্য ও অধিকার অনুসারে মানবের মঙ্গল করেন, এই বিশ্বাস, বোধ হয়, প্রথমে ছিল, কারণ বহু সূক্তে তাঁহাদিগের বৈশিষ্ট্য স্মরণ রাখিয়া যজ্ঞভাগ গ্রহনার্থ তাঁহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ আহ্বান করা হইয়াছে। কিন্তু অন্যান্য সূক্তে অধিকারের এই সঙ্কীর্ণতা যে নাই, তাহা ইন্দ্র, বরুণ ও সবিতার বর্ণনায় সুস্পষ্ট। পরে ব্যক্তিত্বের বেষ্টনরেখাও অতিক্রান্ত হয়। দ্বিতীয় মণ্ডলের প্রথম সূক্তে অগ্নির উপাসনায় বলা হইয়াছে,—তুমি ইন্দ্র, তুমি বিষ্ণু, তুমি ব্রহ্মা, নানাপ্রকার বুদ্ধিতে তোমার অধিষ্ঠান, সনাতন নীতির তুমিই রক্ষক সুতরাং তুমি বরুণ, সীমাহীন আকাশের তুমি বলস্বরূপ, তোমার তেজ সকলের কল্যাণকর অতএব তুমি মিত্র ও ত্বষ্টা। কিন্তু এই সূক্ত প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য মতবাদের সমর্থক নহে, যেহেতু স্তাবক ভাবাবেশে বা ধ্যানের একাগ্রতায় অন্য দেবগণকে বিস্মৃত হন নাই।

সংমিশ্রণের যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা আমরা তৃতীয় মণ্ডলের পঞ্চোত্তর পঞ্চাশত্তম সূক্তে পাই। ইহাতে সূর্য্য, অগ্নি, অহোরাত্র, দ্যাবাপৃথিবী, ইন্দ্র ও ত্বষ্টা স্তুত হইয়াছেন। কিন্তু

(১) গীতা ৭।২৩, ৯।২৪, ২৫

বিভিন্ন দেবতার প্রশস্তি থাকিলেও, প্রতি ঋকের শেষে বলা হইয়াছে, তাঁহাদিগের শক্তি একই মহাশক্তির বিচিত্র বিকাশ। দশম মণ্ডলের একত্রিংশত্তম সূক্তে ঈশ্বরের উল্লেখ আরও স্পষ্ট। ঋষি সকল দেবতাকেই তাঁহার যজ্ঞে আহ্বান করিয়াছেন, যেহেতু নানাবিধ মঙ্গল তাঁহার কাম্য। কিন্তু পরে দেবনরের সমভাবে আশ্রয় এই বিশ্বের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। তিনি দেখেন, সকলই কালবশে জীর্ণ ও নষ্ট হয়, কিন্তু দ্যুলোক ও ভূলোক কালকে জয় করিয়া বিদ্যমান আছে। সুতরাং তাঁহার স্থির সিদ্ধান্ত হয়,—যিনি ইহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি নিত্য পুরুষ, তাঁহার প্রভাবে ইহারা চিরস্থির ও নিত্যসম্বদ্ধ, আর তিনিই জন্মমরণশীল জীবনিচয়ের স্রষ্টা, কোন দেবতা তাহা নহে। কিন্তু সৃষ্টির প্রণালী সম্বন্ধে, বর্ণনার পরিবর্ত্তে ঋষি দুইটি প্রশ্ন করিয়াছেন,—বিশ্ব নির্ম্মাণের জন্য উপাদান কোথা হইতে আসিল, আর ঈশ্বরের শক্তিই বা কিরূপ যে উপাদান ব্যতিরেকে তিনি এই বিরাট বিশ্ব গঠন করিয়াছেন? বস্তুতঃ ব্যবহারে এবংবিধ শক্তির দৃষ্টান্ত নাই।

পরে একাশীতিতম ও দ্ব্যশীতিতম সূক্তে, ঈশ্বরের বর্ণনা হৃদয়গ্রাহী হইলেও সৃষ্টিরহস্য রহস্যই আছে। ঈশ্বর জীবের শ্রষ্টা ও বিধাতা, তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিধ কল্যাণের আকর; বস্তুতঃ তিনি সর্ব্ব, যদিও বিবিধ দেবরূপে তাঁহার পরিচয় হয়। পণ্ডিতগণ বলেন, তিনি সপ্তর্ষিমণ্ডলের ঊর্দ্ধে একাকী চিরস্থির প্রদেশে বিরাজ করিতেছেন। কিন্তু সৃষ্টিকালে তাঁহার অধিষ্ঠান কি ছিল, কোন্ উপাদান তিনি ব্যবহার করিয়াছিলেন আর বিশ্ব ধারণ করিয়া তিনি কোথায় এখন অবস্থিত? ঋষি বলিয়াছেন, এই সকল প্রশ্নের সদুত্তর দিবার মত বুদ্ধি মানবকে দেওয়া হয় নাই; সুতরাং জিজ্ঞাসুর গবেষণা জল্পনাকল্পনায় পর্য্যবসিত হয়।

আরও পরে দেখি, সৃষ্টির পূর্ব্বে কি ছিল তাহা অনুমান করা হইয়াছে, কিন্তু সৃষ্টির কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা ঋষি দিতে পারেন নাই(১)। সূক্তের মর্ম্ম এইরূপ:—তৎকালে দিক্‌দেশ বা সর্ব্বাধার আকাশ ছিল না, দিবারাত্রি বা কালের গতি ছিল না, সুতরাং মৃত্যু বা অমরত্ব ছিল না, কেবল চরমতত্ত্ব স্বস্থ বা অদ্বয়ভাবে ছিলেন। কিন্তু এই নির্ব্বিশেষ হইতে বিশ্বের সংখ্যাতীত বৈচিত্র্য কেন বা কিরূপে উদ্ভূত হইল? মেধাবিগণ স্বীয় চিত্তের গতি লক্ষ্য করিয়া বলেন, ঐশমনে কামনার উদ্রেক হওয়ায় নানাত্বের উদ্ভব হইয়াছে। কিন্তু চরমতত্ত্বের নিরপেক্ষতায় মনের অর্থাৎ সঙ্কল্পবিকল্পের স্থান কোথায়? সুতরাং অবিদ্যমান বস্তুকে তাঁহারা বিদ্যমান জগতের কারণরূপে প্রচার করেন। বস্তুতঃ সৃষ্টিতত্ত্ব চিরকালই অপরিজ্ঞাত থাকিবে।

সংহিতা দেবগণের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও সংশয়ের অবকাশ দিয়াছেন। অষ্টম মণ্ডলের শততম সূক্তে নেম ঋষি বলিয়াছেন, ইন্দ্র নাই যেহেতু কেহ তাঁহাকে দেখে নাই, সুতরাং তাঁহার অর্চ্চনা বৃথা। কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই তিনি উপলব্ধি করেন যে ইন্দ্রের মহিমা সর্ব্বত্র প্রকট, অর্থাৎ কার্য্য হইতে কারণ অনুমিত হইল। দশম মণ্ডলের চতুর্দ্দশাধিক শততম সূক্তে বলা হইয়াছে, পক্ষী প্রকৃতপক্ষে একই, যদিও মেধাবিগণ কল্পনা করেন তিনি বহু ও বিবিধ। অথচ এই সূক্তে বিশ্বদেব আহূত হইয়াছেন। সুতরাং তাৎপর্য্য এই,— দেবগণের প্রকৃত স্বাতন্ত্র্য নাই, ঈশ্বরের সত্তায় তাঁহারা সত্তাবান, অর্থাৎ ঈশ্বরই নানারূপে প্রতীয়মান হন। প্রথম মণ্ডলের চতুঃষষ্ট্যধিক শততম সূক্তে অনুরূপ

(১) ঋগ্বেদ, মণ্ডল ১০, সূক্ত ১২৯

সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা হইয়াছে, আর ইহাতেও বিশ্বদেব স্তুত। অতএব ঋগ্বেদের শেষ উপদেশ এই,—দেবতা উপাস্য হইলেও মানবের মতই তাঁহার অস্তিত্ব আপেক্ষিত ও অনিত্য, অর্থাৎ তাঁহার ধারণায় চরমতত্ত্বের সন্ধান পরিসমাপ্ত হয় না।

এই সকল আলোচনা কি শিশুর কাকলীর মত। দার্শনিক পরিভাষার ব্যবহার যদি উন্নত চিন্তার একমাত্র নিদর্শন হয়, তাহা হইলে তত্ত্ব সম্বন্ধে বেদের উক্তি বালোচিত মনে হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য গবেষণায় এবংবিধ স্বাধীন চিন্তা ও সত্যের অকপট প্রকাশ অথচ আস্তিকবুদ্ধি বিরল। কেহ কেহ বলেন আলোচিত সূক্তগুলি পরে রচিত। পৌর্ব্বাপর্য্যের বিচার পণ্ডিতগণ করিবেন; আমরা হিন্দুধর্ম্মের মূল অন্বেষণ করিতেছি, আর ব্যাসের সংকলনে যাহা আছে, তাহার কোন অংশ অপ্রাচীন বোধে আমরা পরিহার করিতে পারি না, কারণ উক্ত সংকলনই হিন্দুর বেদ বা আদি ধর্ম্মগ্রন্থ। কোন কোন মনীষীর মতে, এই সকল সূক্তে অজ্ঞেয়বাদ প্রকারান্তরে প্রচারিত হইয়াছে, সুতরাং ইহারা ধর্ম্মের ভিত্তি নহে। কিন্তু গীতার ঈশ্বরবাদ প্রসিদ্ধ, অথচ গীতা বলিয়াছেন, 'বিচারের পথে ঈশ্বর সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান হয় না, তাঁহার প্রভাবও অবিদিত থাকে(১)।

হিন্দুধর্ম্মের পরিচয় সম্পূর্ণ বেদে

তথাপি দেশে ও বিদেশে অনেকে বলেন, অল্পসংখ্যক সূক্তে ঈশ্বরের উল্লেখ আছে, পরন্তু বহু সূক্তে দেবগণ অর্চ্চিত হইয়াছেন, সুতরাং ধর্ম্ম সম্বন্ধে সংহিতার নির্দ্দেশ অনিশ্চিত। কিন্তু প্রাচীন প্রবাদ অনুসারে সংহিতা সম্পূর্ণ বেদ নহে; ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষৎ বেদের অন্তর্গত। ব্রাহ্মণে মন্ত্রের

(১) গীতা ১৮।৫৪, ৫৫

অর্থ ও যজ্ঞে তাহার প্রয়োগ সম্বন্ধে উপদেশ আছে, অতএব তাহাকে সংহিতার ভাষ্য বা অনুষঙ্গ বলা যায়। কিন্তু আরণ্যক উপনিষদের ভূমিকার মত, আর উপনিষদে আত্মতত্ত্বই বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। সুতরাং সংহিতা ও উপনিষৎ একত্র লইলে প্রাচীন আর্য্যধর্ম্মের পরিচয় সম্পূর্ণ হয়। সংহিতা যজ্ঞনামক প্রসিদ্ধ কর্ম্মে প্ররোচিত করিয়াছেন, আর উপনিষদে চরম যজনীয় সম্বন্ধে বিচার আছে। কর্ম্মে প্রবৃত্তি ও জ্ঞানের অনুশীলন যে এক নহে তাহা স্বীকার করি; কিন্তু তাহারা পরস্পরবিরুদ্ধ নহে, বরং তাহাদের সমন্বয় পূর্ণতালাভের প্রকৃষ্ট উপায়। অতএব সুধিসমাজ সমগ্র বেদকে কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডে বিভক্ত করিয়াছেন, অর্থাৎ ইহাদিগের উপদেশে অসমাধেয় বিরোধ কল্পনা করেন নাই। গীতার মতেও কর্ম্মযোগ ও জ্ঞাননিষ্ঠায় একান্ত পার্থক্য নাই, আর সেইজন্য অর্জ্জুনকে কর্ম্মে প্রণোদিত করিলেও জ্ঞানলাভের জন্য তত্ত্বদর্শীর নিকট উপদেশ লইতে বলা হইয়াছে(১)।

বেদ ও গীতা

বস্তুতঃ কেবল সংহিতায় কিংবা কেবল উপনিষদে হিন্দুধর্ম্মের মূল অন্বেষণ করিলে ধারণা একদেশিক হয়। সংহিতা বহির্জগতে উপাস্যের সন্ধান লইয়াছেন; সুতরাং বিবিধ শক্তি ও সম্পদের বিভিন্ন অধিকারী প্রথমে অনুমিত হইয়াছে। পরে যাবতীয় বিষয় ও বিষয়ীর স্রষ্টা কে?—এই প্রশ্নের উত্তরে সংহিতা একেশ্বরবাদ প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু সৃষ্টিতত্ত্ব ও স্রষ্টার স্বরূপ বহির্জগতে সুস্পষ্ট নহে, যেহেতু বহির্জগৎ বিচিত্র বিষয়ের সমাবেশ ও বিশেষিত কারণকার্য্যের প্রবাহ। সুতরাং উপনিষদে দৃষ্টি অন্তর্মুখ হয়, ও তাহার ফলে ঋষি আত্মা সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট জ্ঞানলাভ করেন। আত্মা এক ও অদ্বয় অতএব পূর্ণ।

(১) গীতা ৪।৩৪

তাবৎ বিষয় আত্মাতে সত্তা লাভ করে কারণ তাহারা স্বরূপে বোধমাত্র ও সর্ব্বাবস্থায় আত্মপ্রত্যয়ের সহিত যুক্ত। সুতরাং সৃষ্টি প্রকৃতপক্ষে বিসৃষ্টি অর্থাৎ পরমতত্ত্বের স্বাভাবিক ও সীমাহীন বিকাশ। কিন্তু যাঁহারা এই বিকাশ উপেক্ষা করিয়া শুদ্ধ আত্মভাবে সমাহিত হন, তাঁহারা সৃষ্টির কোন সঙ্গত বা সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দিতে পারেন না। আত্মাই ঈশ্বর সত্য, কিন্তু ঈশ্বরের সম্পদ্ সংহিতায় বর্ণিত হইয়াছে আর উপনিষৎ তাঁহার স্বরূপ সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন। সুতরাং অদ্বৈতবাদ যে হিন্দুধর্ম্মের ভিত্তিস্বরূপ, তাহা সমগ্র বেদ লইলে প্রতিপন্ন হয়। গীতাও বলিয়াছেন, ঈশ্বর বেদ্য ও বেত্তা উভয়ই, আর শুদ্ধ চৈতন্য তাঁহার পরম পদ হইলেও তিনি অনন্তরূপে বিশ্বে পরিব্যাপ্ত(১)।

বস্তুতঃ বেদে দ্বিবিধ ধর্ম্ম প্রচারিত হয় নাই, যদিও বেদের আরম্ভ দেবতার পূজায় আর সমাপ্তি ঈশ্বর চিন্তায়। এই ক্রমান্বয়ও নিরর্থক নহে, কারণ কামনা প্রবল থাকিতে ঈশ্বরের প্রকৃত অর্চ্চনা অসম্ভব, যদিও ঈশ্বর শব্দটি উচ্চারণ ও তাহার সহিত কতিপয় গুণবাচক শব্দ যোগ করিতে বালকও সক্ষম। গীতা বলিয়াছেন, নিয়ত পুণ্যাচরণ করিলে অন্তরের মলিনতা দূর হয়, আর তখন সাধক অবিচলিত চিত্তে ঈশ্বরের আরাধনা করিতে পারেন(২)। সুতরাং ঈশ্বর চরম লক্ষ্য হইলেও ধর্ম্মের পথে বৈদিক যজ্ঞ বা দেবার্চ্চনার একটি সঙ্গত স্থান আছে।

সমালোচনায় যাহা অমূলক তাহার প্রতিবাদ করিলাম। কিন্তু যাহা সারবান তাহা সাদরে গ্রহণ করিব। বৈদিক যজ্ঞগুলি ক্রিয়াবহুল বটে; আর রাজন্যবর্গ যে সকল যজ্ঞে ব্রতী হইতেন, তাহাদের বর্ণনায় অনাবশ্যক আড়ম্বর ব্যতীত দুর্নীতি

(১) গীতা ১১।৩৮ (২) গীতা ৭।২৮

ও কুরুচির প্রমাণ পাই। ধন দাও, শত্রু নিধন কর, শত্রুর বিভব আমাদের হউক, দেবতার নিকট এই প্রকার প্রার্থনা সাধারণ ছিল আর তাঁহার তোষনার্থ মদ্য ও মাংসের বিরাট আয়োজন করা হইত। বৈদিক যুগে সামাজিক অবস্থা ও যুদ্ধব্যবসায়ী ক্ষত্রিয়গণের আচার ব্যবহার নৈতিক উন্নতির প্রতিকূল ছিল, বোধ হয়। তৎকালে আর্য্য উপনিবেশগুলি শত্রু কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত, শত্রুও আর্য্যজাতির ও আর্য্যধর্ম্মের উচ্ছেদার্থ বদ্ধপরিকর। সুতরাং যাহারা নিয়ত যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিত, তাহাদিগের চিত্তে হিতাহিতবোধ, সংযমে রুচি, সরলতা ও দাক্ষিণ্য পরিপুষ্ট হয় নাই। কিন্তু যজ্ঞানুষ্ঠানে দুর্ম্মতি ও অনাচার স্থান পাইল কেন? প্রাচীন রীতিনীতি সহসা পরিবর্ত্তিত হয় না, স্বীকার করি। কিন্তু চরিত্রগঠনে ধর্ম্মের মহিমা প্রকট হয়। সুতরাং মন্দকে প্রশ্রয় দেওয়ায় বেদে উৎকৃষ্ট জ্ঞান ও নিকৃষ্ট নীতির অপবিত্র সংযোগ ঘটিয়াছিল। আর তাহার ফলে কালক্রমে প্রধান বৈদিক যজ্ঞগুলি পরিত্যক্ত হয়, এমন কি, যজ্ঞানুষ্ঠানে হিন্দুর বিতৃষ্ণা জন্মে। ইহা পরিতাপের বিষয়, কারণ যজ্ঞ সুনিয়ন্ত্রিত হইলে শ্রদ্ধা, সংযম ও ত্যাগবুদ্ধি দৃঢ় করে। গীতার এ বিষয়ে উক্তি স্মরণীয়(১)।

কিন্তু সংহিতা অনাচারের প্রতি সর্ব্বত্র দুর্ব্বলোচিত উপেক্ষা প্রদর্শন করেন নাই। কোন কোন স্থলে মৃদু ভর্ৎসনা কিংবা প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে। আর রাজসূয় যজ্ঞের বর্ণনায় প্রজাপালনের যে আদর্শ আমরা পাই, তাহা চিরস্মরণীয়। অভিষেকের পরে নব নৃপতিকে অধ্বর্য্যু বলিতেন :—হে যজমান, অদ্য হইতে তুমি কুলমর্য্যাদা বা ঐশ্বর্য্যের প্রতি

(১) গীতা ১৮।৫-৯

দৃক্‌পাত না করিয়া সকল প্রজাকে সমভাবে শাসন করিবে, জনসাধারণের মঙ্গলসাধনে সতত তৎপর থাকিবে ও সর্ব্ববিধ উপদ্রব নিবারণে আত্মনিয়োগ করিবে(১)। ইহা উৎকৃষ্ট উপদেশ সন্দেহ নাই ; কিন্তু ধর্ম্মাচরণে ভোগৈশ্বর্য্যে আসক্তি লক্ষ্য করিয়া গীতা যে তীব্র কষাঘাত করিয়াছেন, তাহাও বোধ হয় আবশ্যক ছিল(২)।

যাহা হউক, বেদের আলোচনায় আমরা উভয়সঙ্কটের সম্মুখীন হই। নবীনের পক্ষপাতী পুরাতন ব্যবস্থায় ছিদ্র অন্বেষণ করেন, আর কোথাও তাহার সন্ধান পাইলে, সমগ্র ব্যবস্থাই তাঁহার বিচারে বর্জ্জনীয় হয়। পক্ষান্তরে প্রাচীনের উপাসক পরীক্ষা ও বিচারে পরাঙ্মুখ হন, কারণ প্রবাদ অনুসারে বেদ অপৌরুষেয় ; জীবদেহে নিঃশ্বাসের মত কল্পারম্ভে প্রজাপতির মুখ হইতে ইহা নিঃসৃত হয়, আর ঋষিগণ ইহা গ্রহণ করেন ও লোকশিক্ষার্থ সমাজে প্রচার করেন। সুতরাং তাঁহারা মন্ত্রের রচয়িতা নহেন, তাহার দ্রষ্টা। এমন কি, প্রজাপতি বেদের স্মর্ত্তামাত্র, কারণ প্রতি কল্পে বেদ উক্তরূপে আবির্ভূত হয়, অর্থাৎ ইহার আবির্ভাবে তাঁহার প্রকৃত কর্ত্তৃত্ব নাই।

বেদের উৎপত্তি ও প্রচার সম্বন্ধে এই পৌরাণিক আখ্যায়িকাতে যে মূল্যবান সত্য আছে তাহা আমরাও স্বীকার করি। ইন্দ্রিয়গ্রাম ও মন স্থূল বিষয়ের সন্ধান দিতে সক্ষম ; সুতরাং মানবজাতি সাহায্য ব্যতিরেকে স্থূলের তথ্য আবিষ্কার করে। কিন্তু ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানে কিংবা তাহার আলোচনায় অলৌকিকতত্ত্বের ইঙ্গিত পর্য্যন্ত নাই। সুতরাং ঈদৃশ জ্ঞান প্রজাপতির দানরূপে মানবগণ লাভ করে, স্বচেষ্টায় অর্জ্জন করে

(১) যজুর্ব্বেদ ১০ অধ্যায় ।২৭ কণ্ডিকা (২) গীতা ২।৪২-৪৪

না। প্রথমে মনীষিগণ এই অমূল্য ধনে ধনী হন, পরে তাঁহাদিগের উপদেশরূপে অন্যে ইহা প্রাপ্ত হয়। আর মানব প্রকৃতি প্রতি সর্গে একই প্রকার অথচ অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব সতত বর্ত্তমান। সুতরাং সূক্ষ্ম বা অধ্যাত্ম জ্ঞানের প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে প্রজাপতির বিশেষ স্বাতন্ত্র্য নাই।

কিন্তু প্রজাপতির দান যে অধিকার অনুসারে গৃহীত হইয়াছিল তাহা সুস্পষ্ট, কারণ সংহিতায় উপদেশে তারতম্য আছে, আর উপনিষদের প্রবর্ত্তকগণ উক্ত উপদেশের সীমা অতিক্রম করিয়াছেন। বস্তুতঃ প্রজাপতি অনন্তজ্ঞানের আকর হইলেও প্রত্যেক ঋষির লাভ তাঁহার যোগ্যতা অনুসারেই হইয়াছিল। ঋগ্বেদের নানাস্থলে এই মানবীয় সঙ্কীর্ণতার উল্লেখ দেখি। তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। প্রথম মণ্ডলের শতাধিক চতুঃষষ্টিতম সূক্ত উদারতা ও সূক্ষ্মদৃষ্টির জন্য সর্ব্বত্র প্রখ্যাত ও আদৃত, অথচ ঋষি নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করিয়াছেন যে আত্মা ও সৃষ্টি সম্বন্ধে তিনি অজ্ঞ, সুতরাং এই দুর্ব্বোধ বিষয়ে মেধাবিগণের নির্দ্দেশ তাঁহার প্রার্থনীয়। প্রতিবাদী হয় ত বলিবেন, সমগ্র বেদ অনন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার, কোন বিশেষ সূক্ত তাহা নহে। জ্ঞান অনন্ত বটে, কিন্তু কোন গ্রন্থ অনন্তের আধার হইতে পারে কি? উত্তরকাল এই প্রশ্নের চূড়ান্ত উত্তর দিয়াছে, কারণ যে মহাপুরুষগণ প্রচলিত বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানে দোষ লক্ষ্য করিয়া প্রবল আঘাত করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নির্দ্দেশ ধর্ম্মে সংবলিত হইয়াছে। সুতরাং হিন্দুধর্ম্ম প্রাচীনের প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত হইলেও সংস্কারের পরিপন্থী নহে। শ্রীকৃষ্ণ সেই সংস্কারকগণের অন্যতম আর গীতা তাঁহার বাণী।

এই উক্তির পরে সংশয় হইতে পারে যে কর্ম্মকাণ্ডের চর্চ্চায় আমরা প্রকরণ হইতে অনর্থক বহু দূরে আসিয়াছি, কারণ

হিন্দুধর্ম্মে গীতার প্রভাবই আমাদের আলোচ্যবিষয় ছিল। কিন্তু এই ধর্ম্মের প্রাচীনতম রূপ ও গীতায় তাহার নির্দ্দেশ যে একান্ত বিসদৃশ নহে তাহা উপলব্ধি করা আবশ্যক। সুতরাং তুলনামূলক আলোচনায় তাহাদিগের সঙ্গতি যথাসাধ্য প্রদর্শন করিলাম। অন্য কারণেও কর্ম্মকাণ্ডের অনুশীলন এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক মনে করি নাই। যাহা গীতায় অস্পষ্ট, কর্ম্মকাণ্ডে তাহার বিশদ বর্ণনা আছে। গীতা দ্রব্যযজ্ঞের উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র (১)। কিন্তু যজুর্ব্বেদ তাহার বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। গীতা বলিয়াছেন, সাত্ত্বিকব্যক্তি দেবগণের পূজা করে(২)। অথচ এই সকল উপাস্য সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই, কিন্তু ঋগ্বেদে ও যজুর্ব্বেদে তাঁহাদিগের প্রভাব ও আনুকূল্য বিবৃত হইয়াছে। গীতায় সকাম কর্ম্মের অপবাদ পাই(৩)। কিন্তু কি প্রকার কামনা যজ্ঞে প্ররোচক হইত তাহা উক্ত সংহিতা দুইটিতে দেখি।

বর্ণনার বিস্তার লক্ষ্য করিলে দেবার্চ্চনাই কর্ম্মকাণ্ডের মুখ্য বিষয় মনে হয়, যদিও ঈশ্বরের ভক্তিপূর্ণ ভজনা স্থানে স্থানে আছে। পক্ষান্তরে জ্ঞানকাণ্ডে দৃষ্টি অন্তর্মুখ, সুতরাং দেবতার স্থান নিতান্ত গৌণ। কেনোপনিষৎ বলিয়াছেন, ব্রহ্ম বা আত্মাকে ইন্দ্রিয়বর্গ ও মন জানে না, কারণ আত্মার অধিষ্ঠানে তাহারা সচেতন হয়; অতএব কোন মতে অবধারণযোগ্য বলিয়া যাঁহারা সচরাচর পূজিত হন, তাঁহারা ব্রহ্ম নহেন, তাঁহাদিগের পূজা অকারণ(৪)। গীতার মতে কিন্তু দেবার্চ্চনার ফলে দেবলোক লাভ হয়(৫)। আর এই অভ্যুত্থানে কোন রহস্য নাই। বিবিধ দেবতা বিভিন্ন আদর্শের বিগ্রহ। প্রকৃতি অনুসারে মানব ভিন্ন ভিন্ন আদর্শের পক্ষপাতী হয়; সেই

(১) গীতা ৪।২৮ (২) গীতা ১৭।৪ (৩) গীতা ২।৪১-৪৫
(৪) কেন ১।৪-৮ (৫) গীতা ৯।২৫

পক্ষপাত তাহার আরাধনা নিরূপণ করে ও তাদৃশ বিশিষ্ট আরাধনার ফলে বিশিষ্টগুণ বা বস্তু লাভ তাহার ঘটে। কিন্তু এই কারণকার্য্য সম্বন্ধ ঈশ্বরের বিধান; অর্চ্চিত দেবগণের ইহাতে কর্ত্তৃত্ব নাই(১)। আর এক কথা, গীতা বলিয়াছেন এই প্রকার অভ্যুদয় একদেশিক ও অস্থায়ী হয়, সুতরাং উক্ত আদর্শগুলি চরম লক্ষ্য হইতে পারে না; নিত্য ও নিরতিশয় মঙ্গলের জন্য ঈশ্বরের উপাসনাই একমাত্র উপায়; প্রকৃত-পক্ষে তিনিই যাবতীয় যজ্ঞের প্রভু ও ভোক্তা(২); সাধারণ মানব এই তত্ত্ব উপলব্ধি করে না বলিয়া অপ্রধান দেবতার পূজা করে আর যোগ্যতার অনুপাতে তাহার লাভ হয়। সুতরাং নিম্নাধিকারীর পক্ষে কর্ম্মকাণ্ডের ব্যবস্থা যে নিরর্থক নহে, তাহা গীতা স্বীকার করিয়াছেন। সত্য বটে, অর্জ্জুন এই ব্যবস্থাকে উপেক্ষা করিতে আদিষ্ট হইয়াছেন(৩)। কিন্তু অর্জ্জুন নিম্নাধিকারীর মত সুখসম্পদের প্রার্থী নহেন, মুক্তি বা দুঃখ-নিবৃত্তিই তাঁহার একমাত্র কাম্য।

জ্ঞানকাণ্ডে বলা হইয়াছে :—সকলই ব্রহ্ম, কারণ যাবতীয় বিষয়ের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় তাঁহাতে হয়; সুতরাং শান্তচিত্তে তাঁহার উপাসনা করা উচিত; সংসারে অনুরাগ বা বিদ্বেষের কোন সঙ্গত হেতু নাই; বস্তুতঃ কামনা, কর্ম্ম ও ভোগ ব্রহ্মেরই; কারণ বিশ্বে তিনি পরিব্যাপ্ত আর জীবহৃদয়ে তাঁহার অধিষ্ঠান; কিন্তু এই তত্ত্বে মানব সাধারণতঃ অবহিত হয় না, অথচ ইহা নিঃসংশয়ে উপলব্ধি করিলে অর্থাৎ সংকীর্ণ, ব্যক্তিগত অহঙ্কার ও মমতা পরিত্যক্ত হইলে মরণের পরে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়(৪)। ঈদৃশ উপদেশে ঈশ্বরই ব্রহ্ম, সুতরাং কর্ম্ম ও উপাসনা বিরুদ্ধ

(১) গীতা ৭।২১ (২) গীতা ৯।২৪
(৩) গীতা ২।৪৫ (৪) ছান্দোগ্য ৩।১৪

নহে। গীতাও বলিয়াছেন,—জীবনিচয়ের উৎপত্তি যাঁহাতে, যিনি বিশ্বে সর্ব্বত্রই বিদ্যমান, স্বভাবনিয়ত কর্ম্ম দ্বারা তাঁহার উপাসনা করিলে সিদ্ধিলাভ হয় (১)। সুতরাং জ্ঞানকাণ্ড ও গীতা চরমতত্ত্ব সম্বন্ধে একই উপদেশ দিয়াছেন আর এই উপদেশে কর্ম্মযোগের সূত্র অনুস্যূত। প্রভেদ এই,—জ্ঞানকাণ্ডে যাহা সঙ্কেতমাত্র গীতায় তাহার বিস্তৃত ও বিশদ ব্যাখ্যা আছে।

প্রশ্ন হইতে পারে, ব্রহ্মে কামনা সম্ভব কি আর কর্ম্মই বা তাঁহার কিরূপ? অতএব উত্তরে বলি, আত্মপ্রকাশই তাঁহার কামনা, আর সেই প্রকাশের জন্য যাহা আবশ্যক তাহাই তাঁহার কর্ম্ম। তিনি জ্ঞানময়, সুতরাং জ্ঞানের যথাসম্ভব অভিব্যক্তিকে তাঁহার কাম্য বলা যাইতে পারে। তাঁহার কর্ম্মও এই দৃষ্টিতে অগণিত দেহাবচ্ছিন্ন চেতনার উদ্ভব, কারণ তদ্ব্যতীত জ্ঞানের সর্ব্ববিধ বিকাশ হয় না। কিন্তু সংশয় হয়, দুষ্কৃতি ও দুঃখ কি ব্রহ্মে বিদ্যমান। অতএব উত্তরে জিজ্ঞাসা করি, তাহারা কি জ্ঞানের অতীত? বিষয়টি পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। সুতরাং গীতার একটি উদাহরণ লইয়া আলোচনা সমাপ্ত করিব। গীতা অক্ষক্রীড়াকে ঈশ্বরের বিভূতি বা বিশেষ প্রকাশ বলিয়াছেন (২)। এই উক্তির প্রতিবাদও হইয়াছে। কিন্তু নীতি-শাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী সংসার রচিত, এ কল্পনা বালোচিত, কারণ সুনীতি ও দুর্নীতি আছে বলিয়াই নীতিশাস্ত্র রচিত হইয়াছে। বস্তুতঃ পাপের বিভীষিকা কোন কোন ব্যক্তির বিচারশক্তিকে এ বিষয়ে পঙ্গু করে। পাপের ফল যদি বিষময় হয়, তাহা হইলে শুভদ পুণ্য অপেক্ষা তাদৃশ পাপ নিকৃষ্ট সৃষ্টি নহে। ছলনা যে ক্ষতিকর তাহা সর্ব্বজনবিদিত, আর

(১) গীতা ১৮।৪৬ (২) গীতা ১০।৩৬

অক্ষক্রীড়া যে সর্ব্বনাশের কারণ হয় তাহা অর্জ্জুন বিশেষরূপে জানিতেন। সুতরাং উদাহরণটিতে উক্ত সংশয়ের চূড়ান্ত মীমাংসা আছে।

কেহ কেহ বলেন, জ্ঞানকাণ্ডে দ্বিবিধ ব্রহ্মের উল্লেখ আছে। বস্তুতঃ একই ব্রহ্মের দ্বিবিধ ভাব প্রদর্শিত হইয়াছে, যদিও উপদেশ সুবোধ্য হইবে বলিয়া শাস্ত্র কোন কোন স্থলে তাহাদিগের পৃথক্ পৃথক্ বর্ণনা দিয়াছেন। তথাপি প্রশ্ন হয়,—একটিকে পর ও নিত্য আর অন্যটিকে অপর ও জাত বলা হইয়াছে কেন? অতএব উত্তরে বলি, সৃষ্টিপ্রসঙ্গে পরব্রহ্মকেই জাত বলা হইয়াছে। ব্রহ্ম চিরন্তন কিন্তু সৃষ্টি লয়োদয়শীল, সুতরাং ব্রহ্ম স্বরূপে নিত্য হইলেও বিশ্বরূপে তাঁহার প্রকাশ লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে জাত বলা যায়। কিন্তু উভয়ভাবে অবধান সম্ভব নহে। সুতরাং সন্ন্যাসীর মতে স্বরূপই চিন্তনীয়, কারণ প্রকাশের চিন্তা বিক্ষেপের হেতু হইতে পারে। আর এই অভিমত জ্ঞানকাণ্ডের কোন কোন অংশে সমর্থিত হইয়াছে। কিন্তু মানবের ভোগায়তনে ও কর্ম্মক্ষেত্রে প্রকাশই সুস্পষ্ট অথচ স্বরূপ আবৃত। সুতরাং গীতা বলিয়াছেন, যাঁহারা পরম শ্রদ্ধাসহকারে সতত সগুণব্রহ্মের অর্থাৎ ঈশ্বরের উপাসনা করেন তাঁহাদিগের সাধনাই উৎকৃষ্ট(১)। তথাপি কর্ম্মজনিত বিক্ষেপ নিবারিত হয় না, আর সম্পূর্ণরূপে কর্ম্মত্যাগ অসম্ভব। সুতরাং আরও বলা হইয়াছে; ঈশ্বরের প্রেরণায় কর্ম্ম করিতেছি, তাহার সিদ্ধি বা অসিদ্ধিতে, সুফল বা কুফলে আমার কোন অধিকার নাই, প্রয়োজনীয় কর্ম্ম কালে এই ধারণা পোষণ করিলে কর্তৃত্বাভিমান ও ফলাভিসন্ধি থাকে না, অতএব কর্ম্মও ঈশ্বরের উপাসনায় পরিণত হয়। ইহাই কর্ম্মযোগ, গীতার শ্রেষ্ঠ উপদেশ।

(১) গীতা ১২।২

কর্ম্মযোগীর ধ্যেয় কে?

ব্রহ্ম ও ঈশ্বর, এই দুইটি শব্দ সমনামরূপে ব্যবহার করিয়াছি, যদিও ঈশ্বর সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ অর্থাৎ দ্বৈতবাদে প্রতিষ্ঠিত। বস্তুতঃ ব্রহ্ম বা কর্ম্মযোগীর ঈশ্বর সৃষ্টিকে অতিক্রম করিলেও সৃষ্টি তাঁহার অন্তর্ভূ্ত; নচেৎ কর্ম্ম ও ভোগ তাঁহাকে অর্পণ করার কোন সঙ্গত অর্থ হয় না। অথচ গীতা স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন, মোক্ষার্থীকে যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও অন্যান্য কর্ম্ম আর যাবতীয় ভোগ ঈশ্বরে অর্পণ করিতে হইবে। কিন্তু ধ্যান করিতেও কর্ম্মযোগী আদিষ্ট হইয়াছেন, কারণ ধ্যান ব্যতীত উপাসনা সম্পূর্ণ হয় না। সুতরাং প্রশ্ন হয়, তাঁহার ধ্যেয় কে? ইন্দ্রিয় যাহা গ্রহণ করিতে সক্ষম কিংবা যাহার সম্বন্ধে চিত্তে সম্যক্ ও বিশদ ধারণা হয় তাহাই ধ্যেয় হইতে পারে, আর এই বিচারে ঈশ্বর ধ্যানের বিষয় নহেন। অতএব তাঁহার কোন প্রতীকই ধ্যেয়। কেহ কেহ বলেন, দ্বাপরের শেষভাগে যে মহাপুরুষ দুষ্টের দমনে ও শিষ্টের পালনে রত ছিলেন আর উত্তরকালে লোকশিক্ষার্থ গীতার বাণী রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহাকে ধ্যান করা উচিত। অন্য মতে তাঁহার বাল্যলীলাই প্রণিধানযোগ্য, কারণ তাহাতে যাবতীয় চিত্তাকর্ষক সদ্‌গুণ পরিস্ফুট হইয়াছিল। কিন্তু মহাপুরুষের বিবিধ সম্বন্ধ ও অবস্থানুযায়ী নানাপ্রকার আচরণ ধ্যানের বিষয় হইতে পারে না, কারণ ধ্যানে চিত্ত জটিলতাবর্জ্জিত একটি-মাত্র বিষয়ে স্থিতি করে, আর ইহাই তাহার সম্পূর্ণ ও নির্দ্দোষ জ্ঞানলাভের উপায়।

বিশ্বরূপ?

শ্রীকৃষ্ণের আচরণ গীতায় আলোচিত হয় নাই; উপদেষ্টা-রূপেই গীতায় তাঁহার পরিচয়। সুতরাং লীলাধ্যান সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, প্রকরণ অনুসারে তাহা যথেষ্ট। কিন্তু বিশ্বরূপের বর্ণনায় গীতা মুখর, আর এইরূপে জীব ও জীবলোক ভগবানেরই

ঐশ্বর্য্যমাত্র, সুতরাং অশেষ বৈচিত্র্য সত্ত্বেও তাহারা সম্বদ্ধ। বিবিধ বিভূতির ধারণায় চিত্ত বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে বিচরণ করে, আর প্রতিবারই সৃষ্টির কোন সঙ্কীর্ণ বিভাগ পরীক্ষিত হয়, সুতরাং চিন্তাধারায় একতানতা থাকে না। কিন্তু বিশ্বরূপের ধারণায় দৃশ্য ব্যাপক হইলেও বিভক্ত নহে, আর দৃষ্টি সর্ব্বাধার ঈশ্বরে কেন্দ্রীভূত থাকে, সুতরাং বিষয়ের প্রসার ও জটিলতা অখণ্ড দর্শনের পক্ষে অন্তরায় হয় না। কণ্ঠহারে নানা বর্ণের মণি থাকিলেও তাহারা একই সূত্রে গ্রথিত বলিয়া সম্পূর্ণ অলঙ্কারটির ধারণা সুস্পষ্ট হয়; অতএব বিশ্বরূপে নানাত্ব সত্ত্বেও তাহার স্পষ্ট ধারণা হইবে না কেন, বিশেষতঃ যোগসূত্র যখন ক্ষীণ বা অস্থায়ী নহে? বস্তুতঃ ইহা কেবল জীব ও জীবলোকের সমষ্টি নহে, পরন্তু তাহাদিগের চরম আশ্রয়। আর আশ্রয় বলিলেও যথেষ্ট হয় না, কারণ জগৎ শাসন করিবার মত অমেয় তেজ ইহাতে দেদীপ্যমান। সুতরাং ইহা ঈশ্বরের রূপ, ইহাতে তাঁহার সর্ব্বময়ত্ব, সর্ব্বাধিষ্ঠাতৃত্ব ও সর্ব্বাতীতত্ব সকলই পরিস্ফুট। তিনি একাধারে বিশ্বের উপাদান, অবলম্বন ও নিয়ন্তা, আর যথাকালে তাহাকে ধ্বংস করিয়া আপন সত্তায় বীজরূপে সঞ্চয় করিতেছেন। অতএব বিশ্বরূপের ধ্যান সম্ভব হইলে তাহাই শ্রেষ্ঠ ধ্যেয় কারণ তাহা ভগবদ্ভাব।

কিন্তু প্রত্যক্ষে এবংবিধ সর্ব্বাতিশয়ত্বের নিদর্শন নাই; কল্পনা ইহার চিত্রণে অসমর্থ; অনুমানও ইহার আপাত-বিরোধের মীমাংসা করিতে অক্ষম। চন্দ্রসূর্য্য এই দেহে নেত্রস্বরূপ, অথচ সহস্র সূর্য্যের ভাতির মত ইহার প্রভা(১)। দেবগণের কেহ কেহ ইহাতে প্রবেশ করিতেছেন, কেহ বা কৃতাঞ্জলিপুটে ইহার স্তবে রত(২)। পক্ষান্তরে রাক্ষসগণ ইহার

(১) গীতা ১১।১২, ১৯ (২) গীতা ১১।২১

ভয়ে চতুর্দ্দিকে পলায়নপর(১)। আর যুধ্যমান বীরগণ ইহার উদরস্থ হইতেছেন(২)। অথচ তাঁহারা সকলেই ঐশ প্রকাশের অন্তর্গত, অর্থাৎ ক্ষণতরেও ঈশ্বর হইতে বিযুক্ত নহেন। পুনশ্চ দিক্‌সমূহ তাঁহার অন্তর্গত(৩)। আর কাল তাঁহার প্রকাশের অন্যতর পদ্ধতি,(৪)। অথচ অর্জ্জুন দেশে ও কালে অবস্থিত হইয়াও তাঁহাকে বাহ্যবিষয়রূপে অবলোকন করিতেছেন।

এই বর্ণনায় বিরোধ স্পষ্ট, যদিও শ্রুতির শ্রেষ্ঠ উপদেশগুলি ইহার অনুকূল, আর প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের মহিমার ইহাই শ্রেষ্ঠ বিবৃতি, সংসারের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগের সম্যক্ পরিচয়। কিন্তু সাধারণ ভাবে এই তত্ত্ব অঙ্গীকার করিলেও দৃশ্যরূপে ইহার উপলব্ধি দুঃসাধ্য, কারণ সংশয় ও অসঙ্গতিবোধ পদে পদে অন্তরায় হয়। কুরুক্ষেত্রে সমবেত অষ্টাদশ অক্ষৌহিণীর মধ্যে কেবল অর্জ্জুন এই রূপ দেখিয়াছিলেন, আর তাহাও দিব্যদৃষ্টি লাভ করিবার পরে(৫)। অধিকন্তু, অর্জ্জুনও বিশ্বরূপ সহ্য করিতে পারেন নাই, পরন্তু ঈশ্বরের সৌম্য মূর্ত্তি দেখিবার জন্য সানুনয় আবেদন করিয়াছিলেন(৬)। সুতরাং ইহার সম্যক্ উপলব্ধি সাধনার অঙ্গ নহে, সিদ্ধি বা সাযুজ্য মুক্তির পূর্ব্বাভাষ(৭)। গীতাই বলিয়াছেন:—বিশ্বরূপ দর্শন দেবগণের পক্ষেও দুর্লভ; শাস্ত্রজ্ঞান, যজ্ঞানুষ্ঠান, দান ও কঠোর তপস্যা ইহা লাভ করিবার উপায় নহে; কেবল অনন্যা ভক্তির প্রভাবে ইহার অনুভূতি হয়, আর সেই অনুভূতি সুস্পষ্ট ও স্থির হইলে ভক্ত অচিরে ঈশ্বরে প্রবেশ করেন অর্থাৎ তাঁহার অস্থায়ী ব্যক্তিত্বের অবসান ঘটে(৮)। সুতরাং বিশ্বরূপ

(১) গীতা ১১।৩৬ (২) গীতা ১১।২৬, ২৭ (৩) গীতা ১১।২০
(৪) গীতা ১২।৩২ (৫) গীতা ১১।৮ (৬) গীতা ১১।৪৫, ৪৬
(৭) গীতা ১১।৫৪ (৮) গীতা ১১।৫২-৫৪

ধ্যানের বিষয় নহে যদিও তাহার অনুচিন্তনে বিষয়বৈরাগ্য দৃঢ় হয় ও তত্ত্বজ্ঞান পূর্ণতা লাভ করে।

নারায়ণের চতুর্ভুজ মূর্ত্তি?

আর এক কথা, বিশ্বরূপ প্রলয়ের অভিনয়; তাহা ধ্যান করা ত দূরের কথা, অর্জ্জুন ক্ষণেকের তরে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া ধৈর্য্য ও চিত্তপ্রসাদ হারাইয়াছিলেন; পরে নারায়ণের নয়নাভিরাম চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার চিত্ত স্থির হইল(১)। সুতরাং মনে হইতে পারে, এই মূর্ত্তির ধ্যানই কর্ম্মযোগীর পক্ষে যোগ্যতম, কারণ নারায়ণ দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিতেছেন, আর আদর্শ কর্ম্মযোগী শ্রীকৃষ্ণের জীবনে এই দুইটি প্রধান লক্ষ্য ছিল। কিন্তু সংসারে দুঃখই প্রবল ও মৃত্যু অনিবার্য্য। আর অপ্রিয় সত্যের বিস্মৃতি কর্ম্মে প্রকৃত সাফল্য লাভের উপায় নহে, যদিও দুর্ব্বল মানব তাহার আলোচনায় কষ্ট বোধ করে। বস্তুতঃ উদয়ের পরে লয়, সুখের পরে দুঃখ স্বাভাবিক ও নির্দ্দোষ। মানব সাধারণতঃ কামনার বশ বলিয়া এই আবর্ত্তন ভীতিপ্রদ হয়; নতুবা ধ্বংস সৃষ্টির উপক্রমরূপে গৃহীত হইত, অর্থাৎ বিশ্বনাথের করাল রূপ ও নারায়ণের সৌম্য মূর্ত্তিতে বিরোধ কল্পিত হইত না। যাঁহারা কামনার অধীন নহেন, তাঁহারা অনিত্য সংসারে নিত্য পদার্থেরই সন্ধান লইয়া থাকেন, আর সংসারে ধ্বংসলীলা সেই নিত্য পদার্থের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে; সুতরাং ইহাকে তাঁহারা দোষাবহ মনে করেন না(২)। বস্তুতঃ ঈশ্বর সকলকেই সুখদুঃখের অতীত হইবার ক্ষমতা ও সুযোগ দিয়াছেন। ইহাতেই তাঁহার প্রকৃত করুণা; অন্য প্রকার করুণা পক্ষপাতের নামান্তর হইত। শ্রীকৃষ্ণ সেই ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন অর্থাৎ বহুবিধ দুঃখ ও

(১) গীতা ১১।৪৯, ৫১

(২) গীতা ১১।৫২

দুর্দ্দশার মধ্যে নিত্য তত্ত্বে অবহিত ছিলেন বলিয়াই তিনি শ্রেষ্ঠ কর্ম্মযোগী।

হৃদয়স্থ আত্মা ধ্যেয়

কিন্তু এই নিত্য তত্ত্ব কি? উপনিষৎ, সাংখ্য ও গীতা সমস্বরে বলিয়াছেন, ইহা আত্মা। সুতরাং আত্মাই ধ্যেয়। গীতায় আত্মার ধ্যান হৃদয়গ্রাহী ভাষায় আদিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু তাহার সবিশেষ বর্ণনা নাই। সুতরাং যুক্তি সহকারে সেই নির্দ্দেশের যথাসাধ্য ব্যাখ্যা দিতেছি। প্রতি জীবহৃদয়ে আত্মবোধ সতত বর্ত্তমান, আর অন্য যাবতীয় বোধ ইহার আশ্রিত। তাহারা পরিবর্ত্তনশীল ও অস্থায়ী, কিন্তু আত্মবোধের রূপান্তর নাই। তাহাদিগের প্রত্যেকটিতে অল্পাধিক জটিলতা বিদ্যমান, কিন্তু আত্মবোধ অবিভাজ্য, কারণ আমি ও আমির বোধ একই। বস্তুতঃ ইহাই জীবনের চরম অবলম্বন, বিচিত্র ব্যবহারে একমাত্র স্থির ও মৌলিক পদার্থ। আর দেহান্তেও যে ইহার অন্ত হয় না তাহা স্বীকার্য্য, যেহেতু দেহের সর্ব্ববিধ বিকারে ইহা অক্ষুণ্ণ থাকে; নষ্ট হয় কেবল সেই দেহে আত্ম-বোধ বা একপ্রকার অহঙ্কার। ইহা অন্তরতম, সুতরাং ইহার ধ্যান সম্ভব। আর ইহা অবিকারী ও শুদ্ধ অর্থাৎ অন্য-নিরপেক্ষ, সুতরাং ইহার ধ্যান সুখময় ও শান্তিপ্রদ।

গীতা ইহাকে পরা প্রকৃতি বলিয়াছেন(১) ও বিভূতির গণনায় প্রথম স্থান দিয়াছেন(২)। সাংখ্য ইহাকে অস্মিতা-মাত্র ও গ্রহীতা বলিয়াছেন, আর পরবর্ত্তী দর্শনে ইহা জীবাত্মা নামে খ্যাত। তথাপি ইহা চরম তত্ত্ব অর্থাৎ আত্মা বা ব্রহ্ম নহে, কারণ দেহসংস্পর্শজনিত অনাত্মবোধ ইহার অনুষঙ্গ। কিন্তু ধ্যান প্রগাঢ় হইলে অর্থাৎ সমাধির আকার ধারণ করিলে এই আত্মপরবোধ অপগত হয়। সুতরাং সমাধিলব্ধ প্রজ্ঞায়

(১) গীতা ৭।৫ (২) গীতা ১০।২০

উপলব্ধি হয়, চৈতন্যস্বরূপ আত্মা সকল জীবে ও সমগ্র জগতে ওতপ্রোতভাবে বর্ত্তমান(১)। ইহাই তত্ত্ব, কারণ চৈতন্যে বহুত্ব বা বিভাগ কল্পনীয় নহে আর জগৎ রূপরসাদি বোধের বিচিত্র সমাবেশ হওয়ায় চরম বোদ্ধা বা চৈতন্যময় আত্মাতেই তাহার উৎপত্তি ও অবস্থান। কিন্তু দেহাবচ্ছিন্ন আত্মভাব ও আত্মতত্ত্ব বা ঈশ্বরে প্রভেদ বিস্তর। সুতরাং গীতা বলিয়াছেন, পূর্ণ প্রজ্ঞা লাভের জন্য ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় নিতান্ত আবশ্যক আর ধ্যানের নিয়ত অভ্যাসে তাহাতে স্থিতি হয়(২)।

গীতার ও সাংখ্যে দৃষ্টি-ভঙ্গী

সাংখ্য শাস্ত্রে ধ্যানের উপদেশ বিস্তৃত, আর পঞ্চভূত হইতে গ্রহীতা পর্য্যন্ত নানা তত্ত্বে অভিনিবেশের পদ্ধতি বর্ণিত হইয়াছে। অথচ গীতায় কেবল আত্মভাবে সমাহিত হইবার আদেশ দেখি। কিন্তু এই প্রভেদের প্রকৃত কারণ সাধকের উদ্দেশ্যে পার্থক্য। যাঁহারা দুঃখের অভিঘাতে বিপন্ন হইয়া উহার নিবৃত্তিমাত্র কামনা করেন, তাঁহাদিগকে সর্ব্বচিত্তবৃত্তিনিরোধের পরামর্শ দেওয়াই সঙ্গত, কারণ সাংসারিক সুখ ও দুঃখ চিত্তবৃত্তির আশ্রয়ে অনুভূত হয় আর তাদৃশ সুখও দুঃখদিগ্ধ। কিন্তু গ্রাহ্য বা বাহ্য বিষয়, গ্রহণ বা বাহ্য ও অন্তর ইন্দ্রিয় ও গ্রহীতা, এই তিনের সহযোগে দুঃখের হেতুভূত চিত্তবৃত্তির উদ্ভব হয়। সুতরাং ধ্যানযোগে ইহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ পরীক্ষাপূর্ব্বক ত্যাগ করাই সমীচীন, কারণ এইরূপে তাহারা নিঃশেষে পরিত্যক্ত হয়, আর তখন পরিচ্ছেদ ও পরিণাম বর্জ্জিত সুতরাং দুঃখলেশহীন আত্মচৈতন্যই থাকে। সাংখ্যের উপদেশ এইরূপ। পক্ষান্তরে গীতায় দুঃখের অবসান লক্ষ্য হইলেও মুখ্য উদ্দেশ্য পরমানন্দ লাভ। সুতরাং আত্মতত্ত্বে অবহিত হইবার জন্য উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে, আর উপনিষৎও তাহাই করিয়াছেন,

(১) গীতা ৬।২৯ (২) গীতা ৬।২৫, ২৬

কারণ ব্রহ্মের আনন্দ উপলব্ধি করিলে দুর্গতির কোন সম্ভাবনা থাকে না(১)। বস্তুতঃ বিষয়ে অনুরক্ত ইন্দ্রিয় ও মন সঙ্কীর্ণ ও চঞ্চল বলিয়া ব্যবহারিক জ্ঞান বিশেষিত ও পরিণামী অর্থাৎ তাহাতে দর্শন ও অদর্শন সংযুক্ত, সুখ ও দুঃখ মিশ্রিত। কিন্তু সংযত চিত্ত জ্ঞানময় আত্মার অভিমুখ হইলে পূর্ণ আনন্দ লাভ করে(২), কারণ জ্ঞানই আনন্দ। অতএব গীতা ও সাংখ্য উভয়েই ধ্যানের অভ্যাস ও বিষয়বৈরাগ্য সিদ্ধির উপায় বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, যদিও সিদ্ধি সম্বন্ধে ধারণায় প্রভেদ থাকায় ধ্যানের আলম্বন পৃথক্ হইয়াছে।

কর্ম্মযোগীর ধ্যানে প্রয়োজন

আপত্তি হইতে পারে, ধ্যানের অভ্যাস জ্ঞানযোগীর পন্থা, কর্ম্মযোগীর নহে। কিন্তু সাধনা সম্বন্ধে গীতার দৃষ্টি উদার হইলেও প্রত্যেক সাধককে যে অন্তরে আত্মার অধিষ্ঠান উপলব্ধি করিতে হইবে, তাহা গীতার স্থির সিদ্ধান্ত। জ্ঞানযোগ বা আত্মতত্ত্বে অভিনিবেশ, সাংখ্যসম্মত চিত্তবৃত্তি-নিরোধ, ফলাভিসন্ধিত্যাগ পূর্ব্বক বিহিত কর্ম্ম সম্পাদন আর অন্যের নিকট উপাস্য সম্বন্ধে উপদেশ গ্রহণান্তর শ্রদ্ধাসহকারে তদনুযায়ী উপাসনা,—এই চতুর্ব্বিধ সাধনার উল্লেখ ত্রয়োদশ অধ্যায়ে আছে(৩)। প্রথম দুইটি এইমাত্র আলোচিত হইল। তৃতীয়টি সম্বন্ধে বলি, ফলাভিসন্ধিত্যাগ সহসা হয় না, কারণ মানব সাধারণতঃ কামনার দাস, কর্ম্মফলে আসক্তি তাহার মজ্জাগত। সুতরাং তাহার চিত্তশুদ্ধি প্রয়োজন, আর সেই জন্য হৃদয়স্থ আত্মভাবের ধ্যান মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় আদিষ্ট হইয়াছে(৪)। গীতার নির্দ্দেশমত তাহা করিলে অনুভূতি হয়,—এই আত্মা ব্যবহারের কেন্দ্র হইলেও অসঙ্গ অর্থাৎ

(১) তৈত্তিরীয় ২।৯ (২) গীতা ৬।২৭, ২৮

(৩) গীতা ১৩।২৪, ২৫ (৪) ৬।১০-১২, ১৮-২৩

পক্ষপাতবর্জ্জিত ও অবিকারী অর্থাৎ সতত একরূপ। সুতরাং ইঁহার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া কামনাবর্জ্জন পূর্ব্বক স্বধর্ম্ম-পালনই সত্যের প্রকৃত অর্চ্চনা, আর তাদৃশ অর্চ্চনায় আক্ষেপ বা আশঙ্কার অবসর থাকে না। কেবল কথায় ভোগে আসক্তি ত্যাগ কর্ম্মযোগ নহে; তাহার জন্য ধ্যানলব্ধ প্রজ্ঞাও আবশ্যক।

গীতা বলিয়াছেন বটে, কর্ম্মযোগ অভ্যাসের ফলে চিত্ত শুদ্ধ হইলে, মোক্ষপ্রদ জ্ঞান হৃদয়ে স্বতঃ উদিত হয়(১) অর্থাৎ অন্য প্রযত্নের আবশ্যক হয় না, আর কর্ম্মযোগ আত্মজ্ঞান লাভের অন্যতম উপায় অর্থাৎ ধ্যানযোগ হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। সুতরাং ধারণা হইতে পারে, কর্ম্ম-যোগীর পক্ষে ধ্যান নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু সকল কর্ম্ম ঈশ্বরে নিবেদন করিতে কর্ম্মযোগী আদিষ্ট হইয়াছেন অথচ কর্ত্তৃত্ব-বোধ সর্ব্বসাধারণ ও বদ্ধমূল। কেবল উপদেশ গ্রহণ করিয়া কি শ্রোতার সম্যক্ উপলব্ধি হয় যে তিনি দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, ঘ্রাণ, আহার কিছুই করেন না(২)? শুদ্ধ আমি সম্বন্ধে কার্য্যকর জ্ঞান ধ্যানেই সম্ভব, আর উপদেশের সার্থকতা এই যে তাহা ধ্যানে প্রবৃত্ত করে। গীতা বলিয়াছেন, অজ্ঞ ব্যক্তিই ধ্যানপ্রধান জ্ঞানযোগ ও ভক্তিপ্রধান কর্ম্মযোগে একান্ত পার্থক্য প্রচার করিয়া থাকে(৩)। বস্তুতঃ মুক্তি উভয়েরই উদ্দেশ্য আর উপায়ও নিতান্ত ভিন্ন নহে। জ্ঞানযোগী সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারেন না, সুতরাং বিক্ষেপ নিবারণার্থ কর্ম্মযোগের পদ্ধতি কিয়ৎপরিমাণে তাঁহাকে অবলম্বন করিতে হয়। পক্ষান্তরে কর্ম্মযোগী ধ্যানেই সাধ্য সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট জ্ঞান লাভ করেন।

(১) গীতা ৪।৩৮ (২) গীতা ৫।৮,৯ (৩) গীতা ৫।৪

চতুর্থ সাধনা সম্বন্ধে বলি, উপাসনাও এক প্রকার ধ্যান কারণ বিরুদ্ধ বা বিজাতীয় চিন্তা পরিহার পূর্ব্বক নিরন্তর উপাস্যের চিন্তাই উপাসনা। কিন্তু এই শ্রেণীর সাধক বিচারের পরিবর্ত্তে শ্রদ্ধার উপর নির্ভর করেন, যেহেতু অন্যের উপদেশ নিঃসংশয়ে গ্রহণ পূর্ব্বক অনুযায়ী সাধনায় প্রবৃত্ত হন। তথাপি উপদেষ্টা যে জ্ঞানযোগী কিংবা সাংখ্যযোগী কিংবা কর্ম্মযোগী তাহা বর্ণনায় সুস্পষ্ট। সুতরাং এই সাধনা কোন নূতন পন্থা নহে।

অবতারবাদ ৬ নবম ও দশম অধ্যায়ে কীর্ত্তন, আলোচনা ও প্রণতির উল্লেখ থাকায় কেহ কেহ মনে করেন, গীতা প্রচলিত সাধনার অতিরিক্ত একটি ভক্তিপ্রধান ও সুখময় সাধনা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা সকলের পক্ষে সম্ভব কারণ উপাস্যের অনুগ্রহে সিদ্ধিলাভ হয় আর তাহাতে শ্রীকৃষ্ণই উপাস্য কারণ তিনি পূর্ণ ব্রহ্ম। কিন্তু শ্লোকগুলি সাবধানে পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, যাহারা মহাত্মা অর্থাৎ দেবসুলভ সাত্ত্বিক প্রকৃতি সম্পন্ন সুতরাং যাবতীয় সদ্‌গুণের আধার, কেবল তাঁহারাই উপাস্যকে সতত স্মরণ রাখিয়া অবিচলিত চিত্তে তাঁহার আরাধনা করেন, যেহেতু যাবতীয় প্রাণী তাঁহাতে উদ্ভূত হইলেও তিনি অব্যয়, এই জ্ঞান মহাত্মাগণের থাকে(১)। এখন জিজ্ঞাসা করি, ইহা কি অন্যতম সাধনা অথবা অন্যান্য সাধনায় একটি বিশিষ্ট, উচ্চ স্তর? এই বর্ণনার অব্যবহিত পরে জ্ঞানযজ্ঞের উল্লেখ আছে, কারণ তাহা সর্ব্বত্র ব্রহ্মদৃষ্টি লাভ করিবার উপায়। কিন্তু মহাত্মাগনের এই দৃষ্টি আছে বলিয়াই তাঁহাদিগের ভক্তি অব্যভিচারী হয়, তাঁহারা সতত প্রীতিপূর্ব্বক ভজনা

(১) গীতা ৯।১৩,১৪

করেন ও তাদৃশ ভজনার ফলে পরমাত্মা তাঁহাদিগের শুদ্ধ বুদ্ধিতে প্রতিভাত হন(১)। ব্রহ্মদৃষ্টির ইহাই পরাকাষ্ঠা জ্ঞানের চরম বিকাশ, কারণ ইহাতে ভক্ত ও ভজনীয়ে দ্বৈতবোধ অপসৃত হয়। ইহা ঈশ্বরের দান বটে, কিন্তু যোগ্য পাত্রেই ইহা প্রদত্ত হয় কারণ অন্যে ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম। গীতাই বলিয়াছেন, বহুজন্ম সাধনার পরে এই প্রকৃষ্ট জ্ঞান অধিগত হয়; সুতরাং সকলই যে বাসুদেব, ইহা উপলব্ধি করিবার মত মহাত্মা সংসারে অত্যন্ত দুর্ল্লভ(২)।

কিন্তু মহাত্মাগণ যাঁহাকে সকলের উৎপত্তি ও প্রবৃত্তির কারণ জানিয়া ভক্তিভরে সতত পূজা করেন ও তাদৃশ পূজার ফলে আপনাদিগের অন্তরে প্রত্যক্ষ করিয়া কৃতকৃত্য হন, তিনি কি শ্রীকৃষ্ণ? দশম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বরের বিভূতি বলা হইয়াছে। বিভূতি শব্দের অর্থ বিশেষ প্রকাশ। অতএব চরাচরের অগণিত বিভাগে যাহা যাহা প্রধান, সে সকলই বিভূতি বলিয়া গণ্য। কিন্তু সমগ্র বিভূতির গণনা অসম্ভব কারণ বিভূতিও সংখ্যাতীত(৩)। সুতরাং অর্জ্জুনের কৌতূহল নিবারণার্থ কতিপয় উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। এইরূপে দেবনরের মধ্যে যাঁহারা শৌর্য্যে, সম্পদে, পবিত্রতায় বা জ্ঞানে অগ্রগণ্য ছিলেন, তাঁহাদিগের কয়েকজনের উল্লেখ আমরা পাই, যথা যাদবগণের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের আর পাণ্ডবগণের মধ্যে ধনঞ্জয়ের(৪)। অথচ পুরাণে শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণব্রহ্ম বা তাঁহার অবতাররূপে স্তুত হইয়াছেন।

এই অবতারবাদ বিদ্বৎসমাজে বিতণ্ডার কারণ হইয়াছে। কিন্তু গীতার সহিত ইহার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ নহে। পৌরাণিক

(১) গীতা ১০।১০,১১ (২) গীতা ৭।১৯
(৩) গীতা ১০।১৯ (৪) গীতা ১০।৩৭

দশ অবতারের উল্লেখ গীতায় নাই; বরং বলা হইয়াছে বহু সাধক চরিত্রগুণে ও তপস্যালব্ধ জ্ঞানের প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের মত হইয়াছেন(১)। প্রচলিত অবতারবাদ কিন্তু অন্যরূপ। ঈশ্বর শুদ্ধসত্ত্বময় লোকে বিরাজ করেন; তথাপি দুঃখ ও দুষ্কৃতির ভারে ধরা প্রপীড়িত হইলে, সেই ভার অপনয়-নার্থ তিনি উদ্দেশ্যসাধনের উপযোগী দেহ ধারণ পূর্ব্বক সত্ত্ব, রজ ও তমের ক্রীড়াস্থল এই মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হন,—ইহাই সাধারণ ধারণা, আর ভাবপ্রবণ চিত্ত ইহাকে পোষণ করিয়া সান্ত্বনা লাভ করে। কিন্তু তত্ত্বের সহিত ইহার সঙ্গতি নাই। বস্তুতঃ উত্তমের অভ্যুদয় ও অধমের অধোগতি তাঁহার অলঙ্ঘ্য ও চিরন্তন নিয়ম, তাঁহার সার্ব্বভৌম প্রকাশের অবিচ্ছেদ্য ধারা। সুতরাং তাহার প্রবর্ত্তনের জন্য কোন বিশেষ সঙ্কল্প বা চেষ্টার প্রয়োজন হয় না; উত্তমের মাহাত্ম্যই তাহার সংরক্ষক ও উহা যথাকালে প্রকট হয়। মানব সাধারণতঃ কারণ-কার্য্যপরম্পরা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারে না, তাহার দৃষ্টি ও সঙ্কীর্ণ; সুতরাং বিশেষ অবস্থা ও বিশেষ বিধান কল্পনা করে। তাহার আপন ব্যবহারে দোষক্ষালনার্থ কখন কখন নূতন ব্যবস্থার আবশ্যক হয় সত্য; কিন্তু জ্ঞানময় ঈশ্বরের নিয়ন্তৃত্বে হস্তক্ষেপ বা সংশোধনের অবকাশ নাই।

বিভূতিতত্ত্ব ও অবতারবাদে কিছু সাদৃশ্য থাকায় তাহাদিগের প্রভেদ উপেক্ষিত হয়। উত্তম, মধ্যম ও অধমের সমাবেশে সৃষ্টি; সুতরাং উত্তমের আবির্ভাব অসাধারণ ঘটনা নহে, ঈশ্বরের সনাতন নিয়ম; আর অধমের অনাচারে ধর্ম্ম বিপন্ন হইলে উত্তম বা বিভূতি যে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন

(১) গীতা ৪।১০

করেন তাহাও সেই নিয়মের অন্তর্গত, কারণ ঈশ্বর শাশ্বত ধর্ম্মের রক্ষক। কিন্তু ঐশ গুণের বিশেষ পরিচয় আছে বলিয়া বিভূতিকে যদি অবতার বলা হয়, সেই ন্যায় অনুসারে অন্যান্য ব্যক্তিকে নিম্ন শ্রেণীর অবতার বলা উচিত কারণ তাহারাও ঐশগুণের অল্পাধিক অধিকারী। বস্তুতঃ সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বনিয়ন্তা ঈশ্বর তাঁহার নিয়মের ব্যতিক্রম প্রতিরোধার্থ কোন ঊর্দ্ধতন লোক হইতে মর্ত্ত্যে আগমন পূর্ব্বক মনুষ্যদেহ গ্রহণ করেন,—এই মতবাদের সমর্থন শ্রুতি বা যুক্তিতে নাই।

কিন্তু ইহার সপক্ষে শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান ও হিতৈষণার উল্লেখ করা হয়। সুতরাং উহারা অলৌকিক কিংবা অসাধারণ তাহা বিচার্য্য। সমাজে যাঁহারা শীর্ষস্থানীয়, তাঁহাদিগের আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গী কিরূপ হওয়া উচিত, গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে তাহার বর্ণনার পরে জনকাদি রাজর্ষিগণের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে(১)। কিন্তু প্রবাদই সে বিষয়ে একমাত্র সাক্ষ্য। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ যোগ্য উপদেষ্টার মত আপনার ব্যবহার ও মনোভাবের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তিনি আপ্তকাম, সুতরাং তাঁহার কর্ম্মে কোনপ্রকার স্বার্থসিদ্ধির আকাঙ্ক্ষা নাই, তথাপি তিনি সতত কর্ম্মে নিযুক্ত কারণ তিনি কর্ম্মত্যাগ করিলে অন্য মানব কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উদাসীন হইবে, সমাজে শৃঙ্খলা থাকিবে না ও অবশেষে সমগ্র জাতির উচ্ছেদ ঘটিবে(২)। কিন্তু সমালোচক বলিতে পারেন:—অনুরূপ বিশ্বপ্রীতি, দূরদর্শিতা ও কর্ত্তব্যে অনুরাগ মহাপুরুষগণের প্রসিদ্ধ লক্ষণ; সাধারণ মানব বাত্যাতাড়িত নৌকার মত নানাবিধ কামনার বশে ইতস্ততঃ ধাবিত হয়, অথচ তাঁহারা সর্ব্বাবস্থায় স্থির, ধীর ও কর্ম্মকুশল কারণ

(১) গীতা ৩।২০ (২) গীতা ৩।২২-২৪

জনহিতকর সঙ্কল্প ব্যতীত তাঁহাদিগের অন্য উদ্দেশ্য নাই; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের এই আত্মকথা অবতারত্বের প্রমাণ নহে।

চতুর্থ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের ঘটনাবলী স্মরণ করা সম্ভব(১)। কিন্তু সমালোচকের মতে ইহাতেও অবতারত্ব সূচিত হয় না, কারণ বামদেব সম্বন্ধে অনুরূপ প্রবাদ আছে। বস্তুতঃ দেহাত্মবোধই অতীতের বিস্মৃতির হেতু, কারণ বর্ত্তমান দেহের বিকার চিত্তকে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করে বলিয়া অতীতের অনুভূতি স্মৃতিপটে স্থান পায় না। সুতরাং যাঁহার দেহাত্মবোধ খর্ব্ব হইয়াছে, তাঁহার পক্ষে অতীতের কথা স্মরণ করিবার অন্তরায় নাই, যেহেতু স্থূলদেহের নাশে স্মৃতির আধার সূক্ষ্মদেহ ধ্বংস হয় না। তথাপি শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব ও নিয়ন্তৃত্বকে অসাধারণ না বলিয়া অলৌকিক বলাই সঙ্গত মনে হয়। তিনি বিবস্বানকে যোগ সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছিলেন, সংসারে থাকিয়াও তিনি আপ্তকাম, তিনি কর্ম্মত্যাগ করিলে মানবজাতি বিলুপ্ত হইবে,—এই প্রকার উক্তি কোন মানবের পক্ষে প্রযোজ্য কি? অধিকন্তু গীতার বহু স্থলে তিনি আপনাকে সৃষ্টিকর্ত্তা ও বিশ্বপাতা বলিয়াছেন, অথচ মহাভারতে তিনি সংযতবাক্ বলিয়া প্রসিদ্ধ। সুতরাং এই পরিচয়ের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি তাহা সাবধানে স্থির করা উচিত। নিম্নে প্রশ্নোত্তরের আকারে তাহাই যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

প্রশ্ন—গীতার উদ্দেশ্য কি?

উত্তর—কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে বিমূঢ় অর্জ্জুনকে যোগ্য উপদেশ প্রদান(২)।

---

(১) গীতা ৪।৫ (২) গীতা ২।৭

প্রশ্ন—সেই উপদেশ কিরূপ ?

উত্তর—প্রধানতঃ কর্ম্মযোগের অভ্যাস।

প্রশ্ন—কোন্ মৌলিক সত্যে এই সাধনার প্রতিষ্ঠা ?

উত্তর—কোন সত্তা ঈশ্বরের অতীত নহে। তত্ত্বগণনায় ও সাধনার নির্দ্দেশে ইহাই গীতার মূলসূত্র।

প্রশ্ন—ঈশ্বর সম্বন্ধে গীতার উপদেশ কিরূপ ?

উত্তর—ঈশ্বর শিব ও শান্ত হইলেও সুখে, দুঃখে, সম্পদে, বিপদে, জয়ে, পরাজয়ে, অর্থাৎ সর্ব্বাবস্থায় তাঁহার অধিষ্ঠান(১)। তিনি দোষসংস্পর্শশূন্য, সুতরাং দোষবহুল সংসারের সহিত তাঁহার সংস্রব নাই,—এই ধারণায় তাঁহাতে অনৈশ্বর্য্য আরোপ করা হয়।

প্রশ্ন—কর্ম্মযোগ কিরূপ ?

উত্তর—সংসারে থাকিতে কর্ত্তব্য কর্ম্ম নিঃসঙ্কোচে করিবে, কিন্তু তাবৎ কর্ম্ম ও তজ্জনিত ভোগ ঈশ্বরে অর্পণ করিবে। ভক্ত ও ভজনীয়ে পার্থক্যবোধ অপনয়ন এই সাধনার উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন—সকলই যখন ঈশ্বরের অন্তর্গত, পার্থক্যবোধের অবকাশ কোথায় ?

উত্তর—অহঙ্কারে। অহঙ্কার দেহাদি উপাধিতে আত্মবোধ। উহা সঙ্কীর্ণতা, সুতরাং কামনার অজস্র উদ্ভব উহাতে হয়।

প্রশ্ন—দেহাবচ্ছিন্ন পুরুষের পক্ষে অহঙ্কারের অধিকার অতিক্রম করা কি সম্ভব ?

উত্তর—দেহস্থ আত্মা অসঙ্গ ও অবিকারী অথচ অন্তরতম, সুতরাং তাঁহার ধ্যান অহঙ্কারের নিগড় শিথিল করে। তখন কর্ম্মযোগের অভ্যাস সুকর হয়।

---

(১) গীতা ৬।৩০,৩১

প্রশ্ন—অনাসক্ত চিত্তে কর্ত্তব্যপালন ব্যতীত ঈশ্বরে কর্ম্ম ও ভোগ অর্পণ আদিষ্ট হইয়াছে। তাহার আবশ্যক কি ?

উত্তর—নিবেদন ব্যতীত যোগ সম্পূর্ণ হয় না। জীবদেহে আত্মা অক্রিয় ও পক্ষপাতবর্জ্জিত, অর্থাৎ সুকৃতি ও দুষ্কৃতির, সুখ ও দুঃখের সাক্ষিমাত্র, অথচ বিষয় ব্যবহারের বিরাম নাই। সুতরাং যিনি বিষয় ও করণবর্গের স্রষ্টা ও প্রভু, কর্ম্ম ও ভোগ প্রকৃতপক্ষে তাঁহার, আর তিনিই সাক্ষিরূপে প্রতি জীবে বিদ্যমান থাকায় তাহারা প্রকট বা বাস্তব হয়। অতএব তাঁহাকে কর্ম্ম ও ভোগ নিবেদন ন্যায্য।

প্রশ্ন—নিবেদন করে কে ?

উত্তর—জীবচিত্ত; সাধারণতঃ তাহা কামনার দৌরাত্ম্যে বিক্ষিপ্ত ও কলঙ্কিত। কিন্তু যোগযুক্ত হইলে তাহা বিশুদ্ধ হয়, দেহও নানাবিধ উপদ্রবের কারণ হয় না, আর ইন্দ্রিয়গণ বিষয়ের অযথা সন্ধান ত্যাগ করে(১)।

প্রশ্ন—শ্রীকৃষ্ণ কি যোগযুক্ত ?

উত্তর—তিনি ধর্ম্মের ইতিহাস রচনা করেন নাই, মোক্ষার্থীকে তত্ত্বদর্শীর মত উপদেশ দিয়াছেন। গীতায় তাঁহাকে যোগেশ্বর বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ তিনি কর্ম্মযোগের প্রবর্ত্তক। সুতরাং অন্ততঃ উপদেশ প্রদানকালে তিনি যোগযুক্ত ছিলেন।

প্রশ্ন—তাঁহার আচরণ কিরূপ ?

উত্তর—মহাভারতে দেখি, তাঁহার জীবন কর্ম্মময়; দুষ্টের দমনে ও শিষ্টের পালনে তিনি সতত প্রবৃত্ত; আর তিনি নিজেও বলিয়াছেন, জন্মান্তরে ইহাই তাঁহার ব্রত ছিল ও থাকিবে(২)।

প্রশ্ন—এইরূপে ধর্ম্মসংরক্ষণ পুণ্যকর্ম্ম বটে; কিন্তু পুণ্যও

---

(১) গীতা ৫।৭ (২) গীতা ৪।৭, ৮

অপুণ্যের মত বন্ধনের হেতু হয় ; সুতরাং উপদেশে বা আচরণে মুক্তির সন্ধান কোথায় ?

উত্তর—কর্তৃত্ববোধ তাঁহার নাই, কর্ম্মফলেও তিনি নিস্পৃহ(১) ; আর কর্ম্মযোগের ব্যাখ্যায় এই দুইটি ঈশ্বরের উদ্দেশে ত্যাগ করিতে বলা হইয়াছে। কর্তৃত্বাভিমান ও কামনা বন্ধনের প্রকৃত হেতু ; কর্ম্ম তাহা নহে(২)। অতএব তাঁহার ব্যবহারে বা উপদেশে মুক্তির বিরোধী কিছু নাই।

প্রশ্ন—উক্ত দ্বিবিধ ত্যাগ ব্যতীত মুক্তির জন্য অন্য কি আবশ্যক ?

উত্তর—ঈশ্বরে অনন্যা, অচলা ভক্তি(৩)।

প্রশ্ন— এই মুক্তি কিরূপ ?

উত্তর—ঈশ্বরের সহিত চিরতরে নিরন্তরাল মিলন। গীতায় ইহাকে ব্রহ্মনির্ব্বাণ(৪) ও ঈশ্বরপ্রাপ্তি(৫)বলা হইয়াছে।

প্রশ্ন—ভক্ত ও ভজনীয়ে ভেদবোধ অনিবার্য্য নহে কি ?

উত্তর—অপরা ভক্তিতে ভেদবোধ অনিবার্য্য বটে। দেবপূজায় তাহার পরিচয় পাই, আর তাহা সঙ্গত, কারণ দেব ও মানব পৃথক্ সত্তা। কিন্তু যিনি সর্ব্বময় ও সর্ব্বনিয়ন্তা তাঁহাকে আত্মনিবেদনই সত্যের অকুণ্ঠ অঙ্গীকার।

প্রশ্ন—সত্যের প্রতি চিত্তের অনুরাগ স্বাভাবিক ; তথাপি এই অঙ্গীকার কঠিন হয় কেন ?

উত্তর—অহঙ্কার ও কামনার ইঙ্গিতে ঈশ্বর সম্বন্ধে অযুক্ত ধারণা পোষণ করা হয়, অথচ ইহাদিগকে বর্জ্জন করা কঠিন।

প্রশ্ন—শ্রীকৃষ্ণ নরদেহধারী ; তাঁহার শক্তি ও সামর্থ্য সঙ্কীর্ণ ; ধর্ম্মসংরক্ষণেও তাঁহার সাফল্য সম্পূর্ণ হয় নাই ; তথাপি

(১) গীতা ৪।১৩,১৪ (২) গীতা ৪।১৮-২২ (৩) গীতা ১২।২,৬
(৪) গীত ২।৭২, ৫।২৪-২৬ (৫) গীতা ৪।৯, ৯।২৮, ১১।৫৫, ১২।৮, ১৮।৫৫

তিনি আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। এই অসঙ্গতির মীমাংসা কিরূপ?

উত্তর—উপদেশ প্রদানকালে তিনি যোগযুক্ত ছিলেন, অর্থাৎ ঈশ্বর সম্বন্ধে পূর্ণ ও নির্দ্দোষ জ্ঞান তাঁহার হইয়াছিল। কিন্তু অহঙ্কার ও মমতা থাকিতে এবংবিধ প্রজ্ঞালাভ অসম্ভব, কারণ তাহারা ঈশ্বরের সর্ব্বময়ত্ব ও সর্ব্বাধিষ্ঠাতৃত্ব প্রত্যাখ্যান করে। সুতরাং অন্ততঃ সাময়িক ভাবে তাঁহার ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য বিলুপ্ত হইয়াছিল; তিনি আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া জানিয়াছিলেন ও প্রচার করিয়াছিলেন।

প্রশ্ন—কর্ম্মযোগের অভ্যাসে এই অবস্থা আয়ত্ত হয় কি?

উত্তর—সকল জীবেই ঈশ্বর বা পরমাত্মা সমভাবে বর্ত্তমান, সুতরাং তাঁহার সহিত যোগ অসাধারণ ব্যাপার নহে। কিন্তু সাধারণ মানব উপাধির সঙ্কীর্ণতা অতিক্রম করে না; সুতরাং তুচ্ছ বিষয়ের প্রতি অনুরাগ ও বিদ্বেষ পরমাত্মার অনুপম ঔদার্য্য ও শান্তি আবৃত রাখে। ইহাই সংসারবন্ধন, যোগ সম্বন্ধে অজ্ঞতা বা পরমার্থ দৃষ্টিতে যোগের অভাব। মুক্তিকামী এই বন্ধন ছিন্ন করিবার জন্য ভাবী সুখ-দুঃখে উপেক্ষাপূর্ব্বক কর্ত্তব্যপালনে রত থাকেন অথচ কর্ম্ম ও ভোগ ঈশ্বরে অর্পণ করেন। আর ঈদৃশ সাধনার ফলে তাঁহার চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে, পরমাত্মার পূর্ণ প্রকাশ সেই চিত্তে হয়। ইহাই যোগযুক্ত ভাব। পরমাত্মার অধিষ্ঠান পূর্ব্বেও ছিল; কিন্তু চিত্তের মোহ, দেহের জড়তা ও ইন্দ্রিয়ের চাঞ্চল্য সম্যক্ অবধারণের অন্তরায় হইত। সুতরাং যোগযুক্ত অবস্থা প্রকৃতপক্ষে জীবের উন্নয়ন, ঈশ্বরের অবতরণ নহে। এই অবস্থায় সেই উন্নত জীব নিজ কর্ম্মে ও ঈশ্বরের প্রকাশে প্রভেদ করেন না, সুতরাং কর্ম্ম সত্ত্বেও নিরবচ্ছিন্ন শান্তির অধিকারী হন।

প্রশ্ন—জীব ও ব্রহ্মে এই প্রকার অভেদকল্পনা ধর্ম্মবিরুদ্ধ ধৃষ্টতা নহে কি ?

উত্তর—অভিন্নতা কল্পনা নহে ; বরং ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যই কল্পিত। ব্যবহারে অন্তরস্থ আত্মার অকর্তৃত্ব ও নির্লেপ উপলব্ধি করিলে এই সত্য হৃদয়ঙ্গম হয়। বৈদিক মহাবাক্য চতুষ্টয়ে এই অভেদবোধের অভ্যাস আদিষ্ট হইয়াছে, আর অন্যান্য ধর্ম্মের ইতিহাসেও দেখি মহাপ্রাণ প্রবর্ত্তক অভিন্নতার অনভূতি সময়ে সময়ে প্রচার করিয়াছেন। বস্তুতঃ জীব ও ঈশ্বর পৃথক্ সত্তা হইলে, শাস্তির ভয়ে বা পুরস্কারের আশায় ঈশ্বরের আদেশ পালন সম্ভব হইত, কর্ম্মযোগ সম্ভব হইত না, অথচ ইহাই গীতার মুখ্য উপদেশ।

প্রশ্ন—দর্শনে পরমাত্মা ও জীবাত্মায় ভেদ করা হয় ; ভক্তি-শাস্ত্রেও ব্রহ্ম ও জীবে ভেদ স্বীকৃত। অতএব এই ভেদ অস্বীকার করিবার পক্ষে যুক্তি কি ?

উত্তর—জীব ও ব্রহ্মে ভেদ গীতায় প্রত্যাখ্যাত হয় নাই, আর জ্ঞান ও শক্তির তারতম্য লক্ষ্য করিয়া জীবাত্মাকে পরমাত্মার অংশ বলা হইয়াছে(১)। কিন্তু আত্মা ও পরমাত্মা স্বরূপে একই, কারণ সমজাতীয় পদার্থের মধ্যে ভেদ দেশে বা কালে বা গুণে হয়, অথচ আত্মা পরমাত্মার মতই দেশ-কালাতীত ও নির্গুণ ; কেবল উপাধির বেষ্টন ভেদ রচনা করে। ভক্তিশাস্ত্রের নির্দ্দেশ অনুসারে ব্রহ্ম বিরাট ও জীব ক্ষুদ্র, ব্রহ্ম আশ্রয় ও জীব আশ্রিত ; কিন্তু এই নির্দ্দেশ গীতায় অনাদৃত হয় নাই। বস্তুতঃ বিশ্বরূপের বর্ণনায় ইহারই উজ্জ্বল-চিত্র দেওয়া হইয়াছে।

(১) গীতা ১৫।৭ (২) গীতা ২।৭২,৫।২৪-২৬

প্রশ্ন—গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের কতিপয় শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও কর্ম্মের যে বর্ণনা আছে, তাহার প্রকৃত অর্থ কি ?

উত্তর—শ্লোকগুলিতে বলা হইয়াছে,—তিনি জন্মরহিত ও অব্যয়, স্বদেহে তাঁহার অধিষ্ঠান হইলেও তিনি সকল প্রাণীর নিয়ন্তা, ধর্ম্ম বিপন্ন হইলে প্রতিকারার্থ তাঁহার প্রকাশ হয়, বস্তুতঃ এই কারণে তিনি যুগে যুগে আবিভূর্ত হন, অথচ তাঁহার আবির্ভাব প্রহেলিকার মত যেহেতু প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে অবশভাবে তাঁহার উৎপত্তি হয় না (১)। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও মৃত্যু উভয়ই হইয়াছিল, আর সকল প্রাণীর নিয়ন্তা হওয়া ত দূরের কথা, জরাসন্ধ কর্ত্তৃক তিনি বার বার লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন, শিশুপাল ও দুর্য্যোধন তাঁহার অপমান করিয়াছিল। সুতরাং প্রকৃত প্রশ্ন এই,—তাঁহার আত্মপরিচয় ও অভিজ্ঞতায় সামঞ্জস্য কোথায় ? ইহার উত্তরের জন্য বাহ্য ঘটনাবলী উপেক্ষা করিয়া তাঁহার পবিত্র অন্তরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। তথায় নিত্য ও সর্ব্বগত পরমাত্মার অধিষ্ঠান বা পূর্ণ প্রকাশ হইয়াছিল; সুতরাং বৃষ্ণিবংশীয় কৃষ্ণ গৌণ নিমিত্তমাত্রে পরিণত হইয়াছিলেন। ইহাই অলৌকিক ব্যাপার, আর ইহার প্রেরণায় যে সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তাহারাও অলৌকিক, কারণ কর্ত্তৃত্বাভিমান ও কর্ম্মফলের জন্য ব্যগ্রতা থাকে নাই। অন্য মানবের হৃদয়েও পরমাত্মা অধিষ্ঠিত বটে, কিন্তু মলিন চিত্ত তাহা উপলব্ধি করে না, সুতরাং প্রকৃতির বশে অর্থাৎ সঙ্কীর্ণ সুখদুঃখের চিন্তায় তাহার দিনপাত হয় (২)। ইহাই প্রকৃত ব্যর্থতা। আপত্তি হইতে পারে, শ্রীকৃষ্ণের কর্ম্মও সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই, কারণ তাঁহার আত্মীয়গণের দুর্ব্যবহারে তাঁহার সাধু উদ্দেশ্য ব্যর্থ

(১) গীতা ৪।৬-৮ (২) গীতা ৭।২৭

হইয়াছিল। কিন্তু ঈশ্বরের প্রকাশ কোন বিশেষ দেশে বা কালে সম্পূর্ণ না হইলেও প্রত্যেক তথাকথিত ব্যর্থতায় সাফল্যের বীজ নিহিত থাকে।

প্রশ্ন—অন্তরে ঈশ্বরের প্রকাশ উপলব্ধি করিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্থিতপ্রজ্ঞ ও বলীয়ান হইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাকে অবতার বলায় আপত্তি কি?

উত্তর—আপত্তি নাই। কিন্তু এ বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের উক্তি স্মরণ রাখিতে হইবে। তিনি বলিয়াছেন, বহু মানব অনুরাগ, বিদ্বেষ ও ভয়ের অতীত হইয়া ঈশ্বরকে অনুক্ষণ স্মরণ করিতেন ও তাঁহার আশ্রয় ভিক্ষা করিতেন ; ফলে পরমাত্মাকে অন্তরে পাইয়া তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের মতই হইয়াছিলেন(১)। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকে অবতার বলিলে সেই সকল যোগযুক্ত মহাপুরুষকেও অবতার বলা উচিত। তাঁহাদের মহীয়সী সাধনা লক্ষ্য করিয়া আমরা উক্ত পরিণতিকে জীবের উর্দ্ধগতি বলিয়াছি। পরন্তু তাঁহাদের সিদ্ধি বা ঈশ্বরের সান্নিধ্যলাভ লক্ষ্য করিলে ইহাকে ঈশ্বরের অবতরণ বলাও যায়। যাহা হউক, অভিপ্রায় এই :- মলিন ও বিক্ষিপ্ত চিত্ত ঈশ্বর সম্বন্ধে অযুক্ত ও অস্পষ্ট ধারণা পোষণ করে বলিয়া কোন উর্দ্ধলোকে তাঁহার অবস্থান কল্পিত হয়, অথচ সেই চিত্ত সাধনার প্রভাবে শান্ত ও নির্ম্মল হইলে ঈশ্বরের সামীপ্য অনুভব করে, আর ইহাকেই জীবের উন্নয়ন বা ঈশ্বরের অবতরণ বলা হয় ; বস্তুতঃ সর্ব্বগত ও সর্ব্বাতিশায়ী তত্ত্বের অন্য প্রকার অবতরণ সম্ভব নহে।

প্রশ্ন—শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণব্রহ্ম বা তাঁহার অবতার না হইলে ভক্তের কল্যাণার্থ আপনার পূজার আদেশ বার বার দিবেন কেন?

(১) গীতা ৪।১০

উত্তর—উপচারে বাহুল্যবর্জ্জন পূর্ব্বক ভক্তি নিবেদনার্থ পূজার বিধান গীতায় আছে বটে(১)। কিন্তু কাহার পূজা? সপ্তম ও নবম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে,—ঈশ্বর ইন্দ্রিয়ের অগোচর ও প্রাণিজাতের পরম আশ্রয়, সুতরাং মূঢ় ব্যক্তিই মনে করে তিনি মানুষী তনু গ্রহণ করিয়াছেন, এই ধারণায় তাঁহার অবমাননা হয় (২)।

প্রশ্ন—অবতারত্বের ব্যাখ্যায় কেহ কেহ বলেন, ব্যক্তি-বিশেষের দেহে ঈশ্বরের আবেশ হওয়ায় অসামান্য জ্ঞান ও শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এই আবেশবাদ কি শাস্ত্রসঙ্গত?

উত্তর—ইহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে, ঈশ্বর সর্ব্বভূতে সমভাবে বর্ত্তমান আর এই তত্ত্ব উপলব্ধি করিলে জীব মুক্তির পথে অগ্রসর হয়(৩)। তিনি চৈতন্যস্বরূপ; চৈতন্যের কি ন্যূনাধিক্য সম্ভব? আবেশবাদ কেবল অসিদ্ধ নহে, ইহা সাধনার মহিমা ক্ষুণ্ণ করে।

উপসংহার

এ পর্য্যন্ত ধর্ম্মের আলোচনায় শাস্ত্রই আমাদিগের অবলম্বন হইয়াছে, আর বেদ, সাংখ্য ও গীতায় যে মর্ম্মান্তিক বিরোধ নাই তাহা প্রতিপন্ন করিতে যত্নবান হইয়াছি। হিন্দু ধর্ম্মের আকার এই ত্রিবিধ শাস্ত্রে পরিস্ফুট; সুতরাং ইহাদিগের মধ্যে সঙ্গতি প্রদর্শন ন্যায্য উদ্দেশ্য মনে করি। সমালোচক সাম্প্রদায়িক বিসংবাদের প্রতি সাধারণতঃ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাহা বোধ হয় চিরকালই অল্পবিস্তর ছিল ও থাকিবে, কারণ প্রচারক স্বীয় প্রকৃতি ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুসারে ধর্ম্মের

(১) গীতা ৯।২৬ (২) গীতা ৭।২৪, ৯।১১ (৩) গীতা ১৩।২৭, ২৮

ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে এই কলহের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলা হয়,—ধর্ম্মে প্রগাঢ় বিশ্বাস একতা ও উন্নতির পক্ষে অন্তরায়, সুতরাং প্রাচীন বলিয়া তাহার প্রতি সাধারণ দাক্ষিণ্যই যথেষ্ট। পরন্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ই মুখ্য আলোচ্য, যেহেতু তাহার অবধারণ নিশ্চিত হয় আর তাদৃশ অবধারণের ফলে মানব উত্তরোত্তর উন্নতি করে, অথচ অতীন্দ্রিয় বিষয়ের অনুসন্ধান প্রীতিকর হইলেও ব্যবহারে তাহার বিশেষ সার্থকতা নাই, সুতরাং ধর্ম্মে আগ্রহাতিশয্য বাঞ্ছনীয় নহে। আমরা কিন্তু ধর্ম্মকে মানবের শ্রেষ্ঠ সম্বল মনে করি, আর ধর্ম্মই যে ব্যবহারকে সংযত বা সঙ্গত করিতে সক্ষম, এ বিশ্বাসও রাখি। অতএব উক্ত প্রবল ও বিরুদ্ধ মনোভাব লক্ষ্য করিয়া আরও কয়েকটি কথা বলিব। সম্ভবতঃ কিছু পুনরুক্তি হইবে। কিন্তু বর্ত্তমান দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিবাদে তাহা অনাবশ্যক বোধ হয় না।

জড়বিজ্ঞানের সীমা ও পদ্ধতি সম্বন্ধে এই প্রকরণে কিছু বলিব, কারণ কোন কোন বিজ্ঞানাচার্য্য অধ্যাত্মবিদ্যার সমুচিত আদর করেন না। উপযোগিতাবাদেরও উল্লেখ থাকিবে, যেহেতু তাহার মূল অধ্যাত্মজ্ঞানে। কিন্তু এই সুদীর্ঘ ভূমিকায় শাস্ত্রীয় উপদেশই এপর্য্যন্ত আলোচিত হইয়াছে, আর গীতার বাণী সেই আলোচনায় কেন্দ্ররূপে গ্রহণ করিয়াছি। সুতরাং গীতার মূলমন্ত্রটি লইয়া এই প্রাসঙ্গিক আলোচনাও আরম্ভ করিব।

ঈশ্বর সকল জীবের অন্তরে আছেন আর তাহাদিগের যাবতীয় চেষ্টা ও ভোগ তিনিই নিয়ন্ত্রিত করেন। অতএব স্বাতন্ত্র্যের অভিমান আর বিষয়ে অনুরাগ ও বিদ্বেষ সাবধানে পরিহার করিও। সুখে ও দুঃখে, চিন্তায় ও কর্ম্মে তিনিই

(৪) গীতা ১৩।২৭,২৮ গীতা (৩) ৭।২৪, ৯।১১

আশ্রয়, তোমার অন্য অবলম্বন নাই,—এই প্রতীতি চিত্তে বদ্ধমূল ও ফলপ্রসূ হইলে, উদ্বেগ ও মনস্তাপের অবকাশ থাকিবে না; পরন্তু তুমি সর্ব্ববিধ বিপর্য্যয়ের অতীত হইবে (১)। গীতার মুখ্য উপদেশ এইরূপ আর ইহা একাধিকবার মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় প্রদত্ত হইয়াছে।

শরণাপত্তির এই মহিমা কি সাধারণ অভিজ্ঞতা ও আচরণে স্বীকৃত? গীতার মতে যাহারা শ্রদ্ধাহীন ও ইন্দ্রিয়সংযমে অনভ্যস্ত, তাহাদিগের পক্ষে ইহার ধারণা করাও কঠিন। ইন্দ্রিয়গ্রাম অনিত্য রূপরসাদির গ্রাহক, সুতরাং নিত্য ও নির্ব্বিকার ভাব সম্বন্ধে স্বভাবতঃ নীরব। ঈশ্বরের নিয়ন্তৃত্বও কারণকার্য্যপরম্পরায় আবৃত। বস্তুতঃ এই আবরণ লক্ষ্য করিয়া গীতা বলিয়াছেন,—সূত্রধার যেরূপ রঙ্গমঞ্চের নিম্নে স্বয়ং অলক্ষিত থাকিয়া দারুময় পুত্তলিকাগুলিকে ইতস্ততঃ সঞ্চালিত করে, জীবের কর্ম্মে ও ভোগে ঈশ্বরের অধিনায়কত্ব সেইরূপ অর্থাৎ অলঙ্ঘ্য অথচ দুর্ব্বিজ্ঞেয়।

তবে কি সূক্ষ্ম বিচারে গীতার শাসন প্রতিষ্ঠিত? গীতা বিচারে গুরুত্ব আরোপ করেন নাই, কারণ মানব জন্মাবধি রাগদ্বেষের বশীভূত হওয়ায় তাহার সিদ্ধান্ত ভ্রমপ্রমাদশূন্য হয় না, অর্থাৎ ঈশ্বরবিষয়ক ধারণা সদোষ কিংবা সঙ্কীর্ণ হয় (২)। কিন্তু সতত পুণ্যাচরণের ফলে চিত্ত নির্ম্মল, শান্ত ও শ্রদ্ধাযুক্ত হইলে সেই শ্রদ্ধা ও পবিত্রতাই তত্ত্ব প্রকাশ করে, আর তখন যুক্তিতর্কের অপেক্ষা থাকে না। অথচ এই প্রকাশের তুল্য জ্ঞান নাই, কারণ ইহার প্রভায় সর্ব্ববিধ ভ্রম ও সংশয় অপনীত হয়।

আপত্তি হইতে পারে,—প্রত্যক্ষে যাহার নির্দ্দেশ নাই,

(১) গীতা ১৮।৬১,৬২ (২) গীতা ৭।২৭

অনুমান যাহা সমর্থন করে না, তাদৃশ বাণী কি সংসারযাত্রায় পথপ্রদর্শক হইবার যোগ্য ? কিন্তু প্রত্যক্ষ কাহাকে বলিব ? ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান প্রকৃতপক্ষে পরোক্ষ, যেহেতু তাহাতে জটিল প্রক্রিয়ার অপেক্ষা থাকে। বহির্জ্জগতে স্পন্দনবিশেষ চক্ষু-গোলকে আঘাত করিলে, সেই আলোড়ন স্নায়বিক তন্তুপথে সংলগ্ন স্নায়ুকোষে প্রসৃত হয়; তখন রূপবোধ হইয়া থাকে। শারীরিক বিকার কিংবা অতিরিক্ত উত্তেজনা উপযুক্ত বাহকের সাহায্যে স্নায়ুকেন্দ্রে বিক্ষোভ সৃষ্টি করে; ফলে বেদনা বা দুঃখ অনুভূত হয়। প্রথম দৃষ্টান্তে বাহ্যস্পন্দন ও রূপজ্ঞানে একান্ত সান্নিধ্য নাই; দ্বিতীয়টিতেও দেহের ক্ষতি ও যাতনাবোধে সামীপ্যের অভাব। তাবৎ ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানই এইরূপ; সুতরাং বিষয় ও উহার মানসিক আলেখ্যে যে পূর্ণ সঙ্গতি থাকে তাহা বলা কঠিন। বস্তুতঃ অন্তরীক্ষে স্পন্দন ও দীপ্তির অনুভবে সাদৃশ্য কোথায় ? যন্ত্রণায় কি দৈহিক ক্ষতির যথাযথ পরিচয় পাওয়া যায় ?

সত্য বটে, তথাকথিত প্রত্যক্ষের এতাদৃশ ত্রুটি অনুমানে যথাসম্ভব সংশোধিত হয়। দর্শনে ও পদার্থবিজ্ঞানে অনুমানের বিশেষ বিকাশ আর বিবিধ শিল্পে ইহার সার্থক প্রয়োগ। কিন্তু ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানই ইহার উপাদান, সুতরাং ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থের ব্যাখ্যায় ইহার সঙ্গত অধিকার। পূর্ব্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতোদৃষ্ট, এই ত্রিবিধ অনুমান তর্কশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ, আর সত্য নির্ণয়ে ইহারাই দর্শনেরও সম্বল। কিন্তু প্রথম দুইটি যে দৃশ্যজাতের আবেষ্টন লঙ্ঘন করে না, তাহা স্বীকৃত। আর তৃতীয়টি দেশকালাতীত তত্ত্বের অন্বেষণে প্রযুক্ত হইলেও, উহার নির্দ্দেশ স্পষ্ট বা প্রামাণিক হয় না। শেষ উপায় বিশ্লেষণ; কিন্তু পদার্থবিদ্যায় আর মনোবিজ্ঞানে

ইহা নূতন নূতন তথ্য প্রকাশ করিলেও, যাহা দেশ ও কালের অতীত তাহার বিশ্লেষ অসম্ভব। সুতরাং পরমার্থের নির্দ্দেশ কেবল অনুমানে ও বিশ্লেষণে নাই।

জড়বাদী বলেন, পরমার্থ ইহজীবনেই লভ্য, আর দ্রব্য-সম্ভারের সঞ্চয় তাহার মুখ্য সাধনা। পরমার্থ লাভ যে মর্ত্ত্য-লোকে সম্ভব তাহা হিন্দুশাস্ত্রও স্বীকার করেন। বৃহদারণ্যক বলিয়াছেন, উপযুক্ত সাধনার ফলে মানবদেহেই ব্রহ্ম লাভ হয়(১)। গীতার মতে সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি অভ্যাস করিলে দেহ-ত্যাগের পূর্ব্বেই দুঃখময় সংসারের অতীত হওয়া যায়(২)। আর সাংখ্য জীবন্মুক্তগণের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, তাঁহারাই পরমার্থের প্রকৃত উপদেষ্টা(৩)। কিন্তু বিষয়ের উপাসনা কোন শাস্ত্রে অনুমোদিত হয় নাই; বরং বিষয়-বৈরাগ্য সর্ব্বত্র আদিষ্ট হইয়াছে। বিষয়জ্ঞানও জ্ঞান বটে, সুতরাং ব্যবহারে শ্রেষ্ঠ ভাব, অর্থাৎ বিষয়সংগ্রহ কিংবা প্রমাদ ও আলস্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। কিন্তু আর্থিক উন্নতির মত ইহা চিরদিনই অসম্পূর্ণ থাকিবে। আর প্রভাববিস্তারের উপায়রূপে ইহাকে যথেচ্ছ প্রয়োগ করিলে ফল যে বিষময় হয় তাহা মানবসমাজের বর্ত্তমান দুর্গতি হইতে অনায়াসে অনুমেয়। সুতরাং আমরা বলি, পরমার্থ বা নিরবচ্ছিন্ন শান্তি এ পথে নহে।

তথাপি বিষয়বৈরাগ্য উপদেশ দেওয়ায় উপনিষৎ, সাংখ্য ও গীতা জড়বাদীর বিরাগভাজন হইয়াছে, যেহেতু তাঁহার মতে বিষয়বৈরাগ্যই হিন্দুর অধোগতির মুখ্য কারণ। পৃথিবী সুখময় জীবনযাত্রার উপকরণে পূর্ণ, শক্তিসঞ্চয়ের সুযোগও ইহাতে যথেষ্ট। আর যে বিরাট বিশ্বের ইহা অংশ তাহার কালব্যাপী

(১) বৃহদারণ্যক ৪।৪।১৪ (২) গীতা ৫।১৯ (৩) সাংখ্যসূত্র ৩।৭৮,৭৯

অস্তিত্ব সম্বন্ধে সংশয় নাই। সুতরাং কতিপয় অধ্যাত্মবাদীর কপোলকল্পিত চিন্তাজালে আবদ্ধ হইয়া হিন্দু পার্থিব সম্পদের অনাদর করায় সত্যের অপলাপ ও স্বার্থের হানি উভয়ই ঘটিয়াছে। এখন উদ্ধারের উপায় পদার্থবিজ্ঞানের অনন্যচিত্তে অনুশীলন ও আবিষ্কৃত তথ্যের শিল্পে সম্যক্ প্রয়োগ,—জড়বাদীর পরামর্শ এইরূপ। আমরা এই পরামর্শের প্রতিবাদে অতি সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলিতেছি।

উপনিষদের যুগে অধ্যাত্মবিদ্যা যে অন্যান্য বিদ্যার পরিপন্থী ছিল না, তাহা নারদ ও সনৎকুমারের সংবাদে দেখি। অধীত শাস্ত্রের গণনায় নারদ গণিত, জ্যোতিষ, প্রাণিবিদ্যা, ধনুর্ব্বেদ, অর্থশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র ও তর্কশাস্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন(১)। আর সনৎকুমারের উপদেশে সঙ্কল্প, জ্ঞান, বল ও উদ্যমের প্রশংসা আছে, যদিও ভূমার জ্ঞান নিরতিশয় সুখের আকর বলিয়া ঋষি তাহাকেই বিবিধ জ্ঞানের মধ্যে শীর্ষস্থান দিয়াছেন(২)। বিজ্ঞানের বর্ত্তমান প্রসারের তুলনায় নারদের তালিকা সঙ্কীর্ণ, সন্দেহ নাই। কিন্তু মুক্তিকামী নারদ বিষয়জ্ঞানকে হেয় বোধে যে উপেক্ষা করেন নাই, তাহাও সত্যের অনুরোধে স্বীকার করিতে হয়। সাংখ্যে মনোবিজ্ঞানের উৎপত্তি হয়, আর তথাকথিত জড়জগৎ যে অনুভূতির অতীত নহে তাহা সাংখ্যই প্রথম সবিস্তারে প্রতিপাদন করিয়াছিলেন। কোন্ অভিজ্ঞতা বা যুক্তির বলে জড়বাদী এই তত্ত্বকে অশ্রদ্ধেয় মনে করেন? গীতার বাণীতে ও বৌদ্ধধর্ম্মে সাংখ্যের নির্দ্দেশ অনাদৃত হয় নাই, অথচ গীতায় যাবতীয় কল্যাণকর কর্ম্ম আদিষ্ট হইয়াছে আর বৌদ্ধযুগে বিজ্ঞান, শিল্প ও বাণিজ্য অভূতপূর্ব্ব উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। অতএব

(১) ছান্দোগ্য ৭।১।২ (২) ছান্দোগ্য ৭।৪,৭,৮, ২৩

নিঃসঙ্কোচে বলি, অধ্যাত্মবিদ্যা ও পদার্থবিজ্ঞান পরস্পরবিরুদ্ধ নহে।

জড়বাদী বিশ্বের বাস্তবতা উচ্চকণ্ঠে প্রচার করিলেও তাহার সম্পূর্ণ বা সঙ্গত ব্যাখ্যা দিতে পারেন নাই। পদার্থবিজ্ঞানের সিদ্ধান্তে তাঁহার দর্শন প্রতিষ্ঠিত, অথচ সৃষ্টিতত্ত্বের সম্যক্ আলোচনায় পদার্থবিজ্ঞান কদাচিত প্রবৃত্ত হইয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ল্যাপ্‌লাস বলিয়াছিলেন ;—কোন নীহারিকার আবর্ত্তনে ও সঙ্কোচনে গ্রহ ও উপগ্রহ উদ্‌গত হয় আর নীহারিকার অবশিষ্টাংশ সূর্য্যের আকার ধারণ করে ; তদবধি তাহারা সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তিত হইতেছে। কিন্তু ইহা কেবল সৌরজগতের উৎপত্তি সম্বন্ধে গবেষণা, আর ইহাতে জ্যোতিষ্কগুলির গতির সন্তোষজনক ব্যাখ্যা নাই। পরে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে অন্য মতবাদ প্রচারিত হয় ; কিন্তু তাহাতে সৃষ্টির পূর্ব্বেই একটি খণ্ডপ্রলয় কল্পনা করা হয়, তথাপি রহস্যভেদ সম্পূর্ণরূপে হয় না। সুতরাং জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ বলিতেছেন জ্যোতিষ্কগুলির দূরত্ব, আকৃতি ও গতি নির্ণয় করাই তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য, যদিও কৌতূহলনিবৃত্তির জন্য তাঁহারা উৎপত্তি সম্বন্ধে জল্পনাকল্পনা করিয়া থাকেন। জড়বাদের ভিত্তি বৈজ্ঞানিক তথ্য, আর তাহার মুখ্য সিদ্ধান্ত জড়েই জ্ঞানের উৎপত্তি, অথচ প্রধান জড়পদার্থগুলির উৎপত্তি সম্বন্ধে গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা দিতে তাহা অক্ষম। হিন্দুশাস্ত্র অন্য পথে সমস্যাটির সম্মুখীন হইয়াছে, আর তুলনার জন্য তাহার সমাধান নিম্নে দিলাম। জ্ঞানে বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় হয় ; ভানু, গ্রহ ও উপগ্রহ মণিমালায় মণিগুলির মত একই সূত্রে গ্রথিত, আর সেই সূত্র জ্ঞান ; তাহাদিগের অনুবন্ধের অন্য কারণ সম্ভব নহে, অথচ

জ্ঞানে তাহাদিগের অবস্থান বলিলে তাহাদিগের বাস্তবতা ক্ষুণ্ণ হয় না, কারণ জ্ঞানের মত বাস্তব বা সন্নিহিত কিছুই নাই; ব্যক্তিগত বা দেহাবচ্ছিন্ন জ্ঞানে তাহাদিগের উদ্ভব ও অবস্থান নহে সত্য, কিন্তু দেহাবচ্ছিন্ন জ্ঞান পরম জ্ঞানের অংশমাত্র, আর সেই পরম জ্ঞানে বিচিত্র ও বিচ্ছিন্ন অথচ বোধাত্মক জ্যোতিষ্ক-সমূহ গতি বা পরিণাম ও নিরাপত্তা উভয়ই লাভ করিতেছে।

বিশ্বের কথা বলিলাম। স্থাবর ও জঙ্গম, হয়ত, উহার সর্ব্বত্র আছে। কিন্তু জড়বাদ এই প্রকরণে দৃষ্টি সঙ্কুচিত করিয়াছেন, কারণ কেবল পৃথিবীস্থ উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর গঠন ও ব্যবহার সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব। প্রাচীন অধ্যাত্মচিন্তার বিষয় আরও সঙ্কীর্ণ, যেহেতু মানবের শুভাশুভ নির্দ্ধারণার্থ তাহার চিত্তবৃত্তিই বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে, যদিও প্রসঙ্গক্রমে আলোচনার কোন কোন অংশে ইতরজীবের উল্লেখ পাই। যাহা হউক, উভয়ের অগ্নিপরীক্ষার জন্য আমরা তাহাদিগকে অবিসংবাদী সত্যের সম্মুখীন করিব। আমাদের প্রথম প্রশ্ন,—তরুলতা ও লোষ্ট্রপ্রস্তরে প্রভেদ কি? উপাদানে বিশেষ পার্থক্য নাই, কিন্তু প্রত্যেক উদ্ভিদ্ আপনার পুষ্টির জন্য সন্নিহিত আলোক, বাতাস, জল, ও মৃত্তিকা হইতে উপকরণ সংগ্রহ করে, অথচ এই প্রবৃত্তি লোষ্ট্রাদি জড়পদার্থে নাই, কারণ সঞ্চিত তাপ ত্যাগে ও আগত তাপ গ্রহণে তাহাদিগের ক্রিয়া পর্য্যবসিত। রাসায়নিক সংযোগের ফলে উদ্ভিদের এই বৈশিষ্ট্য হয় কি? তাদৃশ সংযোগে রূপান্তর ও কিছু গুণান্তর হয় বটে, কিন্তু স্বভাবের এতাদৃশ পরিবর্ত্তন হয় না। সুতরাং এক্ষেত্রেও জড়বাদের ব্যাখ্যা অসম্পূর্ণ।

আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন পশুপক্ষী সম্বন্ধে। তাহারাও

আত্মরক্ষা ও আত্মপুষ্টির জন্য চেষ্টা করে, কিন্তু তরুলতার মত কেবল উপস্থিত বস্তুর প্রেরণায় নহে, কারণ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য তাহারা নানা স্থানে বিচরণ করে ও পরেব্যবহার্য্য কুলায়াদি নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হয়। অর্থাৎ উদ্ভিদের বর্ত্তমান সর্ব্বস্ব হইলেও ইতর প্রাণীর আচরণে অতীত ও অনাগত, স্মৃতি ও প্রতীক্ষারূপে, বর্ত্তমানের সহিত সংযুক্ত হয়। অথচ তরুলতা ও পশুপক্ষীর দেহ একই উপাদানে গঠিত আর পশুপক্ষীর বিশিষ্ট ইন্দ্রিয়গুলি ভূতভবিষ্যতের সন্ধান লয় না। সুতরাং যাঁহারা ভৌতিক দেহকে চেতনার কারণ বলেন তাঁহাদিগের গবেষণায় স্থাবর ও জঙ্গমে এই প্রভেদের ব্যাখ্যা নাই।

শেষ প্রশ্ন মানব সম্বন্ধে। মানব কখন কখন জাতির বা দেশের জন্য, এমন কি সমগ্র মানবসমাজের জন্য জীবন বিপন্ন করে, সত্যের অনুসন্ধানে ও প্রচারে সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জ্জন দেয়, ধর্ম্মাচরণে লাভালাভ চিন্তা করে না, আর ইতর প্রাণীর সেবায় রত হয়। আপত্তি হইতে পারে—এসকল সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম, মানবের প্রকৃতিগত নহে। কিন্তু ব্যতিক্রমেরও ব্যাখ্যা আবশ্যক। কোন্ অস্বাভাবিক অবস্থার প্রভাবে প্রকৃতিবিরুদ্ধ আচরণ সম্ভব হইয়াছে? এই প্রশ্নের উত্তর জড়বাদে নাই; উপযোগিতাবাদ সাধ্যমত দিয়াছে। তাহা এইরূপ:—দীর্ঘকালব্যাপী অভিজ্ঞতার ফলে সভ্য মানব জানিয়াছে, পরার্থসাধনেই প্রকৃত স্বার্থসিদ্ধি হয়। কিন্তু তাদৃশ অভিজ্ঞতা সুস্পষ্ট হইলে ব্যক্তিগত লাভালাভ বা সুখদুঃখ বোধ অপসৃত হইত, অথচ ধর্ম্মিষ্ঠও স্বার্থত্যাগে কষ্ট অনুভব করেন। পশুপক্ষীর প্রতি মমতা হয় কেন? কুটিলতা বহুক্ষেত্রেই লাভজনক, সুতরাং সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা অকারণ নহে কি? এবংবিধ প্রশ্নের উত্তরে জড়বাদী দার্শনিক

উপযোগিতাবাদের নূতন বর্ণনা দিয়াছেন। তাহা এই,—যথাসম্ভব সকলের মঙ্গলার্থ কর্ম্ম করাই যুক্তিযুক্ত কারণ তাহা কর্ত্তার পক্ষে অবশেষে কল্যাণকর হয়। কিন্তু কেন বা কিরূপে কল্যাণকর হয় তাহা তিনি বলিতে পারেন নাই, বরং প্রশ্নটিকেই উত্তররূপে দিয়াছেন।

সুতরাং বিশ্বব্যাপী সমস্যার সমাধান জড়বাদে নাই, পরন্তু অধ্যাত্ম বিদ্যায় আছে। অধ্যাত্মশাস্ত্র বলেন,—চেতনার প্রকাশ সর্ব্বত্র; জড়জগতে তাহার পরিচয় শৃঙ্খলা ও সংরক্ষণে আর জীবজগতে আত্মভাবের ক্রমবিকাশে। উদ্ভিদে তাহা আত্মপুষ্টির আকার ধারণ করে; পশুপক্ষীতে এই আত্মপরতার কিছু বিস্তার হয়, আর মানবে ইহা ক্রমশঃ পরার্থতায় পরিণত হইতে থাকে। এই বিকাশ স্বাভাবিক, অর্থাৎ জীবনিচয়ে উন্নতির ক্রম অন্য প্রকার হইতে পারে না। উদ্ভিদে আত্মবোধ প্রচ্ছন্ন, সুতরাং আকৃতির পরিপূর্ণতাই একমাত্র লক্ষ্য। পশুপক্ষীতে আত্মবোধ অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট হওয়ায় দেহের সঙ্কীর্ণতা অতিক্রম করে, সুতরাং তাহারা সঙ্গিনী ও শাবকে অনুরক্ত হয়। এই উদারতা মানবে আরও সুস্পষ্ট, অর্থাৎ আত্মভাব আরও ব্যাপক, কারণ স্বজাতি ও স্বদেশী তাহার প্রীতিভাজন হয় আর সাধনার গুণে কেহ কেহ সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি লাভ করেন। সুতরাং তত্ত্ব এই:—কেবল জড় পদার্থের সমাবেশে জীবের উৎপত্তি হয় না; স্থাবরে ও জঙ্গমে আত্মার সমভাবে অধিষ্ঠান(১), অথচ উপাধির অপকর্ষ বা উৎকর্ষ অনুসারে তাঁহার প্রকাশ সঙ্কীর্ণ বা ব্যাপক হয়। পরার্থতার ব্যাখ্যা আমরা এই তত্ত্বে পাই, জড়বাদে নহে।

---

(১) গীতা ১৩।২৬,২৭

বস্তুতঃ জড়বাদ নিকৃষ্ট দর্শন। প্রাচীন ভারতে ইহা লোকায়তবাদ নামে প্রসিদ্ধ ছিল, কিন্তু কখনই বিশেষ আদৃত হয় নাই। অধ্যাত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ ও তদনুযায়ী প্রেরণা আমরা প্রত্যেক উন্নত দর্শনে পাই। তাহার কারণ কোন না কোন অপরোক্ষ অনুভূতি এবংবিধ দর্শনের মূল ও মেরুদণ্ডস্বরূপ। কিন্তু তাহাই যথার্থ অপরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ যাহার অবধারণে মাধ্যস্থ্য বা পরনির্ভরতার লেশ নাই। আর কেবল অধ্যাত্ম চিন্তায় তাদৃশ প্রত্যক্ষযোগ্য বস্তুর সন্ধান পাওয়া যায়, যেহেতু অন্যপ্রকার জ্ঞানে সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক মনের ও পরনিষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের প্রযত্ন আবশ্যক হয়। কিন্তু অধ্যাত্মজ্ঞান জগতে বিরল; যুগযুগান্তরে কোন মহাপুরুষ তাহার অধিকারী হন। অথচ সকল উন্নত ধর্ম্মের তাহা প্রাণস্বরূপ ও তজ্জন্যই আপ্তবাক্য শাস্ত্রে প্রমাণ মধ্যে গৃহীত হইয়াছে।

আর আপ্ত বাক্যেই দর্শনেরও উৎপত্তি। ধীমান শিষ্যের কল্যাণার্থ তত্ত্বদর্শী স্বীয় পরম জ্ঞান বা ভাব বাক্যে প্রকাশ করেন। কিন্তু বাক্য নিত্য ব্যবহারের পক্ষে পর্য্যাপ্ত হইলেও তাদৃশ ভাবের সম্যক্ প্রকাশে অসমর্থ। সুতরাং ব্যাখ্যা বা বর্ণনার প্রয়োজন হয়। অধিকন্তু, বিভিন্ন অবস্থায় উপদেশের প্রয়োগ সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠে ও সংস্কার অনুসারে জিজ্ঞাসুগণ সেই উপদেশের নানাবিধ অর্থ করেন। তখন পরস্পরবিরোধ ভঞ্জন ও সংশয় অপনয়নের জন্য যুক্তিতর্কের সাহায্যে দর্শন রচিত হয়। প্রজ্ঞা দর্শনের দেয় নহে; কিন্তু তাহা শব্দযোগে ব্যক্ত হইলে, শব্দের অর্থ ও বাক্যের তাৎপর্য্য নির্দ্ধারণে দর্শন প্রযোজ্য। দর্শনের এই অধিকার ও উপযোগ স্মরণ রাখা উচিত, নচেৎ অজ্ঞেয়বাদ অপরিহার্য্য, কারণ তথাকথিত

প্রত্যক্ষ ও অনুমান অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের সন্ধানে অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে না।

সঞ্জয় বেলাত্তিপুত্ত বলিয়াছিলেন,—পরলোকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিশ্চয় জ্ঞান থাকিলে তাহা প্রচার করিতাম ও পরলোকের বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইতাম। পরন্তু পরলোক যে নাই তাহাও নিঃসংশয়ে বলিতে পারি না, যেহেতু তাহার অভাবের প্রকৃষ্ট প্রমাণ নাই। জীবের উৎপত্তি আকস্মিক ঘটনা কিংবা নিয়তির ব্যবস্থা? কর্ম্ম পুণ্য ও পাপরূপ ভাবী ফল অর্জ্জন করে কি? জ্ঞান কি অমৃতত্ব দানে সমর্থ? এ সকল প্রশ্নের সদুত্তর দানে আমি অক্ষম। বেলাত্তিপুত্তের এই অকপট উক্তিতে সাধারণ প্রমাণসর্ব্বস্ব দর্শনের সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

যাহা হউক, আপ্ত বাক্যের কতিপয় উদাহরণ লইলে তদনুগামী দর্শনের সঙ্গত ব্যবহার স্পষ্ট হইবে। উপনিষৎ বলিয়াছেন, অল্পে সুখ নাই, ভূমাতেই প্রকৃত সুখ। আর দর্শন প্রমাণ করিয়াছেন, সাধারণ অভিজ্ঞতায় সকলই আপেক্ষিক বা অনুবন্ধী, সুতরাং অল্প। সাংখ্য বলিয়াছেন, পুরুষ জ্ঞমাত্র অর্থাৎ সর্ব্ববিধ প্রকাশের হেতু হইলেও নির্লিপ্ত, পক্ষান্তরে দৃশ্যনিচয় পরস্পরসম্বদ্ধ সুখদুঃখমোহের কারণ, সুতরাং দুঃখের একান্ত ও অত্যন্ত নিবৃত্তির জন্য দৃশ্যজাত পরিহার পূর্ব্বক কৈবল্যই প্রার্থনীয়। আর বিশ্লেষণপূর্ব্বক দর্শন সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, অহংপ্রত্যয় বা সাধারণ আত্মবোধ প্রকৃত পুরুষ নহে ও বুদ্ধিপ্রভৃতি করণবর্গ চেতনাযুক্ত হইলেও দৃশ্যমধ্যেই গণ্য। গীতা বলিয়াছেন, জীব কর্ত্তা ও ভোক্তারূপে প্রতীত হইলেও বস্তুতঃ সর্ব্বতোভাবে পরতন্ত্র, সুতরাং কর্ত্তৃত্বাভিমান ও ফলাভিসন্ধি বিসর্জ্জন দিয়া 'স্বভাবনিয়ত' কর্ম্মদ্বারা নিয়ন্তার অর্চ্চনা করাই তাহার পক্ষে শ্রেয়ঃ। আর জীব কে, নিয়ন্তা

কিরূপ, কর্ম্ম কাহাকে বলে ? দর্শন এই সকল প্রশ্নের বিশদ ও বিস্তৃত উত্তর দিয়াছেন। সুতরাং শব্দার্থ প্রকাশ ও যুক্তিবলে সাধারণ ভ্রান্তির নিরসনই দর্শনের উদ্দেশ্য।

এবংবিধ দর্শনের চর্চ্চা মুমুক্ষুর পক্ষে বাঞ্ছনীয়, সন্দেহ নাই ; কিন্তু তাহা জ্ঞানলাভের উপক্রম মাত্র। আর তাহাও সফল হয়, যদি যুক্তিতর্কের কুটিল বর্ত্মে নিয়ত ভ্রমণ না করিয়া তিনি শ্রদ্ধাবনতচিত্তে তত্ত্বদর্শীর পরমভাবের সন্ধান লন। তাহার পরে জ্ঞান আয়ত্ত করিবার জন্য সাধনার প্রয়োজন হয়। এই সাধনা শাস্ত্রে যোগ নামে প্রখ্যাত। যোগের প্রকারভেদ আছে, কিন্তু অধ্যবসায় ও স্থৈর্য্য প্রত্যেক প্রণালীতে নিরন্তর আবশ্যক। সুতরাং গীতায় তৎপরতা ও সংযম(১) আর পাতঞ্জলে বীর্য্য ও স্মৃতি আদিষ্ট হইয়াছে(২)। জড়বিজ্ঞানের ইতিহাসেও দেখা যায়, মনীষিগণ সাধারণতঃ উদ্যম ও একাগ্রতার ফলে নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন, যুক্তিতর্কের প্রভাবে নহে। অধ্যাত্মচিন্তায় এই একতানতা আরও আবশ্যক, কারণ বিষয় সূক্ষ্ম। ভূমা সম্বন্ধে বহু আলোচনা হইয়াছে, তথাপি যুগে যুগে মানব 'অল্প' লাভার্থ জীবন উৎসর্গ করিয়াছে ও তাহার অভাবে বিহ্বল হইয়াছে। আত্মার নির্লেপ প্রচারে শাস্ত্র মুখর, অথচ শাস্ত্রজ্ঞ দেহ, মন ও বুদ্ধিকে প্রায়শঃ আত্মারূপে গ্রহণ করেন। আর ঈশ্বরপ্রণিধান বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হইলেও সাধক কদাচিৎ অহঙ্কার বা স্বাতন্ত্র্যবোধ রহিত হন। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে কেবল দর্শনের অনুশীলনে তত্ত্বজ্ঞান অধিগত হয় না।

দর্শনের গুরুত্ব ক্ষুণ্ণ করা এই প্রসঙ্গের উদ্দেশ্য নহে। আপ্ত পুরুষের উপলব্ধি দর্শনেই সবিস্তারে প্রকাশ করা হয়।

---

(১) গীতা ৪।৩৯ (২) পাতঞ্জল দর্শন ১।২০

কিন্তু ভাষার দারিদ্র্য ও চিত্তের সঙ্কীর্ণতা এতাদৃশ বিবৃতিকে অল্পবিস্তর দূষিত করে। চিত্ত 'সর্ব্বার্থ' অর্থাৎ সর্ব্ববিধ জ্ঞানলাভে সক্ষম হইলেও সাধারণতঃ বিক্ষিপ্ত ও মলিন। সুতরাং যোগবলে চিত্তকে সংযত ও নিষ্কলঙ্ক করা আবশ্যক, কারণ তৎপূর্ব্বে জ্ঞান নির্দ্দোষ হয় না। পরন্তু যাঁহার চিত্ত এই প্রকারে শুদ্ধ হইয়াছে, তিনিই আপ্ত, অর্থাৎ তাঁহার অনুভূতি অভ্রান্ত। বিচারে সে অনুভূতির উৎপত্তি নহে, বরং বিচার তাহার অনুগামী; সুতরাং বিচারের অনিশ্চয়তা ও একদেশদর্শিতা তাহাকে স্পর্শ করে না। দর্শনে দর্শনে বিরোধ প্রসিদ্ধ; অপরোক্ষ অনুভূতিতে বিরোধ নাই। অতএব দর্শনের আলোচনায় এই অন্তর্নিহিত অনুভূতির প্রতি সতত দৃষ্টি রাখা উচিত।

কিন্তু আপ্তবাক্যগুলি পরস্পরবিরুদ্ধ না হইলেও তাহাদিগের সঙ্কেত বিবিধ। অথচ পরমার্থ সম্বন্ধে চিন্তাশীল ও শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের মধ্যে মতদ্বৈধ নাই। সুতরাং সংশয় হয়,—তাহাদিগের প্রামাণ্য সমান নহে, অর্থাৎ উপাদেয়ত্বে তারতম্য আছে। বেদের কর্ম্মকাণ্ডে বহু দেবতার অর্চ্চনা, জ্ঞানকাণ্ডে আত্মতত্ত্বে অভিনিবেশ, সাংখ্যযোগে চিত্তবৃত্তিনিরোধ আর গীতায় কামনা ও কর্ত্তৃত্বাভিমান বর্জ্জন আদিষ্ট হইয়াছে বটে। কিন্তু এ সকলই সাধনার প্রকারভেদ, আর অধিকারে ভেদের সহিত ইহাদিগের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ; অতএব ইহাদিগের প্রামাণ্যে ইতরবিশেষ সূচিত হয় না। যাঁহারা অনুষ্ঠানে অনুরক্ত জ্ঞানানুশীলন তাঁহাদের উপযোগী নহে; বিশ্বে আনন্দের আভাস পাইয়া যাঁহারা পরমানন্দের সন্ধান করেন, জ্ঞানানুশীলন তাঁহাদের পক্ষেই সঙ্গত। পরন্তু সংসার যাঁহাদের দৃষ্টিতে দুঃখময়, সবিকারা প্রকৃতির লয় তাঁহাদের যোগ্য উপায়; আর

যাঁহারা ক্লিষ্ট ও বিপন্ন হইলেও কর্ত্তব্যের আহ্বান অগ্রাহ্য করিতে পারেন না, কামনা ও কর্ত্তৃত্ববোধ ত্যাগেই তাঁহাদিগের প্রতিকার। প্রকৃতি ও অবস্থা অনুসারে মানবের ভাবনা ও প্রযত্ন ভিন্ন ভিন্ন পথ অবলম্বন করে ; এমন কি, একই দেশে ও কালে সংস্কার, শিক্ষা ও বৃত্তির প্রভাবে আদর্শ ও চিন্তাধারা নানারূপ হয়। অত্যুৎসাহী ধর্ম্মপ্রচারক এই বৈচিত্র্য উপেক্ষা করিয়া সকলকে একই মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে চাহেন। কিন্তু ফল আশানুরূপ হয় না। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সকলের পক্ষে সম্ভব, সন্দেহ নাই, কিন্তু একই পথে নহে। শাস্ত্র এই সত্য অঙ্গীকার করিয়া বিবিধ সাধনার পরামর্শ দিয়াছেন। উপাদেয়ত্বে কোনটি হীন নহে, কারণ শ্রদ্ধা ও সংযম আধ্যাত্মিক উন্নতির সোপানস্বরূপ, আর অধিকার অনুসারে আদেশের যথাবিধি পালনে তাহাদিগের চর্চ্চা হয়।

বস্তুতঃ হিন্দুধর্ম্ম প্রাচীন হইলেও উদার, কারণ অভিজ্ঞতা ও প্রবৃত্তি লক্ষ্য করিয়া ইহাতে উপযোগী ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে। তথাপি যুগব্যাপী ধর্ম্মচিন্তা ও ধর্ম্মাচরণের পরে হিন্দুসমাজ অনুন্নত ধর্ম্মভাবের পক্ষপাতী হওয়ায় সংশয় হয় ব্যবস্থাগুলি অসংলগ্ন অর্থাৎ ক্রমবিকাশের প্রতিকূল অথবা কোন অবান্তর কারণে ধর্ম্মভাবের উত্তরোত্তর উন্নতি হয় নাই। কেহ কেহ মনে করেন, ধর্ম্ম সত্য কিংবা মিথ্যা, ন্যায্য ধারণা কিংবা কুসংস্কার ; সুতরাং উন্নতি বা অবনতির অবকাশ ধর্ম্মে নাই। কিন্তু উপাস্যের সহিত উপাসকের জীবনব্যাপী সম্বন্ধকে ধর্ম্ম বলি ; সুতরাং উপাসকের জ্ঞান ও পরিস্থিতি অনুসারে ইহার পরিবর্ত্তন হয়, অথবা কোন নূতন ধর্ম্ম পুরাতনের স্থান অধিকার করে। অথচ নানাপ্রকার বিপ্লব সত্ত্বেও ধর্ম্মে এতাদৃশ বিপর্য্যয় ভারতে ঘটে নাই। অতএব ধর্ম্মে হিন্দুজাতির

স্থিতিস্থাপকতার কারণ অনুসন্ধান করা উচিত, নচেৎ অবস্থা অনুযায়ী সংস্কার কঠিন হয়। আমরা গীতার নির্দ্দেশ অনুসারে বিষয়টির আলোচনা করিব।

গীতা বলিয়াছেন নিষ্ঠা দ্বিবিধ, অথচ প্রসঙ্গক্রমে অন্য কতিপয় সাধনা সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং যুক্ত অনুমান এই,—স্থিতির পথে উক্ত সাধনাগুলি সাময়িক আশ্রয়স্বরূপ। তাহাদিগের অনুক্রম দিতেছি। বিবিধ কামনা পূরণার্থ স্বীয় প্রকৃতির অনুকূল কোন মূর্ত্ত দেবতার শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অর্চ্চনায় ধর্ম্মভাবের উন্মেষ হয়; পরে শ্রদ্ধার প্রভাবে চিত্ত অপেক্ষাকৃত সংযত হইলে জ্ঞান বা বিত্ত বা নিরাপত্তার জন্য অমূর্ত্ত অথচ সর্ব্বনিয়ন্তা ঈশ্বর অর্চ্চিত হন; আরও পরে ক্ষণস্থায়ী ঐহিক সুখসম্পদে বিতৃষ্ণাবশতঃ পারত্রিক মঙ্গলের জন্য ঈশ্বরের অর্চ্চনা সোমযাগের মত বিরাট অনুষ্ঠানের আকার ধারণ করে; কিন্তু অবশেষে পারত্রিক ও ঐহিক মঙ্গল উভয়েরই অনিত্যতা প্রতিপন্ন হইলে কামনার শাসন প্রত্যাখ্যাত হয়, পরন্তু ঈশ্বরে শুদ্ধা ভক্তি নিবেদেন রুচি জন্মে। সাধক উপলব্ধি করেন, ঈশ্বরের রাজ্যে স্তুতিবাদ ও উপহারের অপেক্ষা নাই কারণ যাহা সঙ্গত তাহাই ঘটে; সুতরাং পত্র, পুষ্প, ফল কিংবা কিঞ্চিৎ জল ভক্তির নিদর্শনরূপে প্রদান করিয়া তিনি নিরস্ত হন। এই অনাড়ম্বর উপাসনা নির্দ্দোষ ও অনায়াসসাধ্য, অতএব ইহা নিত্যকর্ম্ম হইতে পারে কিন্তু নিরন্তর হয় না, যেহেতু অনিবার্য্য কর্ম্ম ও ভোগের অবকাশেই ইহা সম্ভব। তথাপি ইহা চিত্তকে স্থিতির অভিমুখ করে, আর কর্ম্মযোগ সেই স্থিতি বা নিষ্ঠা।

যাঁহার নিয়ম অনুসারে মানবের জীবন কর্ম্মবহুল হইয়াছে, যাঁহাতে এই বিশাল কর্ম্মক্ষেত্র ও ভোগভূমি অবস্থিত,

কামনালাঞ্ছিত কর্ম্ম পরিহার পূর্ব্বক তাঁহাকে যাবতীয় স্বভাবনিয়ত কর্ম্ম ও তজ্জনিত ভোগ অর্পণ করাই কর্ম্মযোগ। ইহাতে স্থিতি সম্ভব, কারণ কর্ম্ম ও ভোগ ব্যতীত ব্যবহারে অন্য কিছু নাই। আর ইহা পরাশান্তি লাভের উপায়, কারণ ইহার অভ্যাসে অসন্তোষ, আক্ষেপ ও অনুশোচনা বিদূরিত হয়। কিন্তু ইহা কি সত্যে প্রতিষ্ঠিত? কর্ম্ম থাকিতে অহঙ্কার বা কর্ত্তৃত্ববোধের উচ্ছেদ হয় কি? এই প্রশ্নের উত্তরে বলি, কর্ত্তৃত্ববোধের উচ্ছেদ কেবল সম্ভব নহে, তাহা ন্যায্য, আর কর্ম্মযোগ তাহাতেই প্রতিষ্ঠিত। ঈশ্বরের সহকারিরূপে কার্য্য করা কর্ম্মযোগ নহে; দাসের মত তাঁহার আদেশ পালনেও কর্ম্মযোগ হয় না। একটি দৃষ্টান্তে তাহার রূপ ও যৌক্তিকতা স্পষ্ট হইতে পারে, সুতরাং তাহা নিম্নে দিলাম।

জীবের বিবিধ অঙ্গপ্রত্যঙ্গে চেতনা বিদ্যমান, আর তাহারা কখন কখন যেন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কর্ম্ম করে। কিন্তু এই প্রবৃত্তি কি নিয়মিত নহে? অক্ষিগোলকে ধূলিকণা প্রবিষ্ট হইলে ক্ষতিনিবারণের জন্য অক্ষি আগন্তুককে বর্জ্জন করিতে সচেষ্ট হয়, এই ধারণা ক্ষণেকের তরে পোষণ করি বটে, তথাপি পর মুহূর্ত্তেই প্রতীতি হয়, আমার যন্ত্ররূপে ইন্দ্রিয় ক্রিয়া ও ভোগ নিষ্পন্ন করিতেছে। কিন্তু ইহাই কি তত্ত্ব, অর্থাৎ আমি কি প্রকৃত যন্ত্রী? নেত্রে কোথায় ও কি পরিমাণ ক্ষতি হইতেছে তাহা আমি জানি না, আর আমার আদেশে যে নেত্রবারি প্রবাহিত হইতেছে তাহাও বলিতে পারি না। অযত্নসম্ভূত ক্রিয়ার উল্লেখ করিলাম; কিন্তু সঙ্কল্পপ্রমুখ কর্ম্মেও জীবের স্বাতন্ত্র্য নাই। পরিস্থিতি ও প্রকৃতির পারস্পরিক ক্রিয়ায় এবংবিধ কর্ম্মের উৎপত্তি হয় অথচ জীব পরিস্থিতি

সৃষ্টি করে না আর প্রকৃতি তাহার ইচ্ছাধীন নহে। ব্যবহারের জটিলতা ও বৈচিত্র্য এই তত্ত্ব আবৃত করায় অহঙ্কার সংসারযাত্রায় যেন অধিনায়ক হয়। কিন্তু প্রত্যেক উন্নত ধর্ম্মে এই কল্পিত অধিকারের প্রতিবাদ আমরা পাই, আর জ্ঞানযোগে ও কর্ম্মযোগে ইহার বিলোপই উদ্দিষ্ট, কারণ অহঙ্কার ভজনীয়ের সহিত একাত্মতার পক্ষে মুখ্য অন্তরায়।

আপত্তি হইতে পারে, ভজনীয় ও ভক্তের আত্মা একীভূত হইবে কিরূপে? কিন্তু আত্মা কাহারও সম্পত্তি নহেন, বরং সকলই তাঁহার বিষয়, যেহেতু তাঁহার অধিষ্ঠানে তাহারা ব্যক্ত বা বাস্তব হয়। আত্মার প্রকারভেদও সম্ভব নহে, কারণ তিনি চৈতন্যস্বরূপ আর চৈতন্যে প্রকারান্তর নাই। যাঁহারা বলেন, আত্মা বহু, তাঁহাদিগের লক্ষ্য জীবহৃদয়ে তাঁহার অধিষ্ঠানের প্রতি, কিন্তু আত্মা জীবের বাহিরেও আছেন; চরাচরে তিনি ওতপ্রোতভাবে বর্ত্তমান; তাঁহার সত্তায় তাহাদিগের সত্তা ও স্ফূর্ত্তি। সর্ব্বক্ষেত্রে তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ আর তাবৎ ক্ষেত্রের তাঁহাতে বিকাশ, অর্থাৎ তিনিই ঈশ্বর। এই তত্ত্ব উত্তমরূপে অধিগত হইলে, ভক্তের স্বাতন্ত্র্যবোধ আর থাকে না; যাবতীয় কর্ম্ম ও ভোগ ঈশ্বর নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন আর তিনি কেবল নিমিত্ত,—এইভাব তাঁহার হৃদয় অধিকার করে। ইহাই কর্ম্মযোগ বা আত্মনিবেদনের চূড়ান্ত ও সম্পূর্ণ সত্যের অঙ্গীকার। পরে দেহান্তে অঙ্গীকারেরও প্রয়োজন হয় না; সাধক চৈতন্যময়ে লীন হন। এই লয় বা প্রবেশ প্রকৃতপক্ষে উপাধির সঙ্কীর্ণতা বর্জ্জন; সুতরাং ইহাকে ব্রহ্মনির্ব্বাণ বা ঈশ্বরপ্রাপ্তি বলা হইয়াছে। কিন্তু গীতার মতে, কর্ম্মযোগীর অন্য প্রকার উৎকর্ষও সম্ভব আর তাহা নির্ব্বাণ অপেক্ষা হেয় নহে। জনহিতকর কর্ম্ম সম্পাদনার্থ তিনি বার

বার সংসারে আবির্ভূত হইতে পারেন, অথচ তাবৎ কর্ম্মে ও ভোগে ঈশ্বরই ভর্ত্তা, প্রভু ও ভোক্তা আর জীবরূপ বিশিষ্ট ভাব ঐশ ভাবের অন্তর্গত, এই সত্য তাঁহার চিত্তে প্রতিষ্ঠিত থাকে, সুতরাং তিনি স্বীয় কর্ম্মে অকর্ম্ম দর্শন করেন। অবতার-বাদের ইহাই ভিত্তি মনে করি। গীতার সপ্তম ও নবম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে,—ঈশ্বর ইন্দ্রিয়ের অগোচর ও প্রাণিজাতের পরম আশ্রয়, সুতরাং তিনি মানুষী তনু গ্রহণ করিয়াছেন, এই ধারণা মূঢ় ব্যক্তিরই হয়(১)।

কর্ম্মযোগে উপাস্য অন্তর্য্যামী, উপাসক জীব, আর উপাসনা স্তুতিবাদ ও উপচারের পরিবর্ত্তে অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম যথারীতি সম্পাদনপূর্ব্বক শ্রদ্ধাসহকারে নিবেদন। উপাস্য শান্ত ও নির্লিপ্ত অথচ তাবৎ কর্ম্ম ও ভোগের নিয়ন্তা ; সুতরাং অনন্যচিত্তে তাঁহাকে ফলসহ কর্ম্ম অর্পণ করিলে, তাঁহার অনুগ্রহে উপাসক শান্তি ও অমৃতত্বের অধিকারী হন, অন্য অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয় না(২)। জ্ঞানযোগে সেই অমৃতত্ব ও শান্তির জন্য সাধক অনিত্য ও বিক্ষেপজনক সংসারের সংস্রব যথাসম্ভব ত্যাগ করেন। নির্জ্জন স্থানে বাস, যৎসামান্য আহার, সর্ব্ববিধ ক্রিয়া সাধ্যমত বর্জ্জন ও সুখদুঃখে সমতার অভ্যাস,—এই প্রকারে তাঁহার সাধনা আরব্ধ হয়। সুতরাং অন্তরস্থ অক্ষরভাবে সমাহিত হইবার যথেষ্ট অবসর তাঁহার থাকে, আর দৃঢ়তার সহিত সেই অবসরের সদ্ব্যবহার করায় তিনি কামনা ও দুঃখের অতীত হন, তাঁহার চিত্ত শুদ্ধ, শান্ত ও ভক্তিযুক্ত হয় ও ভক্তির মহিমায় তিনি উপলব্ধি করেন, একই আত্মা সমভাবে সর্ব্বজীবে বর্ত্তমান, কেবল অহঙ্কার, মমতা প্রভৃতি জীবে জীবে নিবিড় ব্যবধান সৃষ্টি করে, সুতরাং সেই আত্মায় বা ঈশ্বরে আপনার অনর্থকর

(১) গীতা ৭।২৪, ৯।১১ (২) গীতা ১৮।৫৬-৫৮

স্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন দিয়া তিনি অক্ষয় শান্তিলাভ করেন(১)। অতএব সাধনদ্বয়ের প্রণালী ভিন্ন হইলেও লক্ষ্য একই। আর উভয়েই স্থিতি বা নিষ্ঠা সম্ভব, যেহেতু উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য অন্য কোন উপায় অবলম্বন করিতে হয় না।

তথাপি গীতা কর্ম্মযোগের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন(২), যদিও কোন স্থলে জ্ঞানযোগের অনাদর করেন নাই। তাহার কারণ এইরূপ :—যাঁহারা 'সর্ব্বত্র অসক্তবুদ্ধি' অর্থাৎ কোন বিষয়ে যাঁহাদিগের আসক্তি নাই, তাঁহাদিগের পক্ষেই জ্ঞানযোগ বা নৈষ্কর্ম্ম্যসাধন সম্ভব(৩), অথচ তাদৃশ সম্পূর্ণ অনাসক্তি দেহবানের মধ্যে বিরল ; এমন কি, জ্ঞানীও প্রকৃতির বিরুদ্ধে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করিতে পারেন না(৪) ; পরন্তু কর্ম্মযোগে ইন্দ্রিয়সংযম আবশ্যক হইলেও তাহা ইন্দ্রিয়নিরোধের মত কঠিন নহে, আর শ্রদ্ধাযুক্ত মন প্রথম হইতে অনুকূল থাকায় তাহাতে হঠকারিতা নাই। অতএব জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগ উপাদেয়ত্বে তুল্যমূল্য হইলেও সাধ্যতায় তাহাদিগের তারতম্য আছে।

যাহা হউক, ধর্ম্মাচরণের দ্বিবিধ আদর্শ আমরা গীতায় পাই। সমালোচক বলিবেন, শাস্ত্রের নির্দ্দেশ বিকল্পশূন্য হওয়া আবশ্যক, নচেৎ সংশয় ও দ্বিধার অবকাশ থাকে। কিন্তু বিষয়ব্যবহারে যাঁহাদিগের প্রকৃতিগত বিতৃষ্ণা, নিভৃতে অধ্যাত্মচিন্তাই তাঁহাদিগের যোগ্য তপস্যা, আর সেই তপস্যালব্ধ জ্ঞান সংসারীও উপদেশরূপে লাভ করেন। অথচ তাঁহাদিগের সংখ্যা কখনই অধিক নহে, সুতরাং তাঁহাদিগের নৈষ্কর্ম্ম্যে সংসার ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। পরন্তু অন্য সকলের পক্ষে কর্ম্মযোগ সঙ্গত। বিষয় ব্যবহারই কর্ম্ম, আর যোগ্য কর্ম্মের জন্য

(১) গীতা ১৮।৫১-৫৫ (২) গীতা ১২।২-৮

(৩) গীতা ১৮।৪৯-৫০ (৪) গীতা ৩।৩৩

বিষয়জ্ঞান ও ব্যবহার সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা প্রয়োজন। অতএব কর্ম্মযোগী বিজ্ঞান, শিল্পও নীতির অনাদর করিতে পারেন না, যেহেতু ইহাদিগের উত্তরোত্তর উন্নতি ও তাঁহার সাধনায় ক্রমিক উৎকর্ষ কারণকার্য্যরূপে সম্বদ্ধ। কর্ম্মে সিদ্ধি বা অসিদ্ধি কিংবা কর্ম্মফলে লাভ বা অলাভ শাস্ত্রমতে কর্ম্মযোগীর লক্ষ্য নহে,—এ আপত্তি নিঃসার। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে শাস্ত্রে সাধারণ নির্দ্দেশ থাকিলেও প্রতি ক্ষেত্রে তাহা স্থির করিবার জন্য বিজ্ঞান ও শিল্পের আলোচনা আবশ্যক। শাস্ত্রে অবিমৃষ্যকারিতা অনুমোদিত হয় নাই, সাফল্যের আশায় আত্মপ্রসাদ অনুভব ও সুফল আত্মসাৎ করিবার ইচ্ছা প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে।

পাঠক লক্ষ্য করিবেন, এই প্রসঙ্গে আমরা নিঃশ্রেয়সের আলোচনা করিতেছি না; ধর্ম্মের সহিত সাংসারিক অভ্যুত্থান বা অধঃপতনের সম্বন্ধই আমাদিগের বিচার্য্য। দ্বাপরের শেষে শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্মযোগ সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছিলেন। সেই স্মরণীয় দিনের পরে যুগ অতীত হইয়াছে, অথচ সমাজ তাঁহার পথে অগ্রসর হয় নাই। পরন্তু জ্ঞানযোগীর প্রভাবে কদাচিৎ কেহ সংসার ত্যাগ করিয়াছেন কিংবা সাংসারিক ব্যাপারে বীতস্পৃহ হইয়াছেন। সুতরাং ধর্ম্মাচরণে আগ্রহাতিশয় যে অধোগতির হেতু নহে তাহা সুস্পষ্ট। অথচ অধোগতি যে সর্ব্বাঙ্গীন ও যুগব্যাপী হইয়াছে, তাহাও সুস্পষ্ট। ঐতিহাসিক এই কলঙ্কময় কাহিনীর যথোচিত আলোচনা করিবেন। আমরা কর্ম্মযোগ সম্বন্ধে আরও দুইটি আপত্তি পরীক্ষা করিয়া ভূমিকা সাঙ্গ করিব।

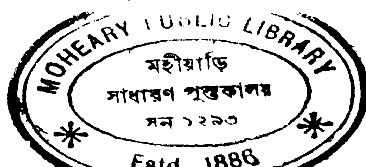
সন্ন্যাসী বলেন :—কর্ম্মে স্বস্তি নাই, ভোগেও তৃপ্তি নাই, আর অনুকূল অবস্থার সহযোগে সকল চেষ্টা সফল হইলেও

সেই আজীবন সাফল্যের অনুপাতে মরণ ভয়াবহ হয় অথচ মরণ সুনিশ্চিত ; সুতরাং কর্ম্মযোগ অপেক্ষা কর্ম্মত্যাগ শ্রেয়ঃ। কিন্তু সকল কর্ম্ম ত্যাগ করা মানবের পক্ষে সম্ভব নহে(১) ; অতএব ফলভোগের আশা বর্জ্জনপূর্ব্বক কর্ত্তব্যপালনই উচিত। জ্ঞানযোগীর কথা স্বতন্ত্র, কারণ তাঁহার চিত্ত স্বভাবতঃ শান্ত অর্থাৎ কর্ম্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত। যাঁহারা কষ্টের ভয়ে কর্ম্মত্যাগ করেন, তাঁহাদিগের চপল চিত্ত স্থির হয় না,(২) যেহেতু সুখে অনুরাগ ও দুঃখে বিদ্বেষ চিত্তবিক্ষেপের প্রসিদ্ধ হেতু।

সংসারী বলেন ঃ—কর্ম্মযোগ নিয়তিবাদের মত আত্ম-নির্ভরতা ক্ষুণ্ণ করে ; কর্ম্মে ও ভোগে মানবের প্রবৃত্তি স্বাভাবিক, আর স্বভাবের অনুবর্ত্তন দোষাবহ নহে ; ভাবরাজ্যে ধর্ম্মের প্রাধান্য স্বীকার করি ; কিন্তু ব্যবহারে বিজ্ঞান ও নীতিবিদ্যার নির্দ্দেশই গ্রাহ্য ; সুতরাং দেবার্চ্চনায় কিছু সময় দিয়া অবশিষ্ট সময়ে ব্যবহারিক জ্ঞানের আলোকে কর্ম্মপদ্ধতি স্থির করাই যুক্তিযুক্ত ; সাংসারিক ব্যাপারে ঈশ্বরের নিয়ন্তৃত্ব কল্পনা করিলে স্বাবলম্বন ক্ষুণ্ণ হয়।

কিন্তু কর্ম্মযোগের অভ্যাসে কল্পনার প্রেরণা নাই। জীবের জন্ম, মৃত্যু ও অন্তর্বর্ত্তী কালে ব্যবহার, কিছুই তাহার ইচ্ছাধীন নহে, বরং তাহার ইচ্ছাও নিয়ন্ত্রিত। জীবলোকেও সকলই নিয়মানুবর্ত্তী, নতুবা ব্যবহার সম্ভব হইত না। সুতরাং স্বীকার করিতে হয়, বিশ্বব্যাপী অথচ বিশ্বের অতীত কোন সত্তাই নিয়ন্তা। নিয়মন জড়ের ধর্ম্ম নহে, সুতরাং সেই সত্তা জ্ঞানময়। জীবন তাঁহার দান, সুতরাং জীবের তিনি পূজনীয়। কিন্তু সকলই তাঁহার আর তিনি অন্যনিরপেক্ষ, সুতরাং

(১) গীতা ১৮।১১ (২) গীতা ১৮।৮



উপচার নিবেদনে ও স্তুতিবাদে তাঁহার যোগ্য পূজা হয় না। বস্তুতঃ পূজায় তাঁহার প্রয়োজন নাই, প্রয়োজন জীবের, কারণ পূজার ফলে তাহার চিত্ত শুদ্ধ ও শান্ত হয়। অতএব কর্ম্ম ও ভোগ অর্থাৎ সমগ্র ব্যবহার তাঁহাকে নিবেদন করাই সঙ্গত।

এই প্রকার কর্ম্মযোগে চিত্ত দুর্ব্বল ও কর্ম্ম ব্যবস্থাহীন হয় কি? ভোগের আশায় যাঁহারা কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন, প্রতিকূল অবস্থায় সংশয় ও উদ্বেগ তাঁহাদিগকে অবসন্ন করে, আর অবস্থা অনুকূল হইলেও ভোগ্য বিবিধ হওয়ায় সকাম কর্ম্মে অনবস্থাদোষ হয়। নৈতিক উপদেশ তাঁহাদের চিত্ত ও ব্যবহার সংযত করে কি? শুষ্ক উপদেশের এ বিষয়ে ব্যর্থতা প্রসিদ্ধ। কিন্তু ঈশ্বরকে নিবেদন করিবার জন্য যাঁহারা কর্ত্তব্যে অবহিত হন, কোন প্রকার বিসদৃশ উদ্দেশ্য তাঁহাদিগের তৎপরতা নষ্ট করে না, আর নৈতিক উপদেশও তাঁহাদিগের শ্রদ্ধাযুক্ত চিত্তে ফলপ্রসূ হয়। শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণ সত্যের উপাসক হওয়ায় তাঁহাদিগের তৎপরতা অনুকরণীয় হইয়াছে। সুতরাং সত্যস্বরূপের উপাসক যে অস্থিরচিত্ত হইবেন, এ আশঙ্কা অকারণ। গীতার মতে, কর্ম্মযোগী ভক্তিমান বলিয়া কর্ম্মে নিপুণ ও অনলস অথচ ফলে স্পৃহাশূন্য হন।

আপত্তি হইতে পারে,—স্বর্গসুখ কল্পনা না হইলেও প্রমাণ-সিদ্ধ নহে; সুতরাং তাহার জন্য বিবেচক ঐহিক সুখসম্পদে অমনোযোগী হইতে পারে না। কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ উপদেশে ভোগবহুল স্বর্গবাসের উল্লেখ নাই, শাশ্বতী শান্তি অর্থাৎ সর্ব্বাবস্থায় নিরাময়, নির্ব্বিকার ভাব পরাগতি বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে; আর মর্ত্ত্যেই তাহা লভ্য, এই আশ্বাসও শাস্ত্র দিয়াছেন। বস্তুতঃ এ বিষয়ে উপনিষৎ, সাংখ্য ও গীতা একমত, যদিও উপনিষৎ ও সাংখ্য জ্ঞানযোগের

পক্ষপাতী আর গীতা কর্ম্মযোগের। কর্ম্মযোগের বৈশিষ্ট্য এই যে ইহার অভ্যাসে শাস্ত্রজ্ঞান, সংসারত্যাগ ও কঠোর তপস্যা প্রয়োজন হয় না। সুতরাং বিত্তোপার্জ্জনে রত বৈশ্য, পরিচর্য্যায় নিযুক্ত শূদ্র, গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃতা নারী, এমন কি, অসৎকুলে জাত ও পাপাচারে অভ্যস্ত ব্যক্তি ইহা অভ্যাস করিতে পারে। কিন্তু স্থিতি কঠিন, কারণ সংসারে অন্তরায়ের অভাব নাই। তথাপি অনন্যা, অচলা ভক্তি সকল অন্তরায় অতিক্রম করে। সুতরাং যাঁহারা ধর্ম্মে ও কর্ম্মে ভেদ করেন, কর্ম্মযোগ তাঁহাদিগের পন্থা নহে। এই ভেদ প্রকৃতপক্ষে অন্যায্য, অপবিত্র ও সাংঘাতিক।

